SHATAYU SUKUMAR,
a collection of Bengali essays on Sukumar Ray
edited by Sisir Kumar Das, 1988.

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

পরিবেশক :
প্যাপিরাস ২ গনেন্দ্র মিত্র লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশক :
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশান
হেলী রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১

মুদ্রক :
শ্রীযুক্ত নিশীথকুমার রায়
আই এম এইচ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
চাঁদনী চক, দিল্লী ১১০০০৬

সূচীপত্র



১৮৮৭ — ১৯২৩

স্বল্পায়ু সুকুমারের শতায়ু পূর্ণ হোল। এই রচনা সংকলন তাঁর কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকৃতি মাত্র।

সুকুমারের কর্মজীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার ইচ্ছাতেই এ সংকলনের শুরু। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা এই সংকলনের লেখকদের সহৃদয় সহযোগে। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশান সুকুমার রায় শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেছিলেন তাঁর নাটক অভিনয় করে, কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠ করে। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুকুমারের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে আয়োজিত এক প্রদর্শনী। সেই উপলক্ষে দিল্লীবাসী মালয়লাম-ভাষী শিল্পী রাধাকৃষ্ণান সুকুমার রায়ের অতি পরিচিত চরিত্রগুলির মূর্তি রচনা করেছিলেন। তাঁর সৌজন্যে কয়েকটি মূর্তির আলোকচিত্র আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত স্বপন মজুমদার আমাদের নিরন্তর সাহায্য করেছেন, Andrew Robinson-এর সৌজন্যে আমরা *The British Journal of Photography*-তে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের একটি লেখা পেয়েছি, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মজুমদার, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রেবতীভূষণ ঘোষ নানা পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। আর যাঁর অদম্য উৎসাহে এই সংকলন প্রকাশিত হোল, তিনি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশানের কর্মী শ্রীযুক্ত বাদল রায়, এই গ্রন্থের অদৃশ্য পরিচালক। এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফুর্তিভরা প্রাণ

শঙ্খ ঘোষ

অল্পবয়সে যখন প্রথম পড়েছিলাম 'বাবুরাম সাপুড়ে', সাপ-নিয়ে-যাওয়া এক সাপুড়ের ছবিই তখন দেখতে পেতাম শুধু। মনে হতো, এ এক অন্যরকম সাপুড়ে, এ কেবল সাপখেলা দেখায় না, সাপ ফেরি করেও বেড়ায়। তাই তাকে ডেকে বলা যায়: আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা! মজা লাগত সেই সাপের বর্ণনায়, যার শিংও নেই নখও নেই, টুঁশটাঁশও করে না — যেন সাপের শিং নখ থাকবারই কথা ছিল, যেন টুঁশটাঁশ করাই তার স্বভাব। তারপর সেই জ্যান্ত সাপকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেবার সম্ভাবনাতেও বেশ হৃষ্ট হতো মন, কেননা আমাদের অঞ্চলে সাপের উপদ্রবও ছিল খুব বেশি, তাদের ঠান্ডা করাও বড়ো সহজ ছিল না। অতৃপ্য ইচ্ছের এই অসম্ভব এক কল্পিত সফলতায় খুশিই হতো মন। আর, এতসবেরও আগে, মিলের মহিমা মাথা-দিয়ে না বুঝেও 'সাপুড়ে' আর 'বাপুরে'র ধ্বনিসঙ্গমে মুগ্ধ হতাম, মুগ্ধ হতাম 'ডান্ডা' আর 'ঠান্ডা'র আকস্মিক বৈপরীত্যে, মনে পড়ত 'ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া'র মতো আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার চাল।

ফলে, সুকুমার রায়ের এই ছড়াকে মনে হতো খুব সহজভাবে আপন, খুব স্বাভাবিক, যে-কোনো সময়ে উচ্চারণযোগ্য, মন ভালো করবার উপকরণ। আরো একটু বড়ো হয়ে, আরো একটু পড়ে, এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালো লাগত 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর গুরুজির কথা, যেখানে 'দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাতপা হবে ঠান্ডা/শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডান্ডা' কিংবা যেখানে আছে 'জ্যান্ত জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধবে ধরে মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে জমে উঠতে থাকবে — আর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলব।' এক মুহূর্তের জন্য গুরুজিকেও তখন লাগত বাবুরামের মতো।

কিন্তু এই-যে অল্পবয়সের আনন্দটুকু, সাহিত্যপাঠের পক্ষে এটা কি যথেষ্ট? সুকুমার রায়ের ওই কবিতাটির মধ্যে যা-কিছু আছে, সব কি বোঝা গেল এতে? তাঁর যা অভিপ্রেত ছিল সেটা কি পৌঁছল পাঠকের কাছে? বিদ্বজ্জনসমাজে নিশ্চয় এইসব নতুন নতুন প্রশ্ন উঠে পড়ে।

অভিপ্রায়ের কথা অবশ্য স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল তাবোল'-এর কৈফিয়ৎ-এ। 'ইহা খেয়ালরসের বই': বলেছিলেন তিনি। সে-রস যাঁরা উপভোগ করতে পারেন না, 'আবোল তাবোল' অন্তত তাঁদের জন্য নয়, এতটাও বলেছিলেন সুকুমার রায়। কিন্তু লেখা বিষয়ে সেই লেখকের মতকেই শেষ কথা বলে ধরতে হবে এমনও নিশ্চয় নয়। এমনও অনেক সময়ে হতে পারে যে কবি বা লেখক নিজে জানেন না তাঁর রচনার সম্পূর্ণ বাস্তবিক-তাৎপর্য। তাই কেউ ভাবতেই পারেন যে 'আবোল তাবোল' শুধু খেয়ালরস নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু এর মধ্যে আছে। খেয়াল হলো এর বাইরের আবরণ মাত্র, মন ভোলাবার আয়োজন, কিন্তু এর ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে গূঢ় অনেক সামাজিক অর্থের দ্যোতনা, সমকালীন

প্রতিবিম্বন — এইরকমই ভাবতে পারেন কেউ। আর সেই ভাবনা থেকে সুকুমার রায়ের লেখাগুলিকে আজ নতুন করে বিশ্লেষণ করতেও চাইতে পাবেন অনেকে। তখন, একটু বয়স্ক হয়ে, সেইসব বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পাই যে বাবুরাম সাপুড়ের ওই বালককল্পিত ছবিটি এ-লেখার আসল কথাই নয়। এর মধ্যে কাজ করছে একেবারে ভিন্ন একটা সমাজসত্য। কী সেই সত্য? এই সত্যের উদ্ঘাটনে অবশ্য এক-একজন বিদগ্ধ পাঠক এক-একরকম ভাবনায় ভর করতে থাকেন, কখনো-বা একই পাঠক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যায় চলে যান।

যেমন, কখনো আমরা শুনেছি যে ওই সাপটা হলো আমাদের গোটা জীবনের রূপক। আমাদের অনেকের আবদার যেন এইরকম যে জীবনের দাঁত নখ কামড় আঘাত রক্তপাত কিছুই আমরা নেব না, ওসবে বড়ো উৎপাত। যে-জীবন শুধু দুধভাতের অঢেল শান্তি নিয়ে আসে, সেইটের জন্যই আমাদের আহ্লাদেপনা। গোটা এই কবিতাটি না কি আমাদের 'সেই মামার বাড়ির আবদারটির উদ্দেশ্যে বাড়ানো প্রচন্ড একটি চপেটাঘাত'। এ ব্যাখ্যা অবশ্য লেখকের নিজেরই আর তত পছন্দ হয় না পরে, প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে তিনি আবার নতুন চোখে দেখতে চান একে, ধরতে চান আরেকটু বিশেষিত চেহারায় (প্র ১৪৫)। তখন তাঁর মনে হয় যে বাবুরামের ওই সাপটি হলো ব্রিটিশ গবর্মেন্ট। কোনো বাবুরাম যদি গবর্মেন্টের দাঁত-নখ-শিং আর টুঁশটাঁশ করবার ক্ষমতা লোপ কবে দিয়ে রেকাবিতে সাজিয়ে গুছিয়ে স্বরাজ এনে দেয়, যেমন না কি গান্ধী আর তাঁর দলবল চাইবেন গোলটেবিল বৈঠকে — তাহলে তার মধ্যে যে অসংগতির প্রকাশ, সুকুমার রায়ের আক্রমণটা ছিল সেখানেই। কিন্তু গোলটেবিলটা অনেক পরেব ঘটনা বলে অন্য একজন একে মিলিয়ে দেখতে চান সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে (প্র ১১৩)। সেই আন্দোলনেরই কাছাকাছি সময়ে (আষাঢ় ১৩২৮) ছাপা হয়েছিল এই কবিতা, সমস্তরকম কাপুরুষতার বিরুদ্ধে শ্লেষে ও ব্যঙ্গে তাই এ ভরপুর। কোনটা ছিল কাপুরুষতা? ১৯২১ সালে জামশেদপুরের শ্রমিক ধর্মঘটে, মেদিনীপুরের করবন্ধ আন্দোলনে, পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে অকালী কৃষকদের বিক্ষোভে, মহারাষ্ট্রে কৃষকদের সত্যাগ্রহের হুমকিতে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সত্যিকার ঝুঁকির পথে চলে যাচ্ছিল বলে গান্ধী আর নরমপন্থীরা না কি চিন্তিত হয়ে পড়েন, কেননা অসহযোগে তাঁরা চেয়েছিলেন মাত্র সেই সাপটাকে যার কোনো উৎপাত নেই, আর তার বদলে ঘটল কি না চৌরিচৌরার ঘটনা! ঝুঁকি-না-নেওয়ার সেই গান্ধী-মানসিকতাকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছিলেন বলেই সুকুমার লিখলেন 'বাবুরাম সাপুড়ে'। এ ব্যাখ্যায় অবশ্য স্পষ্ট নয় যে কোন্‌টা ছিল সাপ, কাকে গান্ধী দেখতে চাইছিলেন নখশৃঙ্গহীন : ব্রিটিশ সরকারকে না আন্দোলনকে। কিন্তু যাকেই হোক, ব্যঙ্গটা যে এখানে গান্ধীকে নিয়ে, এ বিষযে সমালোচকের সংশয় নেই। কবিতাটি প্রসঙ্গে গান্ধীর অসহযোগের কথা ভেবেছেন আরো একজন (প্র ৬৮), আর সেখানে সাপের পরিচয় অনেকটা স্পষ্ট। গান্ধীর 'experiment with truth কে দমন করবার জন্য ইংরেজ সরকার লাঠির ব্যবহারে কোনো কসুর করেনি', নিরীহ আন্দোলনকে 'তেড়েমেরে ডান্ডা' একেবারে ঠান্ডা করে দেবে ব্রিটিশ, এইটেই না কি 'বাবুরাম সাপুড়ে'র নিহিতার্থ।

অর্থাৎ, এই কবিতার কথক কখনো গান্ধী, কখনো ব্রিটিশ সরকার, কখনো-বা আরামলোভী আহ্লাদে সাধারণ মানুষ। একই ব্যঙ্গের এত বিপরীতমুখী লক্ষ্য দেখে একটু ধাঁধাই লাগে আমাদের। কোন্‌টাকে এর ঠিক অর্থ বলে ভাবব? কিংবা, আরো মূলে গিয়ে এই প্রশ্নটাই তোলা যায় যে,

সত্যিই কি এইভাবে কবিতাকে বিচার করবার কোনো দরকার আছে? এ ধরণের কবিতার মূল কৌতুকের দিকটা কি তবে বহুদূরে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় না?

প্রশ্নটা যে কেবল এই একটি কবিতার জন্যই উঠছে তা নয়। ব্যাখ্যার অতিপ্রবণতায় আমরা এ-রকম অনেক কবিতারই অনেক রকম অর্থ খুঁজে পাচ্ছি আজ। শুনেছি, মাছিমারা কেরানিও যে একসময়ে হাতপা ছুঁড়ে বিদ্রোহ করে বসে, তারই ছবি আছে নাকি 'গোঁফচুরি' কবিতায় (প্র ৭০)। অন্যদিকে, অতিসম্প্রতি অ্যান্ড্রু রবিনসন জানিয়েছেন (Miscellany, *The Sunday Statesman,* February 14, 1988) যে এ-কবিতায় আছে 'timid mentality of the clerks working for the sahibs at that time', এ প্রসঙ্গে নীরদ চৌধুরী বর্ণিত অপদার্থ বাঙালি কেরানির কথা মনে করিয়ে দিতেও ভোলেননি তিনি। কিন্তু একই লেখা থেকে 'timid' এবং 'বিদ্রোহী' দুই মূর্তিই বেরিয়ে এলে সাহিত্য ব্যাপারটাই একটু বিপন্ন হয়ে পড়ে না কি? এইরকমই ব্যাখ্যায় আমরা জানি (প্র ১১৪), 'একুশে আইন'-এর 'যেসব লোকে পদ্য লেখে' লাইনটি ছিল স্পষ্টতই কারারুদ্ধ নজরুল বিষয়ে সুকুমার রায়ের ভাবীকথন, কেননা তার পরেই তো আছে 'তাদের ধরে খাঁচায় রেখে' কানের কাছে নামতা শোনানো হবে! সত্যজিৎ রায় যদিও জানিয়েছিলেন যে 'মার্কিন কমিকপুস্তকের ক্যাটজেনজ্যামার কিড্‌স্ যে মোমবাতি-চোষা ডানপিটে ছেলের প্রেরণার উৎস সেটা আবোল তাবোলের ছবি দেখলেই বোঝা যায়', তবু নতুনতর ব্যাপক ব্যাখ্যায় আমরা শুনি (প্র ১১৪-১৫), 'ডানপিটে' কবিতাটিতে আছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্য সুকুমারের সূক্ষ্ম সহানুভূতি। কেননা ডানপিটে ছেলেদুটি সহজপথে চলে না, একজন মুখে আঠা মেখে স্লেট শিশি ভাঙে, অন্যটা হামাগুড়ি দিয়ে আলমারিতে উঠতে চায়। 'এই দুই ভাই কি বাংলার দুই বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর ও অনুশীলন?' প্রশ্ন তোলেন লেখক। রূপকভাবনা এখানে যে চূড়ান্ত বিন্দু ছুঁয়েছে তাও হয়তো বলা যায় না। কেননা, ভীষ্মলোচন শর্মা গান জুড়েছেন, তাঁর আওয়াজ হানা দিচ্ছে দিল্লী থেকে বর্মা, আর সঙ্গেসঙ্গে তার মধ্যে একজন শুনতে পাচ্ছেন (প্র ৬১) 'ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ প্রচাবযন্ত্রের সুললিত বক্তৃতা'র আওয়াজ, দিল্লী থেকে বর্মা পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে যে-আওয়াজ ভারতীয় তরুণদের সৈন্যদলে যোগ দিতে ডাকছিল। যুদ্ধকালীন গুজবে 'মাথা ভন্‌ভন্ করা জখম, মৃত্যু ও ছুটফটানির নারকীয় সব দৃশ্যের আনাগোনা'ই না কি ফুটে উঠেছিল এইসব লাইনে: 'ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্‌ভন্'। হাতুড়ে ডাক্তারের হাতুড়েপনায় সরল মজা পেতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম এতদিন, কিন্তু এখন জানছি (প্র ৫৯) যে 'ভীতিপ্রদ, বিলিতি সেই শল্যবিজ্ঞান আহরণের ব্যাপারে' উৎসাহ আর চেষ্টাকে নিয়েই এই ব্যঙ্গ, আর উলটোদিকে রবিনসন বলছেন (Miscellany) যে এ হলো অ্যালোপ্যাথি-বিরোধী বাঙালির প্রতি সুকুমার রায়ের আক্রমণ। অর্থাৎ শল্যবিজ্ঞান বা অ্যালোপ্যাথির চর্চা হওয়া উচিত কি উচিত নয় — এই নিয়েই যেন পুরো কবিতাটির মূল সমস্যা, এই নিয়েই না কি লেখা হয়েছিল 'একদিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে/গেঁটেবাত ঘেঁটেঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে'-র মতো লাইনগুলি।

'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে সুকুমার একবার লিখেছিলেন যে 'নিজের পছন্দমতো অর্থ বাহির করিবার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটুআধটু নজর থাকে', এসব হলো সেই নজরেরই নানারকম উদাহরণ। উদাহরণ আরো অনেক বাড়ানো যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে হয়তো এর চেয়ে বেশি আর দরকার নেই। নিজের পছন্দমতো অর্থ খুঁজবার এই ধরণের প্রবণতায় যে অনেক পরস্পরবিরোধী

ভাবনা দেখা দিতে পারে, সেটাই এখানে একমাত্র সমস্যা নয়। সমস্যা এই যে, রচনাগুলিকে এতদূর ঘটনাকেন্দ্রিক বা উপদেশকেন্দ্রিক বলে ভাববার সত্যিই কোনো দরকার আছে কি না। এ-ধরণের পাঠের মধ্য দিয়ে এসব কবিতার প্রাণকে কি আমরা আরো বেশি করে ছুঁতে পাচ্ছি? না কি হারিয়েই ফেলছি তাকে? সুকুমার রায়ের খেয়ালের জগৎ যে মানুষের নানা খামখেয়ালের ওপর ভর করে আছে, তার নানারকম বাতিকের একটা বাড়িয়েধরা চলচ্ছবি হয়ে আছে, সেই হাসির হাওয়াটাই তো আমাদের সামনে থেকে একেবারে সরে যায় তখন!

২

একথার মানে এ নয় যে লেখাগুলির পিছনে ছড়ানো সামাজিক পটভূমিকে লক্ষ করাটাকেই একেবারে অবান্তর ভাবছি আমরা। সহজ হাসির উৎসমুখে যে কিছু জটিলতারও মিশোল থাকা সম্ভব, একথাও ঠিক। কেননা যে-লেখকের লেখা নিয়ে আমরা ভাবছি, তাঁর জীবন ছিল কাজ আর পরব্রতে ভরা, 'সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ...Service' ঠিকমতো দিতে না পারলে বিষণ্ণ হতেন তিনি, ব্রাহ্মসমাজের বাঁধিবুলির কথা বলতে উঠেও তিনি বলতে পারতেন 'এই যুগের মানুষের মন থেকে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে, মানুষের আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেউ আশা করতে জানে না, কেউ ভবিষ্যতের ভরসা রাখে না' তাই কেবল 'আনন্দ আনন্দ' উচ্চারণে কোনো লাভ নেই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা যে 'গোপন' চিঠিটির এই লাইন, তাকে একেবারে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বলে ভাববারও কোনো কারণ ছিল না। বক্তৃতা দিতে উঠে হঠাৎ যে ওইকথা তিনি বলে ফেলেছিলেন, সেটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল, প্রকাশ্য প্রবন্ধে তো তিনি লিখেওছিলেন একেবারে ওর অনুরূপ কথা: 'In his recurrent blindness the common man loses consciousness... the common man is bereft of the light divine and the blessed vision of beatitude... He carries within him the agonies of atonement—blind, mute and unquestioning' ('The Burden of the Common Man'). সেই সাধারণ মানুষ আজ জেগে উঠছে বলে ঘোষণা করেছিলেন যে সুকুমার রায়, পরিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁর প্রখর চেতনার কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

অন্যদিকে, সুকুমার বিশ্বাস করতেন যে মানবিকতার চিত্রায়ণের পিছনে আছে এক 'essential background of commonplace realism' (তদেব), বিশ্বাস করতেন যে সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে মানুষেমানুষে যে দ্বৈতবোধ তৈরি হয়েছে সেটাই আজ সবচেয়ে অর্থহীন; তিনি আমাদের চেতনা ফেরাতে চেয়েছিলেন সেই সাধারণ মানুষের দিকে, যারা আজও অন্ধ, অসহায়, হাৎড়ে বেড়াচ্ছে আজও যারা। সুকুমার রায় বলেছিলেন, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান বা ধর্ম-জগতে মানুষ একটা চিরন্তন প্রশ্নের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে: আমার লক্ষ্য কী? এ অন্বেষণের শেষ কোথায়? এই প্রশ্ন আর তার ভিতরকার 'রসানুভূতি'ই শিল্পীকে তাঁর শিল্পকাজে প্রবুদ্ধ করে বলে ভেবেছিলেন তিনি। 'কল্যাণ কী? গুড কী? প্রোগ্রেস কী?' এইসব ভাবনাই আছে শিল্পের মূলে। আমাদের ইচ্ছে থাকুক আর না-ই থাকুক, সমস্ত সফলতা আর ব্যর্থতাকে নিংড়ে নিয়ে জীবন আমাদের কেবলই প্রশ্ন করবে 'কে তুমি। কোথায় চলিয়াছ? কী তোমার করিবার ছিল? আর কী-ই-বা করিতেছ'

(*চিরন্তন প্রশ্ন*)। বিলেতে যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন তিনি, তখনও রবীন্দ্রনাথের লেখাকে তিনি বিচার করতে চেয়েছিলেন এই চিরন্তন প্রশ্নের দিক থেকেই (বস্তুত, *'চিরন্তন প্রশ্ন'* আর 'The Spirit of Rabindranath Tagore' একই লেখার ভাষাগত রকমফের মাত্র), কিংবা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সমাজের সমস্ত পুরোনো অচলতাকে প্রথাবদ্ধতাকে সংস্কারকে কীভাবে ভাঙতে পারছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ, খেয়ালরসের কবি সুকুমার রায়কে যখন আমরা ঠিকমতো বুঝতে চাইব, তখন আমাদের লক্ষ্যে রাখতেই হবে এই সামাজিক চেতনায় চঞ্চল মানুষটিকে, এই প্রশ্নাতুর অন্বেষণব্রতীকে।

এও ঠিক যে, কবিতাগুলির বাইরে এসে যদি তাঁর নাটক বা কোনো কোনো গল্পের দিকে তাকাই, কিংবা 'সন্দেশ'-এ ছাপানো জ্ঞানবিজ্ঞানের ছোটো ছোটো সংবাদবাহী প্রবন্ধগুলির দিকে, তাহলে তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক ভাবনার চেহারাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গের ধার নিয়ে দেখা দিতে থাকে 'শব্দকল্পদ্রুম' বা 'চলচিত্তচঞ্চরি'র মতো নাটক। আমাদের ধর্মদর্শনের চর্চায় — সে হিন্দুধর্মই হোক বা ব্রাহ্মধর্মই হোক, হিন্দুদর্শনই হোক বা ব্রাহ্মদর্শনই হোক — সত্যের অনুভবকে দূরে রেখে কেবল কিছু শব্দেরই আবর্তন যেভাবে চলে, যে-কোনো সুস্থ চেতনার পক্ষে সে এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ। সেই কথাটাই প্রবন্ধে বিস্তৃত করে বলছিলেন সুকুমার রায়, বলেছিলেন যে কিছুদিন যথার্থ চিন্তাকে বহন করতে করতে এক-একটা শব্দ তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আসনচ্যুতি ঘটে তার, অথচ অভ্যস্ত সেই শব্দব্যবহারের আড়ম্বরটাকে তখনো ছাড়তে পারি না আমরা। 'শংকরাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে মায়া শব্দটার অর্থ কী, আমরা হয়তো কোন্‌কালে ভুলিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ঐ মায়া শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই' (*ভাষার অত্যাচার*)। তখন শব্দ হয়ে দাঁড়ায় শব্দের ভড়ং, কথার জন্য কথা বলে যায় লোকে, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছয় না সেটা, পৌঁছবার কোনো ইচ্ছেও থাকে না। নিজের অভিজ্ঞতায় সুকুমার জেনেছিলেন, কৃষ্ণলীলার সমর্থনে একজন তর্ক করছিলেন এইভাবে : 'সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণাশ্রিত পুরুষ তিনরকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অবিকারভেদ তিনপ্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী-প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন।' কথাগুলি যাঁকে বলা হচ্ছিল সেই বেচারা না কি তখন 'বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তরদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন' (*ভাষার অত্যাচার*)। শব্দের এই অর্থহীন এবং লক্ষ্যহীন ঘটাকে নিয়ে ঠাট্টা করবার জন্যই, এই প্রবন্ধটি লিখবার সঙ্গেসঙ্গেই, লেখা হলো 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর মতো আদ্যন্ত ব্যঙ্গনাটক। এর সমাজনির্দেশ নিয়ে নিশ্চয় কোনো সংশয় থাকে না।

কেবল যে 'শব্দকল্পদ্রুম' বা 'চলচিত্তচঞ্চরি'র মতো নাটকের কথাই ভাবতে হবে, তাও নয়। কোনো কোনো কবিতারও ক্ষেত্রে সামাজিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকতেই পারে। কেউ যখন দেখিয়ে দেন (প্র ৬৬) যে কলকাতার লাটসাহেব ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে অভয় দিচ্ছেন রাজনৈতিক কর্মীদের, বলছেন সন্দেহ হলে শুধু জেলে আনা হবে, কিন্তু এতে ভয়ের কিছু নেই, আর জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে ছাপা হচ্ছে এই খবর যে 'তিনি কাহাকেও রাজনৈতিক আন্দোলন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন না', আর ঠিক আষাঢ়ের 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'ভয় কিসের' নাম দিয়ে ছাপা হচ্ছে 'ভয় পেয়ো না' কবিতাটি, তখন এর মধ্যে একটা উৎসগত যোগ দেখতে পাওয়াকে অস্বাভাবিক ঠেকে না। কিন্তু তখনো মনে রাখা দরকার যে যোগটা উৎসগত-ই, তাৎপর্যগত দিক

থেকে এই উৎসকে অতিক্রম করে যাবার সামর্থ্যেই রচনাটির শক্তি, উৎসের রূপক হয়ে থাকাটাই তার ভবিতব্য নয়। ওই সামর্থ্য তাকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনুরূপ আরো অনেক ঘটনান্তরের সঙ্গে নিমেষেই যুক্ত করে নিতে পারে। সেইজন্যেই, সংগতভাবেই, অন্য একজন বলেন (প্র ১০৮) যে 'শক্তিমানের আদরে দুর্বলের প্রাণান্তকর অবস্থা ঘটার যে ছবি "ভয় পেয়ো না" কবিতাটির উপজীব্য', ইচ্ছে করলে তার মধ্যে কেউ ইন্টারন্যাশানাল মনিটারি ফান্ডের ভারতপ্রেমিকতার ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পারেন। কথাটা নিশ্চয় এ নয় যে তেমন-কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সুকুমার রায়ের কল্পনার মধ্যে ছিল। কথাটা এই যে, কোনো সূত্রকে ধরে নিয়ে একটা চিরন্তন প্রবণতাকে — শক্তিমান আর দুর্বলের সম্পর্ককে — মর্মান্তিক কৌতুকে সাজিয়ে ধরতে পেরেছিলেন তিনি, আর সেইজন্যেই তুলনীয় যে-কোনো প্রসঙ্গেই সেটা আমাদের কাছে ব্যবহারযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। ছড়া আর ছবিতে মিলিয়ে ল্যুইস ক্যারলের 'জ্যাবারওয়কি' একটি অল্পবয়সী ছেলের কথা বলে, বলে সে কী ভাবে জিতে নিচ্ছে মস্ত এক দানবকে। একজন সমালোচকের (Kathryn Hume, *Fantasy and Mimesis*) মনে হয়েছিল ছড়ার সঙ্গে লগ্ন ছবিটি খুব অসংগত, কেননা ছেলেটিকে এতই বাচ্চা করে আঁকা হয়েছে যে তার হাতের বিশাল তরোয়ালটাকে সে তুলতে পারবে বলেই মনে হয় না, যুদ্ধ জেতা তো দূরের কথা। এই অসংগতির মধ্যেই যে মজাটা লুকোনো, সেটা কেন তাঁর নজর এড়াল জানি না, কিন্তু ভিয়েৎনাম যুদ্ধের শেষে কারো যদি মনে পড়ে ওই ছড়াছবির কথা, ক্ষুদের কাছে বিরাটের পরাভবের কথা, তাতেও নিশ্চয় আপত্তি করবার কিছু নেই। কেননা, কবিতা প্রায়ই এমন সর্বনাম হয়ে ওঠে, অনেক প্রসঙ্গেই তাকে যুক্ত করে দেখতে ইচ্ছে হয়, যুক্ত করে দেখা সম্ভবও।

কিন্তু যুক্ত করে দেখা হলো এক কথা, আর তাকে মানে বলেই সাব্যস্ত করা হলো ভিন্ন জিনিস। এই মানের খোঁজ করতে গিয়ে অনেকসময়ে যে সুকুমার রায়ের লেখাগুলিকে একমাত্রিক রূপকের ছাঁচ দিয়ে ভাবি, তাতে তাঁর কবিত্বকে খাটো করেই দেখা হয়। 'আবোল তাবোল'কে তিনি খেয়ালরসের বই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবন আর রচনাকে মিলিয়ে নিয়ে আমরা এই মাত্র ভাবতে পারি যে এ খেয়ালরস কল্পখেয়ালের নয়, সমাজখেয়াল থেকে এর জন্ম। তাই এর আজগবিতে বাস্তবকে ওলটপালট করে দেখবার একটা মজা আছে, অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের অনেক শব্দকৌতুকের উদ্ভ্রান্ত ছটার মতো সেটা একেবারে কোনো বিশৃঙ্খল নিরর্থকতার দিকে নিয়ে যায় না। সুকুমার রায়ের নিরর্থকতার মধ্যেও একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেই অর্থ খুঁজবার বা সমাজচেতনা খুঁজবার অত্যুৎসাহে যদি তাকে কোনো কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাসূত্রে লগ্ন করে দিই, ছকবাঁধা লজিক দিয়েই বুঝতে চাই তাকে, যদি বলতে চাই যে 'কুমড়োপটাশ' হলো চীনদখলকারী জাপানি জুজুর রূপক (প্র ৬২), কিংবা যদি ভাবি যে 'ছায়াবাজি'তে আছে 'a reference to the swadeshi-hunters and the Brahmos trying to capture life in their dogmas' (Andrew Robinson, Miscellany), তাহলে এই রচনাগুলির মৌলিক সৌন্দর্যটাই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন আর চোখে পড়তে চায় না যে, বস্তুজগৎকে বিশেষিত ভাবে দেখবার তাঁর গভীর কবিত্বময় শক্তি ছায়াকেই কত বিচিত্র রূপে দেখতে পায় ওই ছড়ায়। ছায়ার সঙ্গে যে কুস্তি করে মরছিল, বেঁধে ফেলতে চাইছিল আর কাজে লাগাতে চাইছিল অলীকভাবে, সে নিশ্চয় এক খ্যাপাটে বাতিকগ্রস্ত মানুষ, যেমন নানা বাতিকে ভরা লোকজনকে আমরা হামেশাই দেখতে পাই

জীবনে। কিন্তু সেইটুকুর পরেই তার খেয়ালসূত্রে যেসব ছায়ার কাছে আমরা পৌঁছই, কত-না তার পরিচয় : রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, শিশিরভেজা সদ্য ছায়া, গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া, হালকা মেঘের পানসে ছায়া, 'পাৎলা ছায়া ফোকলা ছায়া ছায়া গভীর কালো' আর কেবলই সরে সরে যায় যে ছায়া : 'গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়' ! আমাদের দেখার চোখটাই কি অনেক বেড়ে যায় না তখন ? এই কবিতাটির সঙ্গেই 'সন্দেশ' পত্রিকায় সেবার ছাপা হয়েছিল 'ছায়া' নিয়ে এই ধাঁধা : 'সূর্যের প্রসাদে আমি সবা সাথে ঘুরি/সারাদিন কত রূপে কত লুকোচুরি.....'। 'কত রূপ' এই কথাটা আমরা সহজেই বলে দিতে পারি, কিন্তু সেই রূপের বিচিত্র ছবির জন্য দরকার হয় কবির চোখের, দরকার হয় শিল্পীর। কোনো-একটি অতিনির্দিষ্ট সামাজিক অভিপ্রায়ের মধ্যে আবদ্ধ দেখতে গিয়ে 'আবোল তাবোল'-এর সেই বিচিত্রদ্রষ্টা কবিকেই যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তো আমাদেরই ক্ষতি। তখন, ব্যঙ্গের অংশটাকে অতিপ্রকট করে তুলে এর ভালোবাসার অংশটাকে হারাই আমরা, হারাই চোখে-দেখার আর জীবনের নানা মুহূর্তের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার আনন্দ।

বরং এইভাবে ভাবাই ভালো যে সুকুমার রায়ের লেখায় আছে এক সচেতন মনের ভূয়োদর্শন। পুরোনো সমাজে একটা সময় ছিল যখন বিদ্যেবুদ্ধিমর্যাদায় একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত হতেন, জীবনের অনেক সার কথা তিনি বেঁধে দিতে পারতেন সূত্রাকারে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে, সাংসারিক জ্ঞান থেকে, নিজের বোধের মধ্যে তিনি নিয়ে আসতে পারতেন অনেক মূল সত্যকে। সূত্রবদ্ধ তাঁর বা তাঁদের সেই সত্যোচ্চারণ ছড়িয়ে যেত মুখ থেকে মুখে, আর এইভাবেই তৈরি হয়ে উঠত এক-একটা সমাজগোষ্ঠীর নানা প্রবাদপ্রবচন। কোনো একজনের মুখ থেকে এলেও সেটা একজনের সম্বল হয়ে থাকত না আর, একজনের দ্বারা চিহ্নিতও থাকত না, সেটা হয়ে উঠত সকলেরই নিজের নিজের কথা। আধুনিক সমাজ এই ধরণের সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। কিন্তু কখনো কখনো, সুকুমার রায়ের মতো কোনো প্রতিভার কাছে আমরা তাকেও যেন কিছু পরিমাণে সম্ভাবিত হতে দেখি। একটিদুটি ঘটনাকে লক্ষ করে ছড়া বাঁধেননি সুকুমার রায়, তাঁর সমস্ত সমাজদৃষ্টিকে অন্তর্মূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পেয়েছেন তিনি আমাদের নানারকমের ব্যাধি, বোধ করেছেন করুণা, তারপরে তাকে প্রকাশ করেছেন একটা উলটো খেয়ালের ফুর্তিভরা ছাঁদে। আর তার ফলে, একইসঙ্গে তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি অফুরন্ত কৌতুককণা, জীবনের সঙ্গে মমতাময় সংযোগের বোধ, আর এইভাবে তাঁর উচ্চারণগুলি আমাদের জীবনে গেঁথে আছে যেন প্রবাদতুল্য। মনে হয় না যে আধুনিক কালের আর কোনো কবির রচনা এমনভাবে আমাদের প্রতিদিনের খানাখন্দেব সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মনে হয় না আর কারো লাইন এত ব্যাবহারিক ভাবে কাজে লেগে যায় প্রতিদিন, জীবনের নানা অপ্রত্যাশিত পরিবেশের মধ্যে। 'গোঁফেব আমি গোঁফেব তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা' 'মন্দ নয় সে পাত্র ভালো' 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়' 'মন বলে তায 'খাব খাব' মুখ চলে তায় খেতে' 'তেড়েমেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা' 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা' 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না' 'শিবঠাকুরের আপনদেশে আইনকানুন সর্বনেশে' 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা' 'বামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা' 'সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে' কিংবা এ-রকম আরো অনেক অনেক লাইন, কিংবা অনেক চরিত্র, যে-কোনো পরিবেশে আমরা এদের

প্রায় প্রবাদেরই মতো প্রয়োগ করে খুশি হই। এই যেমন এই লেখাটি লিখতে লিখতে এখনই আমার বলতে ইচ্ছে করছে 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা'।

বহুদর্শিতায় ভরা আনন্দময় এই সামর্থ্যই সুকুমার রায়ের রচনার যথার্থ সামর্থ্য। আনন্দ কথাটাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনতে হলো এটা আরেকবার মনে করিয়ে দেবার জন্য যে হাসির কথা শুনলে যাদের মনে হয় 'হাসব না-না না-না', বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া হতে যাদের আপত্তি, শ্যামাদাসের মতো যারা সবকথাই পাঁচ মিনিটে বুঝিয়ে দেবার অছিলায় পৌঁছে যায় 'পঞ্চভূতের মূলেতে', তাদেরই বিরুদ্ধে সুকুমার রায়ের লেখা। তাঁর লেখা আমাদের এই জীবনযাপনকে আরো একটু সহনীয় করে তুলবার ফুর্তিভরা উপাদান।*

* 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকাব বিশেষ সুকুমাব রায় সংখ্যাব (বিভিন্ন প্রবন্ধের ইঙ্গিত আছে এই লেখায়। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রয়োজনমতো পৃষ্ঠাসংখ্যাব নির্দেশ বাখা হলো।)



শিল্পী শ্রী বাধাকৃষ্ণান

সুকুমার রায় : দিশি ও বিলাতি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়
চেষ্টা ক'রেও খেই রাখা দায়।

এক-যে ছিলেন চেখ লেখক, ইয়ারোস্লাভ হাশেক (১৮৮৩-১৯২৩), জন্মেছিলেন ভারতবর্ষেরই মতো উপনিবেশে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পদানত বোহেমিয়ায়, তখনও তার নাম চেখোস্লোভাকিয়া হয়নি, তবে মৃত্যুর আগে হাশেক বোহেমিয়া ও শ্লোভকিয়ার স্বাধীন রূপ চেখোস্লোভাকিয়াকে দেখে যাবেন। হাশেকের বর্ণবহুল জীবনকথা নিয়েই হয়তো রোমাঞ্চকর ও হাস্যোচ্ছল কোনো কাহিনী ফেঁদে বসা যায়, একফোঁটাও রং চড়াবার দরকার না-হ'লেও মনে হবে বুঝি একেবারেই বানানো গল্প। হাশেক যখন 'প্রাণীজগৎ' নামক জীববিদ্যার সাময়িকপত্রের সম্পাদক, তখন তিনি এমন-সব পশুপক্ষী সম্বন্ধে স্বকপোল উদ্ভাবিত পরিচিতি লিখতেন, এই ভূমন্ডলে যাদের কোনোই অস্তিত্ব ছিলো না, এবং এখনও নেই। গোড়ায় পন্ডিতেরা সবাই বোমকে গিয়েছিলেন, মস্ত-মস্ত কেতাব পড়েছেন তাঁরা, দেশবিদেশের নানা জঙ্গলে ঘুরেও বেড়িয়েছেন — কিন্তু এমন-সমস্ত জীবজন্তুর কথা তাঁরা পড়েননি, শোনেনওনি চোখেও দ্যাখেননি। পরে বেরিয়ে গেলো যে এ-সমস্তই হাশেকের ধাপ্পা; যা মাইনে পেতেন তাতে পুথিপত্তর ঘেঁটে জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ লেখা তাঁর ধাতে পোষায়নি, মাথা ঘাটিয়ে তিনি এ-সব নেই-জন্তুর কাহিনী ফেঁদে বসতেন; তবে খোদার ওপর খোদকারি সাময়িকপত্রের মালিকেরা মোটেই সহ্য করতে পারেনি ব'লে কিছুদিন পরেই হাশেককে বরখাস্ত ক'রে দেওয়া হ'লো।

সুকুমার রায়ও — না, কোনো 'প্রাণীজগৎ' বা 'জীববিদ্যার' কাগজে নয় — তবু আর্থার কনান ডয়েলের 'অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের প্যারডি ক'রে 'হেসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' লিখেছেন — যেখানে অদ্ভুত সব জীবজন্তুর পেটে খিল-ধরানো, নাকেমুখে দমফাটানো আবির্ভাব হয়েছিলো — যাদের নাম হেসোরাম হুঁশিয়ার দিয়েছিলেন 'বাংলাতিনে'*। হয়তো সুকুমার রায়ের অগোচর ছিলো না এডওয়ার্ড লিয়ারেরও (১৮১২-১৮৮৮) স্বচিত্রিত প্রাণীবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার বইগুলো, নামগুলোর মকলাতিন ভঙ্গিমা বা ছবিগুলোর উদ্ভুট্টি ধরন তারই ইঙ্গিত দেয়। তবে সুকুমার রায়ের খিচুড়ি জীবগুলো খোদার ওপর খোদকারির চাঞ্চল্যকর নমুনা — এইচ জে ওয়েল্‌স-এর ডক্টর মোরো এর ল্যাজা ওর মুড়ো কেটেকুটে জোড়াতালি দিয়ে যে-সব জীবজন্তু বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো, সুকুমার রায়ের হাঁসজারু, হাতিমি ইত্যাদি তাদের তুলনায়, মানতেই হয়, অনেক সফল — শব্দের তোরঙ্গই শুধু নয়, ছবিরও জোড়কলম, যেখানে তিনি খাদ্য

* এই জোড়কলম বা তোবঙ্গ শব্দটি পেয়েছি শ্রী শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

ও খাদককেও জুড়ে দিতে পেছ-পা হননি (সিংহরিণ যার নমুনা), snake আর shark মেশানো লুইস ক্যারলের snark-এর চেয়েও সেখানে একধাপ এগিয়ে গেছেন সুকুমার রায়।* তিনি আবিষ্কার ক'রে বসেছিলেন চমৎকার এক শব্দের খেলা, অন্যরকম একটা নিয়ম, যার ফলে যোগসাজশ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন হাঁস আর সজারু, বক আর কচ্ছপ, হাতি আর তিমিতে, কেননা একটির শেষ বর্ণে অন্যটির প্রথম বর্ণের ধ্বনি বেজে ওঠে, জুড়ে যায় আলাদা-আলাদা সব জীবজন্তু আর ভানুমতীর খেলা আরো জ'মে ওঠে যখন তাদের সঙ্গে তিনি চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেন ছবিতে; যা হয় না, হাত সাফাই ক'রে ম্যাজিশিয়ানের মতো তাকে বানিয়ে দিতে গেলেও ধীরে ধীরে উলটো বা অন্য একটা যুক্তি তৈরি ক'রে এগুতে হয়, যে-কারণে মিলে যেতে পারে খাদ্য ও খাদক, ভক্ষক ও ভক্ষ্য, সিংহ ও হরিণ : হরিণের নিরামিষভোজন শেষ হয়, সিংহের শিং নেই এই কষ্ট ঘুচে যায়। হাতি ও তিমিরও মিলতে বাধা নেই, বাধা নেই মিলে-মিশে হাতিমি হ'য়ে উঠতে, কিন্তু 'বাঘে-ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে', কেননা তাদের মিশোল থেকে কোনো অসম্ভব জন্তুরই ধ্বনিভিত্তিক উদ্ভব সম্ভব নয়। যেমন বলেছি, এইচ জি ওয়েলসের গল্পের ডক্টর মোরো বহুরকম ব্যবচ্ছেদ ও জোড়াতালি করতে পারে কিন্তু বাঘ ও ছাগলকে মেলানো তারও বিবিধার্থসাধক ছুরি-কাঁচি-আঠার পক্ষে সম্ভব হ'তো কিনা সন্দেহ। কিন্তু "খিচুড়ি" ও "আড়ি" কবিতার এই সহাবস্থানই শেষ নয়। সুকুমার রায় এই জোড়কলম শব্দ বানাবার মজার খেলা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে যান, অনেক দূরে এগিয়ে যান এমনকী কনান ডয়েলেরও প্যারডি করা থেকে — যখন তিনি তৈরী ক'রে বসেন মাত্র দুটি ল্যাজ আছে ব'লে বিমর্ষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বা সর্বপ্রকার হাসির ঠারঠোরের বিরোধী রামগরুড়ের ছানা, কিংবা হারুদের অপিসের ট্যাঁশগোরু (যাদের আজকাল হামেশা ও আখছার দেখছি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির সৌজন্যে) — কিংবা আরো এগিয়ে যান যখন তিনি তৈরি ক'রে বসেন কিম্ভূত — যেটা তাঁর

* সুকুমার রায় অবশ্য অন্য দিকটাও দেখিয়েছেন "আড়ি" কবিতায়

কিসে কিসে ভাব নেই ? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে —
বাঘে-ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।
শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি,
সাপে আর নেউলে তো চিরকাল বৈরী।
আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনোদিন সে ?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।
তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি ?
ছ্যাঁক ছ্যাঁক রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

কিন্তু এই "আড়ি" কবিতাটি আছে ব'লেই 'আবোল তাবোল'-এর "খিচুড়ি" কবিতাটির মজা আরো বেশি — এই জন্তুদের সত্যি তো আর জুড়ে দেয়া যায় না, তবে জুড়ে দিতে পারলে কী মজাই না হ'তো। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।

যা হয় না, "খিচুড়ি" কবিতায় তাকেও ঘটিয়েছেন ভোজবাজির কারিগর সুকুমার রায়।

দিশিবিলাতি যাবতীয় প্রেরণাকে পেরিয়ে গিয়ে তৈরি করে দেয় অন্য-একটা অর্থের জগৎ — সারূপ্যের সংকট কিম্ভূতের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন ক'রে মহা অনর্থ বাধিয়ে বসে। এক ভবঘুরে পঞ্চাশের দশকে হৈ-হৈ ক'রে গান গেয়েছিলো যে তার জুতো জাপানি, পাৎলুন ইংলিশস্তানি, মাথায় লাল টুপি রুশী, আর দিলখানা হিন্দুস্তানি — যেরকম জীবকে আন্তর্জাতিক বাজারের কল্যাণে হরদম আমরা মোলাকাৎ করছি। কিন্তু সুকুমার রায়ের হিংসুটে কিম্ভূত এর-ওর-তার থেকে এটা-ওটা-সেটা নেবার পর আচমকা একসময় আবিষ্কার ক'রে বসে :

নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ, বিচ্ছু,
মৌমাছি, প্রজাপতি, নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাঙ গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতো, নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, চেষ্টা করেও খেই রাখা দায়।

শুরু হয়েছিলো খিচুড়ি জীব দিয়ে, শেষ অব্দি এসে পৌঁছুনো গেলো না-জীবে, না-জলমাটিতে, কিছুই-না তে। বাবুরাম সাপুড়ে যদি কোনোক্রমে দাঁত-নখ-শিং টুঁশঢাঁশ ফোঁসফাঁস বাদ দিয়ে সাপের — সে কিংবদন্তিরই হোক, বা সত্যিকারই হোক — সাপত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে ফর্মাশ মাফিক কোনো একটা সাপকে এনে হাজির ক'রে দেয়, তবে অর্থের একটা অন্যরকম কুটকুটুনি শুরু হয়ে যায় : এ হ'তে পারে জীবনের দুঃখ কষ্ট হাসি কান্না ঘাতঘোত সব বাদ দিয়ে এমন জীবনের জন্যে আব্দার যেটা মধ্যবিত্তের পক্ষে বিপুল আরামপ্রদ; অথবা বিদেশি সরকারের কাছে দাঁত-নখ সব কেটেকুটে চকচকে রেকাবিতে স্বরাজকে সাজিয়ে এনে দেবারও বায়না হ'তে পারে, যেটাও বাবুদের কাছে চমৎকার লাগতো। "খিচুড়ি'তে এই জীবের সঙ্গে ঐ জীবকে জুড়ে দেয়া গিয়েছিলো দুই শব্দের অন্ত্য ও আদ্য বর্ণের সম্মেলনে, বিভিন্ন জীবের বিবিধ গুণপনা অর্থাৎ প্রবণতা ও শরীরী রূপ জুড়ে দিয়ে তৈরি করা যায় কিম্ভূত কিছুই-নাকে; আর কোনো জীবের সবকিছু ছাঁটাই ক'রে দিয়ে উলটো প্যাঁচ করে তৈরি করা যায় 'না-সাপকে'*। সুকুমার রায়ের লেখার যেটা বৈশিষ্ট্য, কল্পনা এক জায়গায় থেমে থাকে না, 'ছুটলে কথা থামায় কে/আজকে ঠেকায় আমায় কে', তৈরি হয় গতি, নানারকম মোচড়, নিছক আমোদ বা 'অবিমিশ্র হাস্যরসের' মহল্লা পেরিয়ে এসে আমরা এসে পৌঁছুই সমাজেরই অনর্থ আর অসংগতির কেন্দ্রগুলায় — আর সমাজ, যেটা বিশেষ সমাজ, সময় আর জমি দিয়ে একটা ঘেরা জায়গা, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার বঙ্গসমাজ — তথা ভারতীয় সমাজ।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। যখন 'স্ট্রুভেলপেটার' (ঝাঁকড়াচুল পিটার) — আলেমান সাবধান করা ছড়ার রাজ্য, ভয় দেখানো ভয়ানক, নিয়মমতো না-চললে, বড়োদের কথা না-শুনলে কী হয়, তারই বিকট, ভয়াবহ, 'চমৎকার' ছড়াছবির বই; ভালো-ভালো সব উপদেশ দিয়ে, ছোটোদের সব ছেলেমানুষি ছেঁটে দিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যাঙ্কের মাছিমারা কেরানি বা হেড

* "বাবুরাম সাপুড়ে"র বাবুটির আদিখ্যেতা ও আব্দারের একটা ব্যাখ্যানা হিসেবে মৎ-কৃত রচনাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যেটা বেরিয়েছিলো অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়'এ, সব গুরুগম্ভীর পণ্ডিতি লেখার মাঝখানে।

আপিশের বড়োবাবু তৈরি করবার ফতোয়া দেয়া যে-বই, তার সমস্ত উদ্ভাবনীতে তারও হো-হো হাসির উদ্রেক করার শক্তি ছিলো বৈ কি! হিলেয়ার বেলক যাকে অবলম্বন ক'রে পরে লিখবেন তাঁর 'কশনারি টেলস' — বাহবা পাবার মতো প্যারডি — যার ছবি একসময় আঁকবেন এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্‌ট্‌লির ছেলে নিকোলাস বেন্‌ট্‌লি, যিনি পরে টি এস এলিয়টের বেড়ালদের নিয়ে কবিতার বইটিরও চমৎকার ছবি আঁকবেন। কিংবা ভাবা যাক ভিলহেল্‌ম বুশের স্বচিত্রিত ছড়ার কাহিনীগুলো : স্ল্যাপস্টিক কমেডির মতো তার হুড়মুড় ঘাড়মুখ গুঁজে থুবড়ে পড়া গতি, কাকতাল আর দুর্ঘটনায় দুড়দাড় ভরপুর, হাসতে-হাসতে যখন দম ফেটে যায়, যখন আমরা আবিষ্কার ক'রে আহ্লাদ পাচ্ছি এই বুঝি কমিকস্ট্রিপের বংশতালিকার আদিপুরুষ (ইলিউমিনেটেড ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট বা গাজির পট যদি না-ই হয়), তখন আমরা সেই সঙ্গে আবিষ্কার ক'রে বসছি সুকুমার রায় জানতেন হয়তো এদের, হয়তো সুদেও খাটিয়েছেন এদের, কিন্তু তাঁর হাতে প'ড়ে হরদম ও হামেশাই সব অন্যরকম হ'য়ে উঠছে। প্রতিভার ধরনই এই — কেউ-কেউ হয়তো সবজান্তার ভঙ্গিতে এর মধ্যেই ব'লে বসেছেন।

যে-কোনো উৎকৃষ্ট রচনাই সমাজের ভেতরকার চাপা উগ্র টানাপোড়েন থেকে উঠে আসে। হোক না উদ্ভট, আষাঢ়ে, খেয়ালি, তার একটা পা থাকতেই হয় সমাজের শক্ত জমিটির ওপর। প্রতিভা তাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে উলটে-পালটে 'শেক দি বটল! শেক দি বটল!' বলতে-বলতে নানা রকম ভাবে ব্যবহার করতে পারে — সোজাসুজি যদি না-ও হয়, ঘুরিয়ে, তির্যকভাবে দেখিয়ে দিতে পারে সমাজের অসংগতিগুলো। অতএব, বলার অপেক্ষা রাখে না, যে, তার জন্যে সপ্তসাগর পেরিয়ে যাবার দরকার পড়ে না। এটা তাই অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত বা অতর্কিত ছিলো না যে ইংলন্ডে যে ননসেন্স সাহিত্যের উদ্ভাবনা ও প্রসার হ'লো সেটা নাদুশনুদুশ ভিক্টরিয়ার আমলে সাম্রাজ্যের যখন মস্ত দাপট, যখন মস্ত হৈ-হৈ উঠেছে হিতবাদী (তথাকথিত) উপযোগিতাবাদ নিয়ে। লৌকিক সাহিত্যে চিরকালই আষাঢ়ে বা উদ্ভটের একটা ছাপ, 'স্পেস', 'অবকাশ' থাকে — এই ননসেন্স ঠিক লৌকিক সাহিত্যের ধারা থেকে আসেনি। শিল্পবিপ্লবের পরে, যন্ত্রযুগের সর্বগ্রাসী দাপটের সময়, যখন তথাকথিত হিতবাদী উপযোগিতাবাদের বমরমা চলেছে, তখনই তার বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহ জেগে উঠেছিলো এডওয়ার্ড লিয়ারে, লুইস ক্যারলে। কনভেয়ার বেল্‌ট্‌ থেকে যেমন সব জিনিশ একই রকম বেরিয়ে আসে, হুবহু অবিকল একরকম — আর তা যদি না-হয় তবে তাকে বাতিল ক'রে দিতে হয়, কেননা তার মধ্যে আগমার্কা দেওয়া নেই — তেমনিভাবে প্রকৌশলী সমাজ চেয়েছিলো সব মানুষকে একছাঁটে এক মাপে তৈরি ক'রে দিতে — ঠিক যেন কলে-তৈরি জীব, ১৯২১ সালে চেখ লেখক কারেল চাপেক যার নাম দেবেন 'রোবোট' — বোতাম-আঁটা ইস্ত্রিকরা রজকপোষ্য জামার তলায় যে-বুকটা সে ঢেকে রেখেছে, তাও যেন একরকম হয়, এই ছিলো উপযোগিতাবাদের দাবি — গণতন্ত্রের নাম ক'রে সে বলেছিলো সবাই সমান, সবাই একরকম (যদিও আসলে কেউ-কেউ ছিলো অন্যদের চেয়ে বেশি সমান)। সেই-যে কবে কোন্‌-একজন গ্রীক ছিলো যে সবাইকে সমান ক'রে দেবার জন্যে ('গণতন্ত্রে তো সবাই সমান!) একটা দুর্দান্ত কায়দা বার করেছিলো — একটা খাটিয়া ছিলো তার 'প্রমাণ মাপের', তাতে শুইয়ে কাউকে যদি দেখা যেতো বড্ড বাড় বেড়ে গিয়েছে তবে ঘ্যাচাং ক'রে পা কিংবা মুন্ডুটাই উড়িয়ে দিয়ে সমান ক'রে নেয়া যেতো। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র যেমন সবাইকে

একটা উর্দি, কিংবা স্ট্রেটজ্যাকেট, পরিয়ে দিব্য সমান ক'রে আনে। এডওয়ার্ড লিয়ারে তাই তার উলটো — অজস্র মানুষের এক শোভাযাত্রা সেখানে, যারা কিছুতেই হুবহু আরেকজনের নকল, বহুজনের মধ্যে নিজত্ব হারানো একজন, হ'তে নারাজ। They নামক অগণন সংখ্যা তাদের বিরুদ্ধে মহা খাপ্পা, অথচ এই বোকা গোঁয়ার খ্যাপা পাগল নিরীহ অসহায় অন্যরকম লোকেরা তবু কিন্তু এই দোর্দন্ড শাসন মানতে গররাজি। ভিক্টরিয়ার ইংলন্ড দিব্যি উপনিবেশ শোষণ ক'রে সব্বাইকে 'দুধেভাতে' রেখেছে, ভালো রেখেছে, সুখে রেখেছে, এই ফানুশ তারা ফাটিয়ে দেয়। লুইস ক্যারলে হরতনের বিবিসাহেবা স্বয়ং ভিক্টরিয়া কিনা, হামটি-ডামটি বা গ্ল্যাডস্টোন-ডিসরেলি কোন্ ছদ্মবেশে আজব দেশে বা আয়নার মুলুকে খেলা করছেন, গণতন্ত্র হ'লেও, আন্তর্জাতিক দাবার চাল থাকলেও অ্যালিস সত্যি-সত্যি রানী হ'তে পারবে কি না — স্নার্ক-এর অ্যাডভেঞ্চার সাম্রাজ্যবিস্তারের নাব্য অভিযানেরই ভোল-পালটানো সাত কাহন কিনা — এ-সব খটকার উত্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমালোচক দিয়েছেন, অবশ্যই 'কেউ বা বুঝে পুরোপুরি, কেউ বা বুঝে আধা'। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে অ্যালিস কাহিনীর — মাথাপাগলার চায়ের আসর, খরগোশের হন্তদন্তভাবে ছুটতে-ছুটতে বারে-বারে ট্যাঁকঘড়ি দেখা আর বলা বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো, মুন্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলা, গোলামের বিচার, আফিমখোর গুবরেপোকার (কোলরিজের?) বুঁদ হ'য়ে থাকা — এই সবের জীবন্ত চাঁদমারি বা লক্ষ্য কারা সেটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বার না-করলেও চট ক'রেই ধ'রে নেয়া যায় যে এ-কাহিনী উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে যাবার আগে রচিতই হ'তে পারতো না। এ মোটেই নয় ব্যারন মুনখাউসেনের চান্দ্র অভিযান ও কান্ডকীর্তির মতো। ডীন সুইফট যখন তাঁর গালিভারকে নানা আজব ও অদ্ভুত দেশে বারে-বারে নিয়ে ফেলেছিলেন, সে তো নেহাৎ আজব কিছু গল্প ফেঁদে নিছক মজা পাবার জন্যে নয়।

সুকুমার রায় অবশ্যই এঁদের পড়েছিলেন, প'ড়ে নিশ্চয়ই মজাও লেগেছিলো : অমনতর রচনার ভেতরকার কলকব্জাগুলো, নিয়মকানুনগুলো যে সাধারণ অন্য লেখার চাইতে আলাদা সেটা তিনি ধরতেও পেরেছিলেন। 'ঝাঁকড়াচুল পিটার' বা ভিলহেল্ম বুশও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। ক্রিস্টিয়ান মর্গেনস্টার্ন (১৮৭১-১৯১৪) যখন তাঁর 'ফাঁসির গান' (১৯০৫)-এর মধ্যে 'বীভৎস মজার' অবতারণা করলেন, তখনও সেটা হয়তো তাঁর নজর এড়ায়নি। মর্গেনস্টার্ন তো ব'লেই ফেলেছিলেন ভণিতায়, গদ্যচালে, সোজাসুজি, তিনি কী করতে চাচ্ছিলেন : 'আমার কাছে মধ্যবিত্ত কথাটা বোঝায় একটা নিরাপদ, আরামপ্রদ, মধ্যপন্থার ধান্দাবাজি। সবকিছুর ওপর [এটা মানতেই হয়], আমাদের ভাষাটাই "মধ্যবিত্ত", আমাদের রাস্তার ঠিক মাঝখানে তার অবস্থান। তাকে একপাশে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, অথবা রাস্তাটা থেকেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া, যে মধ্যবিত্ত প্রচলের মধ্যে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে গা ঢাকা দিয়ে থাকি, তাকে টেনেহিঁচড়ে খোলবার চেষ্টা করাটাই নিকট ভবিষ্যতের সবচেয়ে জরুরি কাজ।' মর্গেনস্টার্নের মনে হয়েছিলো বেশিরভাগ লোকেই বাঁধাধরা ধরতাই বুলি ব্যবহার করে কোনোকিছু না-ভেবেই, শুধু আউড়ে যায় সে-সব জিনিশ যা তারা আগে শুনেছে, ব'লে যায় পুথিপড়া মুখস্থকরা কথা। 'বেশির ভাগ লোকেই কথা বলে না', বলেছিলেন মর্গেনস্টার্ন, 'তারা উদ্ধৃতি দেয়। কেউ হয়তো তাদের প্রায় সবকথারই আগে-পরে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হবেন, কারণ তারা নিজেরা কেউ তাদের বলবার কথাগুলোর রূপটাকে সৃষ্টি করেনি, বরং নিছক [প্রচল, বা] অভ্যাসকেই অনুসরণ করেছে।' লিয়ার

বা লুইস ক্যারলও ভাষা নিয়ে বিস্তর কটাক্ষ করেছেন, ভাষাকে বিস্তর খেলিয়েছেন — প্রচলনের বাইরে চ'লে গেছেন — যুক্তি আর কান্ডজ্ঞানকে উলটে দিয়ে তৈরি করেছেন নানা ধরনের হাসি। সুকুমার রায়ও ভাষা নিয়ে ভেবেছেন, প্যারডি করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, নাট্য তৈরি করেছেন : ভাষা নিয়ে আমাদের ভাবনা, অর্থ পাবার জন্য আমাদের নিরর্থ 'দোহনকে' তিনিও চেয়েছিলেন আঘাতে ঠাট্টায় টিটকিরিতে ঘায়েল ক'রে দেবেন — এবং আবিষ্কার করেছেন এই তথ্য যে এ-কাজ করবার একটা মোক্ষম উপায় প্যারডি কিন্তু প্যারলড একটা উপায়, কৌশল, পদ্ধতি — এবং এ-পদ্ধতি কারু দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হ'যে নেই, সিভিল সোসাইটি ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাস করে, কারিগরি সমাজ উদ্ভাবনের পেটেন্ট দেয় — কিন্তু প্যারডির পদ্ধতিটা এ-সব এক্তিয়ারেব বাইবেই পড়ে। "নাচের বাতিক" কবিতা প'ড়ে — সেই-যে

বযস হল অষ্টআশি, চিমসে গাযে ঠুনকো হাড,
নাচছে বুড়ো উলটো মাথায — ভাঙলে বুঝি মুন্ড ঘাড —

কারু যদি মনে প'ড়ে যায় লুইস ক্যারল-কৃত রবার্ট সাদির কবিতাব প্যারডি যেখানে বুডো ওয়ার্ডসওয়ার্থ উলটো মাথায় নেচে বাধা দিতে চাচ্ছেন টেকনোলজিব প্রতাপের সঙ্গে-সঙ্গে ল্যান্ডস্কেপের সর্বনাশ, প্রকৃতির দূষণ, তাহ'লে কী-ই বা এসে যায়। খেয়াল রাখা দরকার যে সুকুমার বায় হ-য-ব-ব-ল-র মধ্যে কিন্তু এই কবিতা দেননি।

প্রভাব কথাটা টাইম বোমাব মতো দপ্‌দপ কবে, টিকটিক করে। যাকে আমরা প্রভাব ব'লে ভাবি, সেটা অনেক সময় অন্যরকম বিস্ফোরণ ঘটিযে দিতে পারে। বাইরের দু-একটা মিল দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠে বলা যায় বটে ইনি এঁর তাঁর কাছ থেকে খুবলে-খাবলে অনেক কিছু নিয়েছেন, "কিম্ভূত" কবিতার জীবটিব মতো, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শেষটায় আমাদের বিস্তর ঝামেলাব চোরাবালিতে নিয়ে যেতে পারে। যাকে বলে অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য — তার দিকে কড়া নজর রাখা জরুরি। সত্যি-সত্যি কী করতে চাচ্ছিলেন, সেটাই খেযাল ক'বে দেখা উচিত। যে-রুমালটা বেড়াল হ'যে গিয়েছিলো, যে তাব নিজের স্বরূপ নিয়ে গোল পাকিয়ে দিযেছিলো রুমাল বেডাল চন্দ্রবিন্দু এইসব দিয়ে, আব তারপব বলেছিলো, 'ও তো বোঝাই যাচ্ছে — চন্দ্রবিন্দুর চ, বেডালের তালব্য শ, রুমালের মা — হল চশমা', সে মিলিয়ে যাবাব আগে চীশাযার বেডালের মতো হাসিটি 'ফুসকাযিত' বেখে গেলেও যে-চশমাটি দিযে গিয়েছিলো সেটা সুকুমার রায়েবই নিজস্ব। তাই উদো-বুধো, গেছো দাদা, কাক্কেশ্বর কুচকুচে, কালো ঝোললা পরা প্যাঁচা, শামলা পবা কুমির, হিজিবিজবিজ এবং আসামীবিহীন বিচারসভাটিব মিল খুঁজতে সপ্তসাগব পেরিযে বিলেতে মিল বা প্রভাব খুঁজতে বেরুনো আমাদের একটু মুশকিলেই ফেলবে। বরং আমরা এদের সন্ধান করতে পারি আমাদের দেশেই, তাব জন্যে ঠিকানা চাই বলছি শোনোব মতো চরকিপাকে ঘোরবারও দরকার নেই। "লক্ষ্মণেব শক্তিশেল"-এ আমরা তো দেখেইছি কেমন ক'রে মহাকাব্যের চরিত্ররা বাঙালি বাবু ও তাদের সেবায়েতে বদ্‌লে যায় — তারা না-থাকে বাল্মীকির সৃষ্টি, না-থাকে কৃত্তিবাসের। এমনকী উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোট্ট বামায়ণ' বা 'ছেলেদেব বামায়ণ'-এও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"-এর কুশীলবদেব পাত্তা মিলবে না।

এটা ঠিক যে সুকুমার বায় বিলিতি নার্সারি রাইমেব তর্জমা করেছিলেন, খিলখিল্লির মুলুকের দুই বেড়ালের যুদ্ধেব কথা লিখেছিলেন, তিনটে শুওরেব মাথায় টুপি নেই তা জানিয়েছিলেন,

"জালা কুঁজো সংবাদ" পরিবেষণ করেছিলেন, মূর্খ মাছির ফাঁদে-পড়া নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তবু মনে রাখতে হবে যে

এক যে ছিল সাহেব, তাহাব
গুণেব মধ্যে নাকেব বাহাব

ব'লে "অসম্ভব-নয়" ছড়া তৈরি হয় তা থেকেই একসময়ে বেরিয়ে আসে "খুড়োর কল" — যেটা গাধাত্ব নিয়ে কথা না-ব'লে আমাদের মধ্যবিত্ত বাসনার টানটোন ঘাতঘোৎ পাকচক্রকেই খুলে দেখিয়ে দিযে যায়।

সুকুমার রায় বিলেত গিয়েছিলেন পড়তে, পরে ছবিও এঁকেছেন কার্লো কল্লোদি অবলম্বনে প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল'-এর, জেমস ব্যারির 'পিটার প্যান' অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা'-র। কিন্তু বিলেতেই তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'হাস্যকৌতুক', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', পড়েছেন "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", "হিংটিং ছট", "জুতা আবিষ্কার"। তিনি জানেন লৌকিক কথা ও গাথা। অথচ তাঁর "দ্রিঘাংচু" ঠিক "হিংটিং ছট" নয়, তাঁর "ব্যাঙের রাজা" ঠিক লৌকিক গল্প নয়, তাঁর "বহুরূপী"'ব হদিশ অন্য-কোথাও মেলে না, তাঁর "ঝালাপালা" তৈরি হ'য়ে ওঠে শিক্ষাব্যবস্থা, চাটুকারিতা, সিডিশনের ভয়, ভদ্রলোক-চাকর সম্বন্ধ এইসব নিয়ে এক লাগসই ও লক্ষ্যভেদী নাটকে। প্রবচনের "নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার" বদ্‌লে যায় যখন রোগা এক ভিস্তিওলা ঢুকে পড়ে ধুবন্ধর এই প্রশ্নের হেঁয়ালির জগতে, ট্যাঁশগোরু যতই অদ্ভুত ঠেকুক, সে কিন্তু বিরাজ কবে হারুদের আপিশে।

সত্যি-বলতে, সুকুমার বায়ের তথাকথিত উদ্ভট জগৎ আমাদেব এই বাঙালি সংসারেরই অবদান। রচনার পদ্ধতি — যেমন প্যারডি, যেমন যুক্তিকে উলটে দেয়া, যেমন তৈরি-করা সাধ আর সাধ্যেব ভেতর দুস্তব ব্যবধান, যেমন আবিষ্কার-করা সঙের ভাবভঙ্গি, ভাঁড়েব জীবিকা ও দর্শন, যেমন আবিষ্কার-করা পাগলা দাশু বা ভবদুলালের ছাঁচটা — কতটা হাশেকেব শ্‌ভেইক, কতটা টিল অযলেস্পিগেলের — এগুলো কারু একচেটে কায়েমি সম্পত্তি নয়। সুকুমার রায়ের বৈজ্ঞানিক মানসই কাজ কবেছিলো তাঁর কল্পনাব তুখোড় উড়ালে, যেমন দেখিয়েছেন রবীন্দ্র নাথ। আমরা বরং ভালো করবো তাঁর বচনাব পদ্ধতি লক্ষ করলে, কেমন ভাবে তাঁর মন কাজ করে সেটা বুঝতে পারলে, আব এটাও যদি মনে রাখি যে তাঁর হাসি কখনোই কাতুকুতু বুড়োর মতো নয়, যাঁর সম্বন্ধে তিনি পই-পই ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছেন এই ব'লে .

আব যেখানে যাও না বে ভাই সপ্তসাগব পাব,
কাতুকুতু বুড়োব কাছে যেও না খববদাব !...
বিদঘুটে তাব গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশী,
শুনলে পবে হাসিব চেয়ে কান্না আসে বেশি।...
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় সয়ে,
গাযেব উপব শুড়শুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, "হোঃ হোঃ হোঃ, কেস্টদাসেব পিসি –
বেচত খালি কুমড়ো কচু হাঁসেব ডিম আব তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়োগুলো বাঁকা,
কচুব গাযে বঙ-বেবঙেব আলপনা সব আঁকা।

অষ্টপ্রহর গাইত পিসি আওয়াজ ক'রে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও ব্যকুম ব্যকুম ভৌ ভৌ ভৌ চিঁহি।"
এই না ব'লে কুটুৎ ক'রে চিমটি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে শুড়শুড়ি সে আপনি লুটোপুটি —
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি।

সুকুমার রায় নিজেই অন্তত ব'লে দিয়েছেন, আর যা-ই হোক, তাঁর হাসি মোটেই কাতুকুতু বুড়োর চিমটি বা শুড়শুড়ি থেকে গজায়নি — তিনি সচেতন ছিলেন সত্যি তিনি কী করতে চাচ্ছিলেন সে-সম্বন্ধে, তাঁর কবিতার-গল্পে-নাটকে বা কোনো-কোনো প্রবন্ধে। সত্যি-বলতে, যে-কোনো ভালো লেখকই জানেন তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কী, কী-রকম তার বাঁধুনি, কী তার ধরন, কোনখানে তাঁর অভিনবত্ব। 'আবোল তাবোল'-এর "কৈফিয়ৎ"এ তিনি তো সাবধান ক'রে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে খেয়াল বস "যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

২

সঙের ভাষা, রং, তামাশা
ফিচেল, ফাজিল, আজব, খাশা
এবং কিছু কীর্তিনাশা।

"সুকুমার রায়ের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধার বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও সচ্ছল গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।"

— এই কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ১.৬.৪০-এ সুকুমার রায়ের মরণোত্তর শিশুপাঠ্য গল্পের বই 'পাগলা দাশু'-র ভূমিকায়। যদিও 'অতীতের ছবি' ছাড়া নিজের কোনো বইই সুকুমার রায় দেখে যেতে পারেননি, তবু 'আবোল তাবোল'-এর যে-ডামি তিনি তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন — তা মরণোত্তর প্রকাশিত হ'লেও, ধ'রে নেয়া যায়, 'বই' হিশেবে তা পুরোপুরি তাঁরই রচনা; কোনো প্রকাশকের সুপরিকল্পনা বা খামখেয়াল তার পেছনে কাজ করেনি। সে-বইয়ের "কৈফিয়ৎ" শুদ্ধু তাঁর লেখা ছিলো : "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সুকুমার রায়ের লেখায় পাওয়া যায় 'অবিমিশ্র হাস্যরস', যদিও ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা তাঁর নজর এড়ায়নি। যদিও ভূমিকাটি

রচিত হয়েছিলো বিশেষভাবে 'পাগলা দাশু'-রই জন্যে, তবু আজ আমাদের ধ'রে নিতে বাধা নেই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম নিয়েই এ-কথা বলেছেন। সুকুমার রায় নিজে অবশ্য একটু অন্যরকমভাবে ভেবেছিলেন তাঁর 'সৃজনশীল' রচনাকে — তিনি বলেছেন তাঁর বই খেয়াল রসের, তার কারবার আজগুবি উদ্ভট অসম্ভবকে নিয়ে। অর্থাৎ হাস্যরসের নির্বিশেষ 'অবিমিশ্রতা' নয়, সুকুমার রায় নিজে জোর দিতে চাচ্ছিলেন তার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, বিশিষ্ট মেজাজ, তার নিয়মহারা বলগাহীন কল্পনার ওপর, যা সম্ভব-অসম্ভবের তোয়াক্কা করে না। অর্থাৎ খেয়াল রস ব্যাপারটাকেও তিনি একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে অনুরোধ করেছিলেন। নিছকই খামখেয়াল, হুয়িমসি, বাতিক, মাথার ছিট — না তারও বেশি, অন্য কিছু? নিছকই ননসেন্স? 'এক-যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভালো/রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো' — এইরকম কোনো ভাবনা, না তারও বেশি অন্যকিছু, উদ্দেশ্যময়, সচকিত, গোচরলক্ষ্য কোনোকিছুর উদ্দেশ্যে উদ্ভটের মারফৎ পাঠকদের সচেতন ক'রে তোলা?

এই প্রশ্নের উত্তর হাৎড়াতে গিয়ে আমরা অবশ্য ননসেন্সেরই কতগুলো মৌল বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ক'রে বসবো। সত্যি-বলতে, রবীন্দ্রনাথও যখন 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প' লিখবেন, তখন এ-বিষয়ে খেলার ছলে নানারকম টিপ্পনী করবেন। যেমন, সে-র একজায়গায় আছে:

আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশি।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

এলোমেলো অসম্ভবের দু-একটি নিদর্শনও রবীন্দ্রনাথ সেখানে দিয়েছিলেন:

"যদি বলো লাট সাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে শুঁটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের?"

আসলে,

"অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।" এই কারিগরি বা বাঁধুনি সম্বন্ধে সুকুমার রায় কিন্তু 'আবোল তাবোল'-এর গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন, যখন আমরা দেখি 'আবোল তাবোল'-এর প্রথম কবিতাতেই তিনি অসম্ভবের ছন্দের উল্লেখ করেছেন। ব্যাকরণ মানি না — সঙিনতোলা বন্ধনীর ভেতর জোরগলায় এই কথাটি ঘোষণা ক'রে তবেই অসম্ভবের ছন্দটি ধরতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়, আপাতদৃষ্টিতে "ব্যাকরণ মানি না" আর "অসম্ভবের ছন্দ" পরস্পরের বিপরীত ব'লে মনে হ'তে পারে — ছন্দের মধ্যে থাকে নিয়ম, যতিঃপাতের শৃঙ্খলা, কখন দম ফেলবো তার অনড় ও অমোঘ ইঙ্গিত, শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত বুনুনি; আর ব্যাকরণ না-মানার মধ্যে আছে বিদ্রোহ, আইনকানুন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার ঝোঁক, সব প্রচলের নিগড়কে ভেঙে ফেলার হৈ-হৈ চেষ্টা। যেটা হ'তে পারতো নিছক নৈরাজ্য, তার মধ্যে সুকুমার রায় আবিষ্কার করেছেন ছন্দের বুনুনি, ছন্দের বন্ধন। অর্থাৎ, এই দুইকে মিলিয়ে দিয়ে সুকুমার রায় কিন্তু তৈরি ক'রে ফেলেছেন অন্য-একটা জগৎ, যেখানে মামুলি ন্যায়শাস্ত্র আর শাবেকি ব্যাকরণবিধি কুপোকাৎ হ'য়ে গিয়ে তৈরি করে দেয় ভিন্ন একটা নিয়ম, ভিন্ন একটা শৃঙ্খলা। সুকুমার রায়ের সব অসম্ভবই কোনো ভিন্ন সম্ভব নিয়মের অধীন ব'লেই তাতে এমন দেদার মজা — সেইখানেই গ'ড়ে

উঠেছে তার বাঁধুনি, এলোমেলো অসম্ভবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। যেমন ক'রে থাকে সার্কাসের সং।

সার্কাসে যে সং সাজে, তাকে সব খেলা সব কসরতেই হাত পাকাতে হয়। সেইজনেই সে জানে কোন্ জায়গায় কী-রকম গোল পাকালে তার 'না-পারার' দমফাটা কেরামতি দেখে লোকে হাসবে। তার চাই নিখুঁত সময়জ্ঞান, ঠিক কোন্ জায়গায় কখন মোক্ষমভাবে নিয়ে আসতে হবে অপ্রত্যাশিতকে। সেয়ানা ওস্তাদ ছাড়া কে-ই বা পারে গাড়লের ভঙ্গি করতে?

সত্যি-গাড়ল, সত্যি-আকাট, সত্যি-হাঁদার সঙ্গে সেয়ানা গাড়লের মস্ত তফাৎ। সেয়ানা গাড়ল হ'লো এমন লোক যে এসেছে মুখোশ পরা নাচের মজলিশে, সবকিছুকে লাগসই মুহূর্তে, 'অতর্কিতে', ভন্ডুল, ক'রে দিতে — যেমন ভবদুলাল, যেমন পাগলা দাশু। যে বোকা সাজে আর যে নির্ভেজাল বোকা — এই দুইয়ের মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান আছে, তাকে নিপুণভাবে খেলাতে পারলেই তা হ'য়ে ওঠে শিল্প। মুর্খ ততক্ষণই শোভা পায় যতক্ষণ সে কথা কওয়া দূরে থাক, টুঁ শব্দটি করে না; যে মুর্খ সেজে হাসায় তাকে মুখে সারাক্ষণ খৈ ফোটাতে হয়। এই হাবা সাজা সহজ নয়, তার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক এলেম লাগে, লাগে বিস্তর অনুশীলন। সং — তার আছে সেই এলেম। সে সব কাজেই নাক গলায়, পারা না-পারার মধ্যে যে মস্ত ব্যবধানটা আছে তা সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কেননা সে-ই জানে কীভাবে বেমালুম হাতসাফাই ক'রে পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়ে আছাড় খেতে, বা খাওয়াতে, হয়। সে জানে ভোজবাজি — সে তৈরি করে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল, রগরগে প্রত্যাশা — এবং প্রত্যাশিতের মধ্যে সে নিয়ে আসে আচম্বিত ও আনকোরা অপ্রত্যাশিতকে। পরিচিত সংসারের মধ্যে সে নিয়ে আসে অপরিচিতকে, ডিগবাজি খাইয়ে, উলটে দিয়ে, কিম্ভূতকিমাকাব ভঙ্গিতে, কিন্তু তাকে তা আনতেই হবে, যেমন আনে ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতীর খেলার, স্বাভাবিকের মধ্যে হ্যাঁচকাটানে সে আমদানি করে অপ্রস্তুতকে, যেমন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মজা ক'রে:

যেটা যা হবেই থাকে সেটা তো হবেই —
হয় না যা তা-ই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মেব বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতেব ইস্কুলে তবে পাই ছুটি...
দুইয়ে-দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,
ভুল, তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই;
পাঁচে-সাতে পঁয়ত্রিশে কোনো মজা নেই।

সং, ক্লাউন, ভাঁড়, ম্যাজিশিয়ান, এমনকী মধ্যযুগের না-ধড়িবাজ না-আকাট 'দার্শনিক মুর্খেরা' যাদের শেক্সপিয়ার কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ে দেখা যায়, সেই যারা একটু খ্যাপা, 'সৃষ্টিছাড়া' পাগলমতো, অথচ দু-ফেরতা প্যাঁচ লাগানো কথা কয়, তারা কিন্তু জীবিকা বা জীবনদর্শন হিশেবেই এই দায়িত্বকে কাঁধে নিয়েছে। অন্তত এই কথা ভেবেই, পোল সমালোচক ইয়ান কোট বলেছিলেন, ভাঁড়ামি, সঙের কাজ — সে একটা জীবনদর্শন, এবং সেইসঙ্গে একটি জীবিকাও। আর এইভাবেই সে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে আবিষ্কার ক'রে বসে কিম্ভূতকে, কিমাকারকে, উদ্ভটকে। তাই উলটো দিকে রয়েছে পুরুৎ, অধ্যাপক, বাবুসাহেবরা। পুরুৎ সর্বনাশ দেখে কান্নায়

উদ্বেল, অন্যকেও সে ভয় দেখিয়ে শোকাহত বা স্তম্ভিত বা আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলতে চায়, লালন করতে চায় প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন, ধরাবাঁধা বাচনরীতির ও বাঁচনরীতির নির্মোক।*

কিন্তু ইতিহাস, হায় রে, কখনও হুবহু বা অবিকল কোনোকিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটায় না; যা ছিলো শোকান্তিক, দ্বিতীয় আবির্ভাবে সে হ'য়ে ওঠে প্রহসন — আর তৃতীয় বার, তারপরও যদি সে এসে হাজির হয়, তখন আর প্রহসনও থাকে না, হ'য়ে ওঠে নেহাৎই কিম্ভূত — মার্ক্সকে একটু টেনে বাড়িয়ে যেমন বলেছেন ইয়ান কোট। তখন ধাক্কা, ল্যাং, চিৎপটাং — এইসব কৃৎকৌশল চমকপ্রদ দার্শনিক চারিত্র্য অর্জন ক'রে বসে।

ভাঁড় পায়ের তলা থেকে শক্ত মাটি, কিংবা শূন্যে দোদুল্যমান দড়িদড়া, চমৎকার হাত সাফাই ক'রে সরিয়ে দেয়। পুরুৎ এই ঝোঝুল্যমান দড়িদড়া, সমাজের এইসব প্রপ, এতই পছন্দ করে যে তা দিয়ে শক্তসমর্থ জাল বানিয়ে আমাদের আটকে রাখতে চায় — কিংবা চায় চিৎপটাং পড়লেও ঐ জাল যেন আমাদের রক্ষা করে — অন্তত বিশ্বাস করাতে চায় যে তা-ই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে। একজন হো-হো ক'রে হাসে, অট্টহাসি যদি নাও হয় খিল-খিল, কিংবা কখনো-কখনো হাসির ছলে উদগার ক'রে দেয় শুষ্ক দীর্ঘায়িত ঘর্ঘরধ্বনি, নয়তো নিছক বিকট হাস্য ও কালান্তক দন্তবিকাশ ক'রে বসে — আই গো আপ উই গো ডাউন-এর পন্ডিতমশাই কৃত ব্যাখ্যান শুনে যা করেছিলো 'ঝালাপালা'-র ছাত্র দুটি।

ভাঁড়েরা কাজকারবার ফাঁদে উপস্থিতবুদ্ধিতে, উদ্ভাবনীশক্তির নৈপুণ্যে, উপহাসে পরিহাসে। তাদের ভাষায় হেঁয়ালি থাকে, তবে তা পুরোপুরি দুর্বোধ্যও নয় : 'কেউ বা বুঝে পুরোপুরি, কেউ বা বুঝে আধা' — বলেছিলেন সুকুমার রায়। কখনো তারা অবস্থার জট পাকায়, প্যাঁচ কষায়, ফন্দি আঁটে, কথায় কথা কাটে; কথায় এদের সঙ্গে এঁটে ওঠবার জো নেই; আর কথা — সে কি সহজে থামতে চায় না কি — ছুটলে কথা থামায় কে — এবং কাটা ঘায়ে নুন ছিটোয়। অন্যজন, অর্থাৎ পুরুৎ বক্তৃতা করে, ফতোয়া দেয়, জিগির তোলে, বোঝাতে চায় কেন বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা উচিত অথবা কোনো কোনো বদমায়েশকে আঁতুড়ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিলো। আর এই দুই জীবিকা ও দর্শনের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান দেখে পোল দার্শনিক লেশেক কোওয়াকোভস্কি কিন্তু আরো একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন; তাঁর মনে হয়েছিলো ভাঁড়েরা হ'লো পদচ্যুত পুরোহিত, বা বিদূষক বাচস্পতি, বা সমাজের বিশ্বাসহন্ত পান্ডা। তার ধারণাটাকে ব্যাখ্যানা ক'রে কোওয়াকোভস্কি একবার বলেছিলেন :

ভাঁড় বলে তাকেই, সমাজের উঁচু মহলে যাব আনাগোনা ও মাখামাখি, অথচ সব সত্ত্বেও যে তার অংশ নয়, সে [বরং] সেই সমাজেব সবাইকেই চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি শোনায়, যে তিক্তকষয় কথায় কশাঘাত কবে। সে যদি পুরোপুরি এই সমাজের অংশ হ'তো, তবে তার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব হতো না, তাহ'লে সে নেহাৎই বৈঠকখানার [বা চন্ডীমন্ডপের] সেই উটকো লোকটা হ'য়ে উঠতো যে কেবলই পরনিন্দা করে, লোকের ছী-ছি কেলেঙ্কারির তিলকে

---

* রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটো ছেলে অনেকদিন আগে বলেছিলে

বোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা —
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে।

অর্থাৎ তাক লাগিয়ে দেযা ছাড়াও, অসম্ভবগুলো যদি সম্ভব হ'য়ে ওঠে, তবে তা আমাদের নিয়ে যেতে পারে, জীবনসংসাব থেকে, শিল্পের জগতে — গল্পেব স্পেসে বা অবকাশে।

ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে তাল ক'রে তোলে। ভাঁড়কে স'রে দাঁড়াতেই হবে একপাশে, বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখতে হবে তথাকথিত সুষ্ঠু সমাজকে, যাতে সে সমস্ত সাক্ষী সাবুদ অপ্রমাণ করতে পারে, যাতে খুলে দেখাতে পারে যে যাবতীয় চরম বিধান আসলে না-বিধান। সেই সঙ্গে তাকে কিন্তু এই সুঠাম সমাজেই ঘোরাঘুরি করতে হবে, না-হ'লে সে এর ধর্মের ষাঁড় বা স্বর্গীয় ধেনুগুলোকে জানবে কী ক'রে কী ক'রেই বা সুযোগ পেলে অম্লবিষম টিটকিরির গিটকিরি ছোটাবে ?... ভাঁড়েদের দর্শনই হ'লো যাকে সমাজ অকাট্য বা সুনিশ্চিত বিধান ব'লে মেনে নিয়েছে, তার সম্বন্ধে সন্দেহ খুঁচিয়ে তোলা; চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় যাকে প্রমাণিত করা হয়েছে ব'লে প্রতীয়মান হয়, তার ভেতরকার লুকোনো অসংগতিগুলোকেই সে খুলে দেখায়; যাকে আপাত চোখে মনে হয় কাণ্ডজ্ঞান তাকে উপহাসে-উপহাসে জর্জরিত করাই তার উদ্দেশ্য আর এভাবেই উদ্ভটের মধ্যে সে আবিষ্কার ক'রে বসে সত্যকে।

পরিবেশ বা পরিস্থিতি যখন উদ্ভট, কিম্ভূতকিমাকার, অসংগতির ভাঁড়ার, তখন এর মধ্যে একটা খটকা, একটা থাপ্পড়, একটা মোক্ষম ঘায়েল-করা ধাক্কা দিতে পারে শুধু তেমন লোক, যার উভয়বলিতা সহজে চট্ ক'রে আমাদের বুঝতে দেয় না মানবকটি সত্যি-সত্যি কে, কিংবা তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিলো। ভাঁড় বা সং নিজে হাবা সেজে থাকে ব'লেই তার এই আশ্চর্য উভয়বলিতা। ঠিক তাদের উলটো মেরুতে অবস্থান পুরুতের, তার মধ্যে কোনো দ্বিতীয় তল বা অর্থ নেই — সে নিয়মকানুন মানে, সম্ভবের আতিশয্যেই; শুধু নিছক নিরীহ বা নির্বিরোধী নয়, সে গম্ভীর। সে পক্ষপাতীও — সে বজায় রাখতে চায় যা আছে তাই, সে সাফাই গায় স্ট্যাটাস কুয়োর। কিন্তু পরিবেশ যখন সহ্যাতীত, তখন একসময় সেও চ'টে উঠে হ'য়ে ওঠে বিদূষক বাচস্পতি, তৈরি হ'য়ে যায় তার উভয়বলিতা।

পরিবেশ স্বভাবতই দাবি করে দাশু, অথবা ভবদুলালের উপস্থিতি — এমনকী এদের লালনও করে কখনও-কখনও। কে এরা — এই প্রশ্ন বারে-বারে আমাদের নাজেহাল করে পাগল, না সেয়ানা, না মিচকে শয়তান ? বেকুবের বেহদ্দ, না চালাকিতে চিকচাকন চৌকশ ? এদের সম্বন্ধে সব খুঁটিনাটি জেনে নেবার পরও সন্দেহ কাটে না, হেঁয়ালি বরং আরো ঘোরালো হ'য়ে ওঠে, স্পষ্ট ক'রে চেনা যায় না — আব তার কারণই এদের এই রহস্যময় উভয়বলিতা — ছদ্মবেশের আড়ালে এদের সং বা ভাঁড়ের রূপ এমনই চাপা প'ড়ে গিয়েছে যে গোয়েন্দা লাগিয়েও এদের ধরপাকড় করা মুশকিল। তবু, শেষ অব্দি, তাদের কোনোকিছুই কিন্তু সম্পূর্ণ অবোধ্য নয়। যদি একেবারেই অবোধ্য হ'তো তবে তাদের কাজ কিছুতেই হাঁসিল হ'তো না। অন্তত খেই ধরিয়ে দেবার একটা চেষ্টা থাকে, একটা কোনো সূত্র বা চাবি কাজ ক'রে যায় সব রেড হেরিঙের মধ্যে — যার মারফৎ আমরা বুঝতে পারি সব পাঁচমিশেলি গোলেমালে তাদের তীরন্দাজির আসল চাঁদমারি কে, বা কী, বা কেন।

৩

যেন বাঘের পিছে ফেউ, এমনি হ'লো সং,
তার কাজই হ'লো হুঁশিয়ারি, কিন্তু রং-বেরঙ,
হাটের মধ্যে ভাঙছে হাঁড়ি, পুরোহিতের ঢং,
দেখাচ্ছে সে কোন্ সমস্ত নেহাৎ শুধু ভড়ং।

এটা হয়তো তেমন আশ্চর্যও নয় যে এই সং বা ক্লাউনের আবির্ভাব হয় সমাজ বা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে — যখন পুরোনো মূল্যবোধগুলো ধ্ব'সে যাচ্ছে অথচ নতুন কোনো মূল্যবোধ কিছুতেই

শূন্যস্থান দখল ক'রে নিতে পারছে না। বীরবল, গোপাল ভাঁড়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন — প্রত্যেকেরই আবির্ভাবের সময় খেয়াল ক'রে দেখবার মতো। এরা যদি ঐতিহাসিক চরিত্র নাও হয়, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের টানাপোড়েন থেকেই এরা কল্পনার মশনদে এসে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে পড়ে — এদের নিয়ে তৈরি হয় কিংবদন্তি, লম্বাইচওড়াই গল্প, চিমটি ও টিপ্পনী, হো-হো আখ্যান — এবং ক্রমাগত তৈরি হ'তেই থাকে। যে-গল্পের শেষ নেই, এরা সেইসব গল্পের নায়ক। কেননা পরেও তাদের নিয়ে তৈরি হ'য়ে চলতে থাকে এমন-সব রগরগে গল্প, যার মধ্যে নিত্য নতুন জব্দ করবার ফন্দি, নাকাল করার ফিকির রূপ পেতে থাকে — অন্ধকারে গায়ে প'ড়ে ধাক্কা দিয়ে পরিচয় জানবার সুযোগ খুঁজতে থাকে এরা অনবরত। যে-পদ্ধতি একদিন জার্মানিতে আবিষ্কার করেছিলো টিল অয়লেনস্পিগেল (ইংরেজ সাহেবরা তার কাণ্ডকীর্তি দেখে মোহিত হ'য়ে তাকে আপন ক'রে নিয়ে বলে টিল আউলগ্লাস — পেচকশমা)। এই ছোকরাকে নিয়ে সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কত-যে গল্প-কাহিনী-ছড়া-গাথা-পাঁচালি রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাকে নিয়েই রিখার্ড স্ট্রাউস তাঁর সিম্ফনিক কাব্য 'টিল অয়লেনস্পিগেলের হৈ-হুল্লোড়' রচনা করেছেন, এমিল নিকোলাউস ফন রেজনিচেক রচনা করেছেন তার অপেরা, এরিখ কাস্টনার লিখেছেন ছোটোদের জন্য তাঁর উপন্যাস। কে এই টিল ? সে ক্লাউন, সং, ভাঁড়, বিদূষক, বেজায় আপদ — সারাক্ষণ নিয়মকানুন ভেঙে লোককে নাস্তানাবুদ ক'রে বেড়াচ্ছে, মহাজ্ঞানী মহাজনদের জব্দ ক'রে ফ্যাসাদে ফেলছে; আস্ত জার্মান সাম্রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সে তোলপাড় ক'রে তুলেছিলো, হুলুস্থুলু ফেলে দিয়েছিলো, সে জানতো কেমন ক'রে কেউ হাঁটতে পারে টান-টান সরু দড়ির ওপর, সে জানতো কেমন করে কানমলা দিয়ে ভড়কি দিয়ে সব ভণ্ডামি, ধাপ্পা, খোশামোদ ও স্বার্থপরতার চিচিংফাঁক ক'রে দিতে হয়। রুটিওলা, মুচি, জ্যোতিষী, দর্জি, ডাক্তার, রসুইকর, পুরুৎ, ছুতোর, কশাই, কয়লাওলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক — এমন-কোনো কাজ বা পেশা নেই যাতে এই বহুরূপী ছোকরা হাত দেয়নি, এমন-কোনো বৃত্তি বা পেশার লোক নেই যাকে সে ফ্যাসাদে ফ্যালেনি, যার ধাপ্পা সে ফাঁস ক'রে দেয়নি। প্রায় চার্লি চ্যাপলিনের খুদে বাউন্ডুলেটির মতোই বিচিত্র তার কীর্তিকলাপ, আত্মরক্ষার অবিশ্রাম হাস্যকর চেষ্টা — শুধু তফাৎ এই যে চ্যাপলিনের সেন্টিমেন্টের মলম, মালিশ বা প্রলেপ তার মধ্যে ছিলো না। যদি একটা ছোট্ট ছড়া লিখে টিল অয়লেনস্পিগেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়, তবে সেটা হয়তো এইরকম কোনো রূপ নেবে :

টিল অয়লেনস্পিগেল ছিলো ফাজিল ছন্নছাড়া —
মাড়ায় বাউন্ডুলে পায়ে এ-পাড়া সেই পাড়া
পুরুৎ এবং কোতোয়ালে দোস্তি গলায়-গলায়,
পাঁচজনাকে রোজ জ্বালিয়ে সমাজ তারাই চালায় —
টিল অয়লেনস্পিগেল বাজায় তাদের নামে কাড়া —
হা-রে-রে-রে- ড়া-ড়া।

টিল অয়লেনস্পিগেল ছিলো তাক লাগানো সং,
এই এখানে ঐ ওখানে, কতই যে তার ঢং!

সাক্ষীসাবুদ সমেত যত পাড়ার মাতব্বর
টিলের কাছে নাস্তানাবুদ — এটাই জোর খবর।
টিল অয়লেনস্পিগেল তাদের ফাঁস ক'রে ভড়ং —
দেশবিদেশে ঘন্টা বাজে : ঢং ঢঙা ঢং ঢং।

এরই সঙ্গে তুলনা চলে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের, যার বিচরণভূমি ছিলো ইরান-তুরান থেকে শুরু ক'রে রুশদেশ অব্দি বিস্তৃত। এরা ম'রেও মরে না, তাই যুগে-যুগে এদের নামে নিত্যনতুন গল্প চালু হয়, এরা হ'য়ে ওঠে কিংবদন্তির অমর নায়ক। বীরবল যদি-বা সত্যি-সত্যি থেকেও থাকেন কখনও, গোপাল ভাঁড় কোনোকালে কৃষ্ণনগরে ছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু পদ্ধতিটা সকলেরই চমকপ্রদ ভাবে একরকম — ধাক্কা, ল্যাং, চিৎপটাং, অথবা কানমলা, ঘাড়ধাক্কা, সজোর ঝাঁকুনি।

আর এই পদ্ধতিই সুকুমার রায় ব্যবহার করেছেন আখছার, হামেশা। রোগা এক ভিস্তিওলা, পাগলা দাশু, ভবদুলাল, বিশ্বম্ভর, রামকানাই, শুঁটকো সিড়িঙ্গে লোকটা যে দ্রিঘাংচুর রহস্য ফাঁস ক'রে বরং আরো জমিয়ে দিয়েছিলো... এমনি পর-পর সব চরিত্র তৈরি করেছেন সুকুমার রায়, যাদের ছাঁচটা এই ভাঁড়ের জীবিকাধারীদেরই ছাঁচ। কিন্তু যেমন বলতে চেয়েছি, পরিবেশ, পরিস্থিতি সমাজের অসংগতিগুলোই এদের সৃষ্টি ক'রে দেয় — ভাঁড়ের জীবিকা বিশ্বজনীন, সন্ধিক্ষণকালীন — অথচ ভাঁড়েরা সব বিশেষ সময় বা দেশের তৈরি, তার সঙ্গে জড়ানো। বাংলা সংসার থেকেই সুকুমার রায়ের সব উদ্ভট চরিত্ররা গজিয়েছে — একটা বিশেষ সময়ের বাঙালি সংসার থেকে; কিন্তু পদ্ধতিটা এতই রপ্ত ছিলো সুকুমার রায়ের যে তাঁর বিচিত্র চরিত্রবা এখনও টাটকা, এখনও সজীব — আর পদ্ধতির জন্যেই ইতিহাসের সত্যিকার ভাঁড় বা কল্পনার যাবতীয় সঙের সঙ্গে তাদের এত মিল। অর্থাৎ এই দিশি-বিলিতি ছাঁচটা একক কারু প্রভাব নয়, পদ্ধতিরই অবদান।



কৈশোরকের কলস্বাস : গল্পকার সুকুমার রায়

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার রায়ের প্রথম গল্পের বই পাগ্‌লা দাশু (১৯৪০) যখন মুদ্রিত হল, রবীন্দ্রনাথ তার ছোট একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ছ'বছর পরে, ১৯৪৬ সালে, বইটির নতুন সংস্করণ ছাপলেন সিগনেট প্রেস, তাতে তিনটি গল্প এবং ভূমিকা বাদ দেওয়া হল। এই বর্জনের নানান কারণ থাকতে পারে, কিন্তু একটা কারণ খুবই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছিলেন: "তাঁর (সুকুমারের) ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্য তিনি তাব বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।"

পাগ্‌লা দাশু-র অধিকাংশ রচনা সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য আদৌ প্রাসঙ্গিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বর্জিত তিনটি গল্পের মাত্র একটি — "হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী" কবিকথিত উলট বিজ্ঞানেব উদাহরণ বলা চলে। অবশিষ্ট বাইশটি গল্পের উনিশটিরই কেন্দ্রীয় চরিত্র এক বা একাধিক কিশোর, আর বিষয় তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিশেষত স্কুলজীবনের টুকরো টুকরো ছবি। একটি গল্পে মন্দভাগ্য নন্দলাল সংস্কৃতে মেডেল পাবাব জন্য প্রাণপণে পড়াশোনা করেও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী খুদিরামের কাছে হেরে যায়, নম্বর কম পেয়ে নয় সংস্কৃতে সেবছর কোনো মেডেল নেই বলে। অন্য একটি গল্পে ক্লাসের চালিয়াৎ ছেলে শ্যামচাঁদ ফাউন্টেন পেন আর হাতঘড়ি দেখিয়ে মাস্টার ছাত্র সকলকে তাক লাগিয়ে দেয। তারপর ম্যাজিক শো-য়ে নিজেই যাদুকরের কাছে জব্দ, অপদস্থ হয়। কখনো কবিযশপ্রার্থী শ্যামলালের অনুপ্রেরণায় স্কুলশুদ্ধ ছেলের 'কবিতা রোগ' হয। তার জন্য 'কবিতার টিকা' বার করেন পন্ডিত মশাই। আবার কোথাও গোপালের ছোট ভাই দাদার মত পড়াশোনা করতে চায়, যেরকম পড়াশোনায় খাতা পেন্‌সিল বই কিছুরই দরকার নেই। যাতে কেবল "পাতলা পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়" এইরকম পড়াশোনা। এইসব কাহিনীতে বি'পরীত ভাবের সহাবস্থান বা বিজ্ঞানের বিপর্যয় কোথায় ?

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথেব ভূমিকাটি পড়লে মনে হয়, এটা লেখার সময় কবি 'পাগ্‌লা দাশু' নয়, সুকুমারেরই অন্য বই 'আবোল তাবোল' (১৯২৩)-এর কথা ভাবছেন। কারণ, বিজ্ঞানের নিয়মকে অস্বীকাব আর যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনার বিপর্যয় সৃষ্টি করেই গড়ে উঠেছিল 'আবোল তাবোল'-এর কবিতাগুলির জগৎ। এ বইয়ের প্রথম কবিতাতেই অসম্ভবের ছন্দে পূর্ণ ভুলের পৃথিবীর প্রসঙ্গ ছিল। তারপর কুমড়োপটাশ, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড় প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জান্তব জগাখিচুড়ি প্রাণী আর কাঠখেকো, ছায়াব্যবসায়ীর মত অসম্ভব বাতিকগ্রস্ত কয়েকটি বুড়োর কল্পনায়, রাজারানীর নেহাৎ উদ্ভট আবরণের বর্ণনায় প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রত্যাশিত নিয়মের ছক কে ভেঙ্গে ফেলবার নানা প্রয়াস। 'আবোল তাবোল'-এর সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, তাই হয়ত

তাকে 'পাগ্‌লা দাশু'-র মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করতে চাননি সিগনেট প্রেস। সেই সঙ্গে বিষম ভাবের গল্পগুলি বাদ দেবার ফলে বিশিষ্ট চেহারা পেয়েছিল নতুন সংস্করণের পাগ্‌লা দাশু। যে জগৎ এ গল্পগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা কিশোরের ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক অশ্রু দিয়ে গড়া। 'আবোল তাবোল'এর মত তার আকাশ উদ্ভটের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নয়। তা বাংলাদেশের শরৎকালের আকাশের মত উজ্জ্বল আর প্রসন্ন।

২

সুকুমারের অধিকাংশ রচনার মত পাগলা দাশু-র গল্পগুলিও 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, ১৩২৩ থেকে ১৩৩০ সালের মধ্যে। বাঙালি পাঠকের কাছে অভিনব ছিল এদের আস্বাদ। যদিও স্কুলের ছেলেদের নিয়ে বাংলায় তার আগেও গল্প লেখা হয়েছিল। বাঙালির ছেলে অক্ষর চিনতে শিখেই বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের গোপাল আর রাখালের গল্প পড়ত। আর পাঠ্যপুস্তকের বাইরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার স্কুল-পড়ুয়াদের নিয়ে দু খন্ডের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস চারু ও হারু (১৯১২) লিখেছিলেন সুকুমারের গল্পগুলি প্রকাশের অল্প কিছুদিন আগে। তবুও পাগলা দাশু-র মত গল্প যে বাঙালি পাঠক আগে কখনো পড়েননি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিশোরদের জন্য লেখা গল্পে সুশিক্ষা বা নৈতিক উপদেশ মুখ্য হবে না একথা সেদিন বাঙালি লেখক এবং পাঠক দুয়ের কাছেই অচিন্তনীয় ছিল। সুকুমার কিন্তু সম্পূর্ণ অ-ভাবিত পথেই পা বাড়িয়েছিলেন। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে তাঁর গল্পে কোনোই নীতি নেই অথবা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সংসারের কোনো কঠিন দায় এখনো জানে না যারা, তাঁদের কথা তাদেরই মত করে বলতে চেয়েছেন সুকুমার, তাদেরই একজন হয়ে। গুরুমশাই বা নীতিশিক্ষকের উচ্চ আসন থেকে নয়। তাঁর গল্পে যদি কোনো নীতি থাকে তা জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম বা নীতি।

পাগলা দাশু-র গল্পগুলি যেন ক্ষুদ্রাকার একটি চিত্রশালা। আর কিশোর নায়কেরা যেন এক একটি character portrait। চরিত্রসৃষ্টিতেই নিবদ্ধ রয়েছে সুকুমারের মনোযোগ; যদিও তাঁর সৃষ্ট চরিত্র — অন্তত প্রধান চরিত্রদের একজনও তথাকথিত সর্বগুণসম্পন্ন ভালো ছেলে নয়। বরং বলা যায়, তারা প্রত্যেকেই এক একটি অবগুণের অধিকারী। যেমন দুলিরাম সবজান্তা, শ্যামচাঁদ চালিয়াৎ, যজ্ঞিদাস মিথ্যাবাদী আর সব বিষয়ে সর্দারি করা ভোলানাথের বিশ্রী অভ্যাস। গল্পের পরিণতিতে কোনো না কোনো ভাবে শাস্তি পেয়েছে এরা সবাই। কিন্তু সুকুমার তাদের দোষ বা তজ্জনিত শাস্তি দুটির কোনোটিকেই বড় করে দেখাননি। দোষীকে যেমন কেবল কৃষ্ণবর্ণে লিপ্ত করেননি, যেমনি গল্পের শেষে জব্দ হয়ে তার যে পরিবর্তন তা নেহাৎই সাময়িক এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন। আর কিশোর পাত্রগুলির মধ্যে যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার সম্বন্ধে এ নিয়মও মানেননি।

এ বইয়ের চারটি গল্পের নায়ক হল দাশরথী রায় ওরফে পাগলা দাশু। সে এক অসাধারণ চরিত্র। সর্বদাই সে নূতন নূতন দুষ্টুমি আর খ্যাপামি করে বেড়াচ্ছে। কখনো সহপাঠীদের নিছক জব্দ করার জন্য বয়ে বেড়াচ্ছে একটা ভারী বাক্স, যে বাক্সে অনেক বাঁধাছাঁদা করে রাখা আছে মাত্র এক টুকরো কাগজ; তার একপিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর অপরপিঠে 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়'। ক্লাসের ভালো ছেলে জগবন্ধু একবার দাশুকে পড়া বলে দেয়নি। তাই তার ব্যাকরণের বইটি বদলে গেছে লোমহর্ষক ডিটেকটিভ উপন্যাসে। বলাই বাহুল্য দাশুই তার জন্য

দায়ী। মাস্টারমশাইকে না জেনে এই বই দিয়ে বকুনি খেয়েছে জগবন্ধু। আর দেমাকী নবীনচাঁদের লাঞ্ছনার ত কথাই নেই। দাশুর পরামর্শেই কেষ্টা আর জগাই নবীনের মাথায় ধুনুচি চাপিয়ে তার নতুন কেনা শখের পিরাণে কাদাজলের ছিটে দিয়ে পালিয়েছে। তাতেই শেষ নয়। বেচারী নবীন যখন বস্তা মাথায় কাদামাখা জামা গায়ে, কাঠ হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দাশু ডেকে এনেছে নবীনের বড়মামাকে তার দুর্গতি আরো বাড়ানোর জন্য। সবচেয়ে মজার কথা, কেষ্টা জগাই এ কাজের জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত জিলিপি চাইতে এলে দাশু সাফ জবাব দিয়েছে "আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।" এইরকম অদ্ভুত আচার আচরণের জন্য দাশুকে সবাই পাগলা বলে ডাকে। যদিও তার কীর্তিকাহিনীর বিবরণ পড়ে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও মনে হয়, দাশুর কি সবটাই পাগলামি? বাস্তবক্ষেত্রে, এরকম চরিত্রকে ভালো, তার স্বভাব অনুসরণযোগ্য একথা কেউই বলবেন না। কিন্তু মজার কথা হল, গল্পগুলো পড়ার পর যে চরিত্রটি আমাদের মনের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে সে হল ঐ গোল গোল চোখ, অনাবশ্যক রকমের বড় কান, মাথায় বস্তার মত চুলওয়ালা, যশোরের কই মাছ সদৃশ দাশু। অথচ, ভোলানাথ, নবীন বা শ্যামচাঁদের মত নিজের কৃতকর্মের জন্য দাশু কোনো ভাবে জব্দ হয়নি বা শাস্তি পায়নি। উল্টো পক্ষে, ক্লাসে চীনে পটকা ফাটিয়ে বা ছেলেদের নাটক ভন্ডুল করে, নবীনকে অকারণে জব্দ করেও তার কোনো দুঃখ বা অনুশোচনা হতে দেখি না। তাহলে, কোন গুণে দাশু প্রিয় হয় কিশোর পাঠকদের? আসলে, কিশোব মনের রহস্য ভালই বুঝেছিলেন সুকুমার। তিনি জানেন যে সাংসারিক অর্থে যে আদর্শবান এমন চরিত্র যার দিকে গুরুজনেরা সর্বদাই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, অনুসরণ করতে বলেন যার আচার আচরণ, সে ছেলে কখনোই সাধারণের — সাধারণ ভাবে ঐ বয়সের অন্যান্য ছেলেদের প্রিয় হয় না। তাই সেরকম চরিত্র অঙ্কনে প্রবণতা দেখাননি তিনি। অল্পবয়সী ছেলেরা সত্যকার অন্তরঙ্গতা অনুভব করবে যার সঙ্গে — তেমনিই নিত্য নতুন দুষ্টুমির ফন্দী আবিষ্কর্তা একটি চরিত্র এঁকেছেন তিনি সব রং উজাড় করে। তাই এই গল্পগুলি হয়ে উঠেছে কিশোরদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

আরো একটি কারণে এদের সঙ্গে তরুণ পাঠকদের নৈকট্যবোধ বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ গল্পের অন্তরালে যেন কিশোর একটি কথককে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পগুলো বলছে যেন, দাশু কালাচাঁদ, নবীনেরই এক সহপাঠী। সে অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে পাগলা দাশুর রহস্যময় বাক্স খুলে দেখছে, অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছে, ক্লাসে শব্দরূপ মুখস্থ না করে কাটাকুটি খেলছে বা রামপদর জন্মদিনে মিহিদানা খাচ্ছে — এককথায় প্রায় সব ঘটনার সঙ্গেই প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে তার। আবার কখনো তার ভূমিকা বদলে যাচ্ছে। সে ঐ গল্পের পৃথিবী থেকে উঠে আসছে পাঠকের জগতে — আমাদের মধ্যে। আমাদের অভিজ্ঞতার, ঐ গল্পগুলি পড়ার আমাদের যে অভিজ্ঞতা তার অংশীদার হচ্ছে। যেমন, দাশুর নবীনকে জব্দ করার ঘটনার সঙ্গে আদ্যোপান্ত যুক্ত রয়েছে সে। নবীনের আখ্যান শুনছে — দাশুর খ্যাপামি দেখছে — কেষ্টা জগাইয়ের কাছে জিলিপির ভাগ চাইছে। আবার আমাদের পাশে এসে যেন বলছে "আচ্ছা। দাশু কি সত্যি সত্যি পাগলা, না কেবল মিচকেমি করে?" এইভাবে, কিশোর কথকটি যেন অনায়াসে আনাগোনা করে দুই জগতে গল্পের জগৎ থেকে পাঠকের জগতে; যেন দুই তলের মধ্যে তৈরি করে এক সেতু। আর তার এই অন্তরঙ্গ আখ্যানভঙ্গিতে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় কাহিনীর আকর্ষণ।

বাংলা কিশোরসাহিত্যে স্কুল-পড়ুয়া ছেলেদের নিয়ে কাহিনীর এই অভিনব ধারাটি সংযোজন করলেন যখন সুকুমার, তার অন্তত অর্ধশতাব্দী আগে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গল্প লেখার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ লিখেছিলেন টমাস হিউস। তারপর থেকেই ইংরাজীতে 'স্কুল স্টোরি'-র একটি ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল। সুকুমার যে সে ধারার সঙ্গে, অন্তত কিছু কিছু গল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। লীলা মজুমদার জানিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে নানাধরণের বিলিতি কাগজের সঙ্গে আসত "বয়েজ ওন পেপার"। আমাদের মনে পড়ে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন ট্যালবট্ বেনস্ রীড। যাঁর ফিফথ ফর্ম এ্যাট ডোমিনিক ইংরাজ কিশোরদের মনোহরণ করেছিল প্রায় একশ বছর ধরে। সুকুমার এখান থেকে কোনো প্রেরণা পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সে প্রেরণা যে সম্পূর্ণ স্বীকরণ করতে পেরেছিলেন তিনি এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর "হাঁসজারু" এবং "বকচ্ছপ" শব্দে লুইস ক্যারলের স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পেয়েছেন কোনো কোনো সমালোচক; কিন্তু একথা সকলেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে পাগলা দাশু-র কোনো চরিত্রে বা ঘটনায় বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায় না। "স্কুলস্টোরি"-র জগৎ স্বভাবতই সংকীর্ণ হয়, খেলাধূলা, পরীক্ষা বা অন্যান্য প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমিত থাকে, সুকুমার যেন তাকে আরো গুটিয়ে এনেছেন। ইংরাজী "স্কুলস্টোরি"-তে ঘটনার যে জটিলতা এবং বৈচিত্র্য তা পাগলা দাশু-তে নেই, থাকা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যেও এ ব্যাপারে সুকুমার রায় অনন্য। তাঁর উত্তরসূরী যেসব লেখক স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, তাঁদের রচনায় অনেক সময়েই ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্র কড়া রঙে আঁকা। সেখানে আজগবী আর বাস্তব আলোছায়ার মত মিলে মিশে থাকে। কোনো গল্পে মানুষকে বাঁদর বানাবার বড়ি সংগ্রহ করে ছাত্র, মাস্টারমশাইকে পানের সঙ্গে খাওয়াবে বলে। কেউ বা ভূতের সাহায্যে লেখাপড়া আর খেলাধূলা দুটোতেই সবসেরা হয়ে ওঠে। কখনো বা অঙ্কের মাস্টাব যে আসলে একজন রাক্ষস তার স্পষ্ট প্রমাণ পায় একটি ছাত্র। কাউকে স্কুল থেকে টাকার লোভে চুরি করে নিয়ে যায় দুবৃত্তেরা। বলাই বাহুল্য এসব গল্পের স্বাদ আলাদা।

এদেব তুলনায় কত সরল মনে হয় সুকুমার রায়ের গল্পের প্লট, কত স্বল্প উপকরণে কাহিনী গড়ে তোলেন তিনি। যেমন "কালাচাঁদের ছবি" গল্পটি। গল্পটির আখ্যাংশ নিম্নরূপ। কালাচাঁদ নিধিরামকে মেরেছে। তার কারণ কালাচাঁদ একটি ছবি এঁকেছে, সেটা কেমন হয়েছে নিধিরামকে জিজ্ঞাসা করায় নিধিরাম বন্ধুভাবে ছবিতে দুএকটি পরিবর্তনের কথা বলেছিল। তাতেই কালাচাঁদের এই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু "কালাচাঁদেব ছবি" গল্পটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন ব্যাপারটি মোটেই এত নিরীহ নয়-জানেন কত মর্মান্তিক নিধিরামের মন্তব্যগুলি। তার এক একটি বাক্যে ছবিটি খান্ডবদাহন থেকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শিশুপালবধ এবং জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। অর্জুনের পতাকাকে সে কখনো বলেছে তালগাছ, কখনো সীতা কখনো বিভীষণ। ফলে, গল্পের শেষে প্রহৃত নিধিরাম অপেক্ষা প্রহারকর্তা কালাচাঁদের প্রতিই সমবেদনা অনুভব করি আমরা। এমনিভাবে, আপাতদৃষ্টিতে কোনো ঘটনা না ঘটলেও কাহিনীর মধ্যে থাকে একটি গতি, আর বিকশিত হয়ে উঠেছে নিধিরাম আর কালাচাঁদ — এই দুটি চরিত্র।

বস্তুত, প্লটে জটিলতা, কাহিনীতে পরিপাট্যের অভাব পাগলা দাশু-র রচনাগুলির আকর্ষনীশক্তি একটুও কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। অর্ধশতাব্দীরও আগে এই গল্পগুলি লিখেছিলেন সুকুমার। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রায় কত পরিবর্তন এসেছে তারপরে। আজকের শহরে কিশোর আর ধুতি পিরাণ পরে না। ফাউন্টেন পেন আর রিস্টওয়াচ যে কারো বিস্ময় জাগাতে পারে এই ভাবনাটাই এখন হাস্যকর। কিন্তু তাও পুরনা হয় না গল্পগুলো, তাও আমরা 'গল্পগুলো যেন কালপ্রভাবে ঈষৎ মলিন, যেন সাল তারিখ পেরিয়ে আসা' বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তি মানতে পারি না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কিশোর বয়সে পাগলা দাশু পড়ার সময় প্রাণের অব্যক্ত ইচ্ছা মূর্ত হবার অনুভূতি হয়েছিল আমাদের, যেমন হযেছিল কিশোর বুদ্ধদেবের নিজের 'সন্দেশ' পত্রিকায় গল্পগুলি প্রথম পড়ার সময়। তার কারণ সমসময়ের সামাজিক রীতিনীতির যে বর্ণনাবাহুল্য কাহিনীগুলি তাদের অন্তর্গত চরিত্রদের বিশেষ কালে আবদ্ধ রাখতে পারত সেসব বর্ণনা যথেষ্ট কম করেছেন সুকুমার। তাব ফলে কাহিনীর স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে, ধুতি পিরাণের আড়ালে শ্যামচাঁদ, নন্দলাল, সর্বোপরি পাগলা দাশুকে সহজেই চিনতে পারে আজকের পাঠক। তাদের দেখতে পায় ভিন্ন নামে, ভিন্ন পোষাকে নিজেদের সহপাঠীদের মধ্যে। এই ভাবে অব্যবহিত পরিবেশ অতিক্রম করে, দাশু আর তার সঙ্গীসাথী হয়ে ওঠে দেশকালাতীত এক ভাবজগতের অধিবাসী; চিরকালীন কিশোরের প্রতিমূর্তি।

৩

কিন্তু স্কুলজীবনের এইসব কাহিনী কিশোর পাঠকদের যতই উপভোগ্য হোক, এতে তাদের ক্রমবিকাশশীল মনের সব চাহিদা পূর্ণ হয় না। তারা চায় নূতন নূতন বিষয়। 'স্কুল স্টোরি'র একবার তীব্র নিন্দা করেছিলেন অরওয়েল, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এর মধ্যে জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ তুলে ধরা হয়। সৃষ্টিশীল কোনো লেখকই, অনুমান করা অসংগত হবে না, এই সংকীর্ণ বিষয়ের গন্ডীর মধ্যে সীমিত থাকতে চান না। অন্তত, সুকুমাব রায় থাকেননি। দাশু সিরিজের গল্পগুলির সমান্তরালেই 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তাঁর অন্যান্য গল্প, কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যিক রচনা। কারণ পত্রিকাটির আবির্ভাব কাল থেকেই তার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকলেও এই সময়ে উপেন্দ্রকিশোবের মৃত্যুর ফলে এব সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব এসে পড়েছিল সুকুমারের ওপর। ১৩২৩ থেকে ১৩৩০ পর্যন্ত "সন্দেশ"-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই আ'ট বছর — তাঁর জীবনের শেষ আট বছর সুকুমারের সাহিত্যজীবনের সবচেয়ে ফলবান খন্ড। শুধু যদি গল্পের কথাই ধরি, এসময়ে লেখা হয়েছে পঞ্চাশেরও বেশি গল্প। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের ভালো করে পরিচয় হয়নি। লেখকের অকালমৃত্যুর পর তাঁর অধিকাংশ লেখার মত এরাও আবদ্ধ হয়ে থেকেছে 'সন্দেশ'-এর দুই মলাটের মধ্যে। পত্রিকার তৎকালীন রীতি মতো অস্বাক্ষরিত অবস্থায়। পাগলা দাশু-র চার বছর পরে, আরো কয়েকটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বহুরূপী (১৯৪৪)। কিন্তু গল্পকার সুকুমার রায়কে সম্পূর্ণ জানবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল আরো অনেকদিন — তাঁর মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। আমরা যারা সেকালের 'সন্দেশ' পড়ার সুযোগ পাইনি, যারা তাঁর পূর্বোক্ত গল্পের বই দুটির সঙ্গে পরিচিত

ছিলাম, সমস্ত গল্প চিহ্নিত হবার পর সবিস্ময়ে দেখলাম সুকুমারের গল্পের জগৎ কত বিস্তৃত আরো বিচিত্র। এখানে রয়েছে মৌলিক আর অনুবাদ কাহিনী; আছে পুরাণ আর ইতিহাসের গল্প, লোককথার নবীকরণ, হাসির চুটকী, আবার নক্সা জাতীয় রচনা। কখনো তিনি গল্পের সন্ধানে চলে গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সাহিত্যে, কিম্বদন্তীতে। নরওয়ে থেকে আরবে, আবার সেখান থেকে চীনদেশে। কখনো ফিরে এসেছেন একেবারে ঘরের কোণে ছোট্ট মেয়ের পুতুল খেলার মাঝখানে।

বর্ণাঢ্য এই জগতের যে বিশেষত্ব সব আগে চোখে পড়ে তা হল এখানে প্রতিফলিত হয়েছে চেনা পৃথিবীর-চিরকালীন পৃথিবীর এক সহজ রূপ। বাংলাসাহিত্যে ননসেন্স রসের সাহিত্যিক বলেই সুকুমারের সমধিক খ্যাতি এবং প্রসিদ্ধি, আবোল তাবোল এবং হযবরল (১৯২৪)-র মত গ্রন্থের স্রষ্টাও তিনি। কিন্তু 'দ্রিঘাংচু'-র মত দু-একটি গল্প বাদ দিলে তাঁর ছোটগল্প উদ্ভটরস বর্জিত। তাঁর গল্পে ঘটনা বা চরিত্র অবশ্য বাস্তবজীবনের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সেখানেও আছে দেড় বিঘৎ মানুষ, বাংছাতা নিতে আসা বহুরূপী, প্রেতগন্ধর্ব অর্ধেক ঘোড়া অর্ধেক মানুয সেন্টর। কিন্তু থাকলেও বিচিত্র মানুষ আর মনুষ্যেতর জীবদের উপস্থাপিত করা হয়েছে পুরাণ বা রূপকথার পরিবেশে — বর্তমান থেকে অনেক দূরে। যে জগতে স্থানকালের চিহ্ন হয় অস্পষ্ট নয় অদৃশ্য সম্ভব অসম্ভবের ভেদ রেখাও সেখানে স্থান থাকে না। "ছাতার মালিক" গল্পের প্রথমেই যখন পড়ি :

> "তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।
> তাদের আড্ডা ছিল গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে বনের ধারে ব্যাং ছাতার তলায়।"

তখন আমাদের মনও সম্ভাব্য জগতের সীমা পেরিয়ে দেড় বিঘতীদের দেশে চলে যায়। বাস্তবজীবনের নিয়ম এখানে খাটবে না এই ধারণা নিয়েই গল্প পাঠে অগ্রসর হয় আমাদের চেতন না হোক অচেতন মন। তাই বহুরূপীকে কথা বলতে দেখে আমাদের বিস্ময় বোধ হয় না এবং গল্পের শেষে তাকে যখন ব্যাং ছাতাটি বগলদাবা করে স্বস্থানে প্রস্থান করতে দেখি তখনো আমরা সে ঘটনা ঐ বিশেষ জগতের পক্ষে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। আসলে, কেবল অসম্ভব আর অবাস্তব ঘটনা থাকলেই উদ্ভট রস সৃষ্টি হয় না; তার জন্য চাই সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে একটা আততি। যেমন, ধরা যাক, সুকুমারের "ট্যাঁশগরু" কবিতাটি। কবিতার আরম্ভেই পড়ি

> "ট্যাঁশগরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে
> যার খুশি দেখে এস হারুদের অফিসে
> চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু মুখখানা মস্ত
> ফিটফাট কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত"

এই বর্ণনা এবং সঙ্গের ছবিটি দেখলেই বোঝা যায়, এই বিশেষ জীবটি বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু এরই সঙ্গে কবি যখন এ তথ্যও পরিবেশন করেন যে এই সৃষ্টিছাড়া জন্তুটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব পরিবেশে হারুদের আপিসে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, এমনকি তাকে সংগ্রহ করাও নেহাৎ কঠিন নয় — তখনই দুই বিপরীত তথ্যের আততি সৃষ্টি করে উদ্ভট রসের। তুলনায় "হারকিউলিস" গল্পে, যে অর্ধেক ঘোড়া অর্ধেক মানুষ সেন্টর, আকাশকে মাথায় করে

দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট দৈত্য এটলাস অথবা সবুজ রঙের জটা, গায়ে মাছের মত আঁশ এবং হাঁসের মত চ্যাটাল হাত পা ওয়ালা সমুদ্রের বুড়োর প্রসঙ্গ আনেন সুকুমার, তারা সবাই কল্পলোকের জীব কিন্তু উদ্ভট নয়। কারণ তাদের কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবজগতের কোনো সম্বন্ধ নেই; সে কাহিনী কোন্ দূর এবং অস্পষ্ট অতীতের।

প্রকৃতপক্ষে বলা যায় কবি সুকুমার এবং গল্পকার সুকুমার দুই পৃথক জগতের বাসিন্দা। এবং একমাত্র "দ্রিঘাংচু"-তেই গল্পকার সুকুমার তাঁর অভ্যস্ত জগত থেকে বেরিয়ে আবোল তাবোল-এর জগতে অনুপ্রবেশ করেছেন। ঐ বইয়ের একটি কবিতার সঙ্গে গল্পটির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও অনুভব করা যায়। রূপকথার চিরাচরিত পদ্ধতিতে "এক ছিল রাজা" বাক্য দিয়ে "দ্রিঘাংচু"র আরম্ভ। যদিও গল্পের ওপরে চিত্রিত ছবিটি দেখে আমরা বুঝতে পারি, এ রাজা মোটেই রূপকথার রাজা নন। আবোল তাবোল-এর 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার?" কবিতায় যে রাজা নেড়ার বেলতালায় গমনাগমনের জটিল সমস্যা নিয়ে গলদঘর্ম হয়েছিলেন, তাঁরই সঙ্গে ববং এঁর মিল। চেককোট পাৎলুন পরা, শ্লেট এবং তলোয়ারের মতো প্রকান্ড পেন্সিল হাতে সেই বুড়ো রাজাকে অঙ্কে কাঁচা স্কুলের ছেলের মত দেখাচ্ছিল। এ রাজারও মাথায় মুকুট। কোমরে তলোয়ার পায়ে নাগরা, কিন্তু পরনে ধুতি পাঞ্জাবী এবং চেহারাটি নিতান্ত গোবেচারী বাঙালি ভদ্রলোকের মত। দুটি লেখায় আরো সাদৃশ্য আছে। কবিতার মত গল্পের রাজাও ভয়ানক চিন্তিত। একটা দাঁড় কাক কেন সিংহাসনের ডানদিকের উঁচু থামের ওপর বসে ঘাড় নিচু করে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় কঃ বলে সভায় প্রচন্ড গোল বাধিয়ে গেল — এই সমস্যায় রাজা ব্যতিব্যস্ত। পূর্বোক্ত কবিতায় যেমন সমস্যার সমাধান করতে এসেছিল একটি শীর্ণকায় ভিস্তিওযালা, এখানেও তেমনি দাঁড়কাকের রহস্য উন্মোচন করেছে রোগা সুঁটকোমত একজন লোক।

কিন্তু দুটি রচনার মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে যথেষ্ট। কবিতায় প্রত্যাশিত নিয়মের শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দেবার একটা সচেতন প্রয়াস ছিল সুকুমারের। রাজা তাঁর সভা ছেড়ে রৌদ্রতপ্ত ইষ্টকপুঞ্জের ওপর বসে ছিলেন, ভাজা বাদাম খেলেও তাদের গলাধঃকরণ করছিলেন না। কিন্তু গল্পে তেমন কিছু পাই না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন "ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা" তার কোনো চিহ্ন "দ্রিঘাংচু"-তে নেই। উপরন্ত আজগবী রচনার মধ্যে অনেক সময়ে যে গঠনগত একটা শিথিলতা থাকে, বাংলাসাহিত্যে যার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অবনীন্দ্রনাথের শেষবয়সের বহুরচনা, তারও কোন লক্ষণ এ গল্পে নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বাক্যকেও এখানে পুনরুক্তি বা বাড়তি বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু "দ্রিঘাংচু"-কে ননসেন্স সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত করব। তার কারণ সমস্ত গল্পটির মধ্যে যেটা প্রকট হয়ে ওঠে তা হল একটা বিশুদ্ধ অর্থহীনতা। আখ্যান এখানে এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে — জ্যামুক্ত তীরের মত, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নয়, লক্ষ্যহীনতা সৃষ্টির দিকে। গল্পে ব্যবহৃত চার লাইনের কবিতাটি সার্থক ননসেন্সের উদাহরণ, বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আমাদের ত মনে হয় সেকথা সমগ্র গল্পটি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। দ্রিঘাংচু রাজসভায় এলে কেনই বা তাকে দাঁড়কাকের মত দেখায়, তখন তাকে চার লাইনের উদ্ভট কবিতাটি না শোনালে কি বিপর্যয় হবে, সর্বোপরি এই দ্রিঘাংচুটি কে, এসবের কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি সুকুমার। অথচ কাহিনীর পারম্পর্য কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, বিষয়গত অর্থহীনতার সঙ্গে গঠনগত পিনদ্ধতার বিরল সমন্বয়েই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে "দ্রিঘাংচু"।

কিন্তু এর একটা বিপরীত দিকও আছে। আমরা সকলেই জানি, শিল্পে 'ননসেন্স' ব্যবহৃত হয় বিশেষ একটি কৌশল হিসেবে, জীবনকে দেখার এটা একটা বিশিষ্ট ধরন। এর মাধ্যমে শিল্পী সামাজিক অন্যায়, রাষ্ট্রের অনাচারের, বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কখনো বা এর সাহায্যে আমাদের গভীরতর কোনো জীবন সত্যে পৌঁছে দেন। য়ুরোপীয় যন্ত্রযুগ যখন সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে চাইছিল তখন এডওয়ার্ড লিয়র উদ্ভট কবিতার মধ্যে কতকগুলি অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুইফট্ গ্যালিভারের ভ্রমণের উদ্ভট কাহিনীগুলিতে প্রকৃতপক্ষে আক্রমণ করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের কদাচার আব ভন্ডামিকে। যুদ্ধের বীভৎসতা আর তান্ডব রূপ পেয়েছিল পিকাসোর বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভট ছবি গের্নিকা-তে। শিল্পোৎকর্ষে তুল্যমূল্য কিনা এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে ঐ একই মানসিকতা জন্ম দিয়েছিল আবোল তাবোল-এর অধিকাংশ কবিতার। "লড়াই ক্ষ্যাপা"-ব অনুপ্রেরণা যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, "একুশে আইন" বা "বাবুরাম সাপুড়ে"-র মধ্যে যে অন্তরীণ রয়েছে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি কবির ব্যঙ্গ তা বুঝতে অন্তত বয়স্ক পাঠকের খুব দেরি হয় না। আবোল তাবোল তখন আর কেবল বালক আর কিশোরদের মজার কবিতার বই থাকে না, বড়দের মনে আলোড়ন তোলার যোগ্য সাবালকত্ব অর্জন করে। এই রাজনৈতিক বা সমাজ সমালোচনামূলক অতিরিক্ত মাত্রাটি "দ্রিঘাংচু"-তে কোথাও সঞ্চারিত হয় না, সেকথা মানতেই হয় আমাদের। তার অর্থহীনতা যে আক্ষরিক অর্থে ননসেন্স তা বলছি না। কিন্তু গল্পটি শেষ পর্যন্ত ছোট পাঠকদেরই উপভোগ্য থেকে গেছে, বয়স্কদের জটিল অভিজ্ঞতার ভব তাতে নেই।

আগেই বলেছি, সুকুমার রায়ের গল্পের ধারায় "দ্রিঘাংচু" একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অন্যান্য গল্পে তিনি যেসব উপাদান ব্যবহার করেন সেগুলি বিশেষভাবেই কিশোরমনের উপযোগী — বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু বিষযগত বিভিন্নতায যতটা, শিল্পোৎকর্ষে এরা ততটা সমৃদ্ধ নয়। শুনেছি, সুকুমারের সমস্ত রচনা চিহ্নিত এবং শ্রেণীবদ্ধ কবা হয়েছে তাঁরই রেখে যাওয়া তালিকার সাহায্যে। তবু অনেকসময়েই সেসব লেখা গল্প বলে চিহ্নিত করেছেন প্রকাশকেরা, তাদেব ঐ শ্রেণীর রচনা বলতে দ্বিধা করবেন যে কোনো সাহিত্যপাঠক। যেমন, "ইতিহাসের ছয় বীর" যেন ইতিহাসের বইয়ের একটি অধ্যায়, "খুকির লড়াই দেখা" সংবাদপত্রের রিপোর্ট, "ডাকাত নাকি" বা "বাজে গল্প" নকসা বা গল্পের খসড়া, আবার "হারকিউলিস" যেন কাহিনী নয়, কাহিনীর সারাংশ মাত্র। সমস্ত লেখাটি এখানে থেকে গেছে একই সমতলে, চমকপ্রদ ঘটনাগুলিও নাটকীয় উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়নি। আসলে, সুকুমাব রায় 'সন্দেশ'-এর জন্যই তাঁর সমস্ত গল্প লিখেছেন. একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। "ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়" — এই আশায় 'সন্দেশ' পত্রিকার সূত্রপাত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর — সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদ এবং মনোবঞ্জনী এমন বিষয়ের অনুসন্ধানে, আমরা দেখতে পাই, নিজেকে কত বিচিত্র দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন সুকুমার। আর অনেক সময়েই তাঁকে লিখতে হচ্ছে এমন বিষয় নিয়ে যেটি তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র নয়।

যেমন তাঁর পৌরাণিক এবং অন্যান্য অনুবাদ গল্পগুলি। পরিচিত পাঠকমাত্রেই জানেন সুকুমার এপথে প্রথম ব্রতী নন। তাঁব আগেও বিদেশী পুবাণের অনেক গল্প অনুদিত

হয়েছে — বয়স্ক, অল্পবয়স্ক উভয় শ্রেণীর পাঠকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে। এব্যাপারে বিশেষভাবে স্মরণীয় সুকুমারের অব্যবহিত দুই পূর্বপুরুষ — উপেন্দ্রকিশোর এবং খুল্লতাত কুলদারঞ্জন। এঁরা দুজনেই ভারতীয় পাশ্চাত্য পুরাণ, ইতিহাস লোককথার বিশাল বর্ণাঢ্য জগতেব সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর তরুণ পাঠকবৃন্দের পরিচয় করিয়েছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর থেকে ইলিয়াড ওডিসি আবার মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ডের মহৎ দস্যু রবিন হুডের নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁদের ক্ষেত্র। সুকুমার এঁদের দুজনের কাছেই ঋণী। বিশেষত উপেন্দ্রকিশোরের প্রভাব তাঁর অনেক গল্পেরই ভাব এবং ভাষায় অনুভব করা যায়। যেমন তাঁর "পাজি পিটার" গল্পটি উপেন্দ্রকিশোরের "ঝানু চোর চানু"-র কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সুকুমার এ জাতীয় গল্পে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেননি, তাঁব দুই পূর্বসূবীই পেয়েছেন অনেক বেশি সার্থকতা। সুকুমারের বেশির ভাগ অনুবাদ গল্প সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কেবল দুএকটি রচনায় আমাদের প্রাপ্তি হয আবো বেশি। যদিও এ গল্পগুলির কতখানি অংশ মূল রচনাব আক্ষরিক অনুবাদ, আর কতটাই বা সুকুমারের সংযোজন তা নিশ্চিতরূপে নিরূপণের কোনো উপায় নেই। তবু যেরূপে তাদের দেখতে পাচ্ছি, তাতে তারা যে বসোত্তীর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। "খৃষ্টবাহন" এবং "ভাঙাতারা" সেই রকম দুটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত গল্প।

"খৃষ্টবাহন" হল রোমান ক্যাথলিক ধর্মের কাহিনী — সেন্ট ক্রিস্টোফাবেব জীবনকথা। একটি ধর্মীয় কাহিনী ভক্তমন্ডলীব বাইরে, সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীব জন্য লেখা বড় সহজ কাজ নয়। অনেক সময়ে ভক্তদের কাছে যা ঈশ্বরের লীলা, সাধারণ পাঠকের মনে তা সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয। সুকুমারের সমস্যা আরো গুরুতর ছিল। তিনি লিখছিলেন অ-খ্রীষ্টান পাঠকদের জন্য। একজন রোমান ক্যাথলিক পাঠকের মনে ঐতিহ্যসূত্রে পাওযা এ কাহিনী — তিনি যদি ভক্ত নাও হন তবুও — যে আবেদন নিয়ে আসবে, অল্পবয়সী অ-খ্রীষ্টান বাঙালি পাঠকের পক্ষে তাব অর্থ বোঝাও হয়ত সম্ভব নয়। তবুও, এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটি হৃদযহারিনী কাহিনী লিখতে পেরেছেন সুকুমাব।

মূল কাহিনীটির ধর্মীয় অনুষঙ্গ তিনি বর্জন করেননি। সকলের ত্রাণকর্তা যীশুর কথা অবশ্যই আছে এ গল্পে। কাহিনীর নায়ক অফেরো ত ক্রুশের মানুষ যীশুকেই খুঁজেছে। তাঁকে পাবে বলেই স্বর্গ আব মর্তেব মধাবর্তী অন্ধকার নদীর কান্ডাবীর কাজ নিয়েছে সে, পার করেছে কত মানুষকে — কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু, শয়তানের কত পাপেব বোঝা। অবশেষে একদিন আলোর মুকুট পরা মহাপুরুষ তাকে ত্রাণ করেছেন, তার নাম দিয়েছেন সেন্ট ক্রিষ্টোফার এবং তাকে দিয়েছেন অক্ষয় স্বর্গের অধিকার। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ পাঠক ধর্মীয় এই রূপকের অন্তরালে শাশ্বত আদর্শের অপার মহিমা দেখতে পায়। পায় সেই মহান আদর্শের প্রতি মহৎ একজন মানুষের চিবকালীন আনুগত্যের কথা। পাহাড়ের মত শরীর, সিংহের মত বল আর আগুনের মত তেজসম্পন্ন অফেরো খুঁজেছিল এমন একজন রাজাকে যে বাজার ভয় নেই। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহেব ভয় এমনকি যার নেই মৃত্যুর বা শয়তানের ভয় সেই রাজাকে। এই 'মাভৈঃ' এর বাণী এতো কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের কথা নয়, একে ত সবদেশের সবকালের মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম বলে মনে করেছে। চিরকালীন আদর্শ, মহত্তম আদর্শেব এই কাহিনী বলেছেন সুকুমার নিতান্ত অনাড়ম্বব ভাবে। কোনো নীতিকে

পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। অল্পবয়সী পাঠকদের সামনে অতি সহজে তিনি শুধু তুলে ধরেছেন অনুকরণীয় এক জীবনাদর্শ।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম "ভাঙাতারা"। আকাশে সপ্তর্ষি মন্ডলের জন্মকথা নিয়ে মাওরি দেশের কাল্পনিক একটি কাহিনী এখানে সুকুমারের অবলম্বন। এ গল্পের স্বাদ এবং প্রকৃতি দুইই প্রথমটি থেকে ভিন্ন। কাহিনীটি নিম্নরূপ; সব আকাশের পরীর মত মাতরিকিরও একটি তারা ছিল। সবচেয়ে ঝকঝকে, সবচেয়ে সুন্দর সেই তারাটি দেখে অন্যান্য আকাশ-পরীদের বড় হিংসে হত। কিন্তু গাছের দেবতা তানের মনে শুধু হিংসা নয়, প্রতিহিংসা জেগে উঠল। মাতরিকির তারাটি নষ্ট করতে বদ্ধ পরিকর হলেন তিনি। তানের মতলব জানতে পারল মাতরিকির দুই বন্ধু দখিন হাওয়া আর জলের রাজার ছোট্ট মেয়ে। আকাশের দেশে গিয়ে মাতরিকিকে সাবধান করে আসতে চাইল তারা। তখন ভোর হয়েছে। "সূর্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোনার সাজে পূবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তাঁর কাছে আবদার করল, "আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব।" সূর্য তাঁর একখানি সোনালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠতে লাগলেন। সকাল বেলার কুয়াশা দিয়ে দক্ষিণ হাওয়া তাঁকে ঘিরে ঘিবে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি করে রাজার মেয়ে মাতরিকির বাড়িতে গিয়ে তাকে সব খবর বলে,... ঝাপসা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।"

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে এবং দুষ্টু আকাশ পরীরা মাতরিকির তারাটি ধরতে বেরোল। মাতরিকি দুহাত দিয়ে তারাটিকে ধরে ছুটতে লাগল, "ছুট ছুট ছুট। আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটাছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।" শেষকালে তানে মস্ত একটা তাবা ছুঁড়ে মাতরিকির সাধের তারাটি সাতটুকরো করে দিল। সেই ভাঙ্গাতারার সাতটি টুকরো আকাশের গায়ে একই জায়গায় ঝিকমিক করে আজো। "ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনও তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতরিকির দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।"

রূপময় গদ্যের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি থেকে "ভাঙা তারা"-র রচনাবৈশিষ্ট্য কিছুটা বোঝা যাবে। আমরা জানি , ছোটদের জন্য লেখা গল্প এবং কবিতায় শব্দের ধ্বনিগুণকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, বর্ণনাও সেখানে হয় চিত্রময়। কারণ ছোটদের কল্পনার জগৎ মূলত দৃষ্টি এবং শ্রুতিগ্রাহ্য। ধ্বনি এবং চিত্রের সাহায্যে সুকুমার ও তাঁর বর্ণনাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন, অল্পবিস্তর সব লেখাতেই। কিন্তু তাদের মধ্যেও "ভাঙাতারা"-র স্বাতন্ত্র্য খুব স্পষ্ট। এখানে ছবিই হয়ে উঠেছে সর্বময়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছবির ওপর ভর দিয়েই এগিয়ে চলে কাহিনী। সেই সঙ্গে "এমন সময়ে দখিন হাওয়া গুনগুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল।"
এইরকম দু একটি বাক্যে সুকুমার যেন ইন্দ্রিয়বেদ্য গদ্যের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে স্পর্শ করে যান কবিতাব অতীন্দ্রিয় জগৎ। বুঝতে পারি কেন সুকুমারকে "অপ্রতিরোধ্য কবি" বলে মনে হয় কোনো কোনো সমালোচকের।

৪

কিন্তু তাও নিরপেক্ষ বিচারে, গল্পকার সুকুমার রায়ের কৃতিত্বের পরিমাণ খুব বেশি বলা যায়না। অনেকসময়েই যেন তাঁর গল্প নেপথ্যলোকের প্রস্তুতিতেই ফুরিয়ে যায়, আমাদের প্রত্যাশা জাগিয়ে

তোলেন তিনি, পূর্ণ করতে পারেন না। সন্দেশ-পত্রিকার জন্যই লেখা হয়েছিল তাঁর সব গল্প। অনেকসময়েই হয়ত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা — পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণের তাগিদে লিখতে হয়েছে তাঁকে একাধিক রচনা। তাঁর গল্পগুলির অসম্পূর্ণতার এও একটা কারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ হল নিতান্ত অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া। রোগশয্যায় শুয়েও আবোল তাবোল-এর কবিতাগুলি বারংবার সংশোধন করে দিয়েছেন সুকুমার, তাদের গ্রন্থাকারে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন, এসব কথা যখন পড়ি তখন মনে হয় সময় পেলে গল্পগুলিও তিনি মার্জনা করতেন, তাদের দিতেন সুসংগত কলেবর। অপূর্ণ সেই সম্ভাবনা আমাদের বিষন্ন করে বটে, কিন্তু সমালোচকের কাজ তো সাহিত্যিকের রচনার যেরূপ তাঁর সম্মুখে বর্তমান সেগুলি নিয়েই। সেই অনুসারে বিচার করলে সুকুমারের অনেক গল্পই বেদনাকর ভাবে খণ্ডিত মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে আছে এক আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি একথা জানবার জন্য কোনো সমালোচকের দ্বারস্থ হতে হয় না। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গল্পগুলি যে শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে এই তথ্যই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই আকর্ষণী শক্তির উৎস কোথায় ? সুকুমারের প্রাণোচ্ছল স্বভাবের কথা বলেছেন তাঁর একাধিক কাছের মানুষ। তাঁদের বিবরণ পড়ে জেনেছি রায়চৌধুরীদের ছোট ছেলেমেয়ে ঠাসা বাড়ি দিনরাত ঝমঝম গমগম করত, তাদের হাসিগানে, ছোট ছোট কলহ, ভাবে। আর এদের সকলের মধ্যমণি ছিলেন, সকলের বড়দা — সুকুমার রায়। কখনো তিনি ছোটভাই-বোনেদের "ভবন্দোলা", "কম্পু" প্রভৃতি কাল্পনিক জানোয়ারের কথা বলে ভয় দেখাচ্ছেন, কখনো ছোটো বোনটির দুঃখ দূর করতে তার গাছের সাদা ফুলগুলো বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছেন। ডায়েরীর এক কোনে, অনেক কাটাকুটির মাঝখানে তিনিই লিখে রেখেছিলেন,

> "জড়জগতের বস্তু ভিটায় বস্তু করেন বাস।
> নিংড়ে দেখ, রসের মধু মৌচাকে তাঁর ঠাসা।"

জীবনের অন্তঃস্থিত প্রাণমধুর সন্ধান পেয়েছিলেন সুকুমার, তাঁব জীবনের নানা ঘটনাই তার প্রমাণ। কিন্তু এসুব কথা যদি নাও জানতুম তাও, তাঁর গল্প পড়েই সুকুমারের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করে নিতে পারতুম। কারণ এক প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়েছে তাঁর সমস্ত গল্প, প্রত্যেকটি রচনাই জীবনের প্রবর্ধমান লাবণ্যে ভরপুর। সহজ সাবলীল গদ্য তাঁর গল্পগুলির দ্বিতীয় গুণ। বাংলাসাহিত্যে এ গদ্যের স্রষ্টা অবশ্য উপেন্দ্রকিশোর। "ঠাকুরমার ঝুলি"-র গদ্যের সঙ্গে "টুনটুনির বই"-এর গদ্যর তুলনা করলেই দ্বিতীয়টির রূপ ধরা পড়ে। দুটি বই-ই লেখা হয়েছে শিশুদের জন্য, দুটিতেই আছে ভাষার সারল্য, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের ভাষায় আছে অতিরিক্ত একটি মাত্রা যা দক্ষিণারঞ্জনে অনুপস্থিত। এগুণকে বলতে পারি "নাগরিকতা", নাগরিকতার চাতুর্য নয়, কিন্তু একটি মার্জিত পরিশীলিত গদ্যরূপ। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের একাধিক সদস্যের — কুলদারঞ্জন, সুখলতা, পুণ্যলতা এবং সুকুমারের লেখায় এই গদ্যেরই অল্পবিস্তর ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাই। তবে সুকুমারই যেন এই গুণ সবচেযে বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাই বলে একথা ভাবা অন্যায় হবে যে সুকুমারের লেখার — বিশেষ করে গল্পগুলির, নিজস্বতা নেই. তাঁর সবটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পিতাপুত্রের রচনার যেগুলি শ্রেষ্ঠ অংশ তাদের মধ্যে

তুলনা করলে দেখি, উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমারের রচনার প্রভেদ কোথায়। উপেন্দ্রকিশোর বাংলা শিশুসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, নানা নিরীক্ষণ করেছেন কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "টুনটুনির বই"। অপরপক্ষে, সুকুমার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ, সবচেয়ে সার্থক হয়েছেন পাগলা দাশু-র অন্তর্গত গল্পগুলিতে। অর্থাৎ বলা যায়, উপেন্দ্রকিশোরের সম্ভাব্য পাঠক তারাই যাদের মনের দাঁত এখনো ওঠেনি, আর সুকুমার লিখেছেন তাদের জন্য যাদের দুধে দাঁত পড়বার সময় হয়ে এসেছে। যারা জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে মাতৃক্রোড়চ্যুত অথচ যাদের এখনো বয়স্কের জগতে প্রবেশাধিকার মেলেনি তাদের জন্য।

মানবজীবনে এ অবস্থাটা খুব সুখের নয়। চাণক্য ত এবয়সের জন্য কেবল তিরস্কার আর তাড়নার ব্যবস্থা করেছেন। আর সমাজে সম্মান পেলে তবেই সে বিষয় সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছুটি, গিন্নী, সমাপ্তি প্রভৃতি একাধিক গল্পে বয়ঃসন্ধি যুগের বেদনা আর নিঃসঙ্গতার কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি হল বয়স্কের চোখ দিয়ে কৈশোরকে দেখা। কিন্তু বাঙালি সমাজে ধীরে ধীরে কৈশোর সম্বন্ধে একটা সচেতনতা যে জন্ম নিচ্ছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত ছোটদের একাধিক পত্রিকা তার অন্যতম প্রমাণ। যদিও তখনো, স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকা উভয়ের জন্যই একই পত্রিকা ছাপা হত। এমনকি জ্ঞানদানন্দিনীর "বালক" পত্রিকাও একবৎসর পরেই "ভারতী"-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। প্রথমে "সাথী" তারপরে "মুকুল" পত্রিকাতেই পৃথক ভাবে কিশোরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। আর শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকার পাতাতেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বালক সুকুমারের। পরে, রায়চৌধুরী পরিবারের নিজস্ব পত্রিকায় কৈশোর জীবনের আনন্দ বেদনাকে নিজস্ব স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পারিবারিক আবহাওয়া তাঁর মানসিক বিকাশে সাহায্য করেছিল, প্রতিভা তাঁকে দিয়েছিল অপ্রয়াসের নৈপুণ্য, এদেরই সাহায্যে তিনি বাংলা কিশোর সাহিত্যের বীজ রোপণ করেছিলেন; যা আজ পুষ্পে পত্রে মহীরুহের রূপ ধারণ করেছে।



সুকুমার রায় : তাঁর ভাষাচিন্তা

পবিত্র সরকার

রবীন্দ্রনাথের পর সুকুমার রায়ই এক বড়গোছের বাঙালি কবি, যিনি "ভাষার আশ্চর্য রহস্য"[১] নিয়ে কেবল কবি হিসেবে নয়, বিশ্লেষক তাত্ত্বিক হিসেবেও কিছুটা ভেবেছেন। কবি-যে ভাষা নিয়ে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি করে ভাববেন, তাতে কোনো বিস্ময় নেই। স্বভাব-কবিরা হয়তো প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে যে-কথাগুলি উঠে আসে সেগুলিই পর-পর সাজিয়ে দেন, কিন্তু সুকুমারের মতো প্রায় আত্মসচেতন কবি, যাঁর আনন্দ ও কল্পনার স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত ছিল তাঁর পরিমার্জনের সংকল্প, কিন্তু অনুদার আয়ু যাকে এক 'আবোল তাবোল' (১৯২৩)-এর কবিতার "পরিবর্তন ও পরিমার্জন"[২] করবার অবকাশ মাত্র দিয়েছিল — তিনি-যে ভাষা সম্বন্ধে আর-একটু তীক্ষ্ণ সচেতনতা দেখাবেন, তা-ই তো প্রত্যাশিত।

ভাষা সম্বন্ধে সুকুমার রায়ের মনোযোগের আর-একটা বড় উৎস তাঁর ভাষা নিয়ে খেলা করবার সোল্লাস উৎসাহ। ধরা যাক, 'ঝালাপালা' নাটক রচনার পর ননসেন্স ক্লাবের সম্পাদক হিসেবে তাঁর এই চিঠির বয়ান :

এই নাটক ননসেন্স ক্লাবের স্থাবর সম্পত্তি। যে-কেহ এই নাটক উক্ত ননসেন্স ক্লাবের বিনানুমতিতে আত্মসাৎ করিবে বা করিতে চেষ্টা করিবে অথবা এই নাটকের বা ইহার অংশ বিশেষের কোনও রূপ তর্জমা, নকল বা কোনও প্রকার অনুকরণ করিবে, বা করিতে চেষ্টা করিবে, অথবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, কিম্বা অপর কাহাকেও উক্ত প্রকার দুষ্কার্যের প্রবৃত্ত, উৎসাহিত বা সাহায্য করিবে, তাহারা এবং অন্তরঙ্গ ইয়ার বর্গকে, বিশেষ প্রকারে উত্তম মধ্যম অধম এবং বেদম দমাদম দেওয়ার বন্দোবস্ত উক্ত ননসেন্স ক্লাব কর্তৃক অচিরাৎ করা হইবে।[৩]

ভাষার মজাকে তিনি নানাভাবে সন্ধান করেছেন নানা জায়গায়। খেলার প্রসঙ্গ খুব স্পষ্টভাবেই এসেছে দুটি গদ্য-রচনায়। একটি হল 'বিবিধ'-এর অন্তর্গত "মামার খেলা"[৪] নামে ছোট্ট সংলাপিকা, সেটি শুরু হয়েছে এইভাবে :

মামা বললেন, "আয় একটা নূতন খেলা খেলবি আয়।" শুনে সবাই দৌড়ে এসে ঘিরে বসল — "কি খেলা, মামা?" মামা বললেন, "এ খেলার নিয়ম খুব সহজ, কিন্তু খেলতে হলে খুব হুঁশিয়ার হওয়া চাই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, সবাই যেমন ইচ্ছা কথা বলতে পাববে, কিন্তু একটা অক্ষর বাদ দিযে।" সবাই বললে, "সে আবার কিবকম?"

মামা — এই মনে কর, যেন 'ক' বলব না — এমন কোন কথাই বলব না, যার মধ্যে কোথাও 'ক' আছে। যেমন — কলা, কৃপণ, হাল্কা, বাক্য — এসব কিছুই বলতে পারব না।

তারপর মামা খেলতে আরম্ভ করল, বিপাকে পড়ে 'ক'-এর বদলে 'প্রথমে 'ল', তারপর

'ল'-কে বাদ দিয়ে 'ন'-কে বেছে নিল, কিন্তু খেলায় তেমন সুবিধে করতে পারল না, তা আমরা সবাই জানি।

ভাষার দ্বিতীয় যে-খেলাটির কথা নিছক আলোচনা সূত্রে সুকুমার আমাদের জানিয়েছেন, তার নাম শারাড (charade) বা হেঁয়ালি নাট্য। ১৯২১-এ এ বিষয়ে 'সন্দেশ'-এর ছোট পাঠক-পাঠিকাদের জানাচ্ছেন সুকুমার। এর অনেক আগে, ১৯০৭-এ রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ কয়েকটি 'শারাড' লিখেছিলেন, সেগুলি 'হেঁয়ালি নাট্য' নামেও পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি হাসির নাটিকা মাত্র, সুকুমারের অর্থে শারাড নয়। কাজেই সুকুমার পাশ্চাত্ত্য দেশের ভাষা-নির্ভর শারাডের সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বিবরণ :

এ খেলা দেখতে ('দেখাতে' হওয়া উচিত সম্ভবত — প:স:) এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়। যেমন Handsome (Hand ও Some বা sum), অথবা Carpet (Car বা cur ও Pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন্ কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হল।[৫]

ভাষার খেলার দিকে ব্যক্তিজীবনে এই আকর্ষণ প্রকাশ্যতই তাঁর রচনাকর্মে সঞ্চারিত ও বিস্তারিত হয়েছে, তা আমরা প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করি। শব্দকে টুকরো করে তার অংশ নিয়ে 'পান্' (Pun) করার উদ্দাম প্রবণতা প্রায়ই উঁকি দেয় তাঁর রচনায়। "টাটকা নূতন পালা। **পালার** নাম ঝালা**পালা**",[৬] (স্থূলাক্ষর আমাদের — প: স:), কিংবা 'চলচিত্তচঞ্চরী'-তে

ঈশান। ...উনি আগ্রহ করে আসছেন সে তো ভালোই।...

সত্যবাহন. আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।[৭]

শ্রীখন্ডদেবদের আশ্রমের পাঠ্য বই 'শব্দার্থ-খন্ডিকা' শারাডের ধরণেই শব্দকে (ওঅর্ড-কে) খন্ড খন্ড করতে চায়। তার কথা আমরা আবার পরে বলব, কিন্তু শব্দ নিয়ে খেলার এই নেশা থেকে সুকুমার রায়ের কবিব্যক্তিত্বের একটা বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুকুমার ভাষার এই সব সম্ভাবনাকে চূড়ান্তভাবে বাজিয়ে দেখতে চান। শিশুদের জগতের এক মহৎ কবি তিনি, সেজন্য শব্দে ছন্দে মিলে — কল্পনায় অভাবনীয় উল্লাসে ও ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাসে সংযোজনে বিয়োজনে তিনি ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো ভাষার দিগ্‌দিগন্ত ছুঁয়ে আসতে চান। শব্দকে ভেঙেচুরে, উলটে পালটে, নানাভাবে সাজিয়ে তিনি দেখতে চান তাঁর চেনা শব্দের ভান্ডার অর্থ ও ধ্বনির দিক থেকে তাঁকে কত কত মজা উপহার দিতে পারে। ভাষার সীমানা জানতে পারলে তার ভিতরকার চেহারাটাও অনেকটা জানা হয়ে যায় আমাদের। ভাষা নিয়ে সেই কারণেই খেলা করেন তিনি। ভাষার সঙ্গে তাঁর চ্যালেঞ্জ, খুনসুটি আর আড়াআড়ির সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের বন্ধুত্ব হয় অতীব প্রগাঢ়। "আবোল তাবোল"-এর বিখ্যাত "খিচুড়ি" কবিতায় দুটি

পৃথক শব্দের জোড়কলম বা portmanteau করে 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'হাতিমি', 'মোরগরু', 'জিরাফড়িং' ইত্যাদি শব্দ ওই খেলার স্ফূর্তির থেকেই তৈরি করেন সুকুমার। এ কাজে লিউইস ক্যারল তাঁর অনুপ্রেরণা ছিলেন[৮] এ কথা যদি কেউ বলেন, আমরা তাঁকে পালটা প্রশ্ন করব, ক্যারল কি সুকুমারের মতো "শব্দকল্পদ্রুম" লিখেছিলেন কবিতায়, নাটকে? ধ্বনি ও অর্থের অসামান্য সজ্জায় উচ্ছল এত অধিক সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন কি ক্যারল? বাংলা ভাষার অনুকার শব্দের এমন বিপুল ব্যবহার, অন্তর্মিল ও প্রান্তিক মিলের এমন সমৃদ্ধ সম্ভার সুকুমারের কবিতাগুলিতে প্রায় অবলীলায়, এমন-কী অবহেলায় বিস্তীর্ণ হয়ে আছে যে, ইংরেজি শিশু-কবিতার ক্ষেত্রে তার তুলনীয় উদ্ভাবন ক্যারলে নেই, এমন-কী এডোয়ার্ড লিয়রেও নেই। এসব সূত্র থেকে দুটো একটা প্রসঙ্গ বা প্রকরণ হয়তো ধার নিয়েছেন সুকুমার, কিন্তু তাঁর কবিত্ব, যে-কবিত্ব বাংলা ভাষার দেশজ ও মৌলিক শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে, বাংলা ভাষার নিজস্ব ছন্দের সঙ্গে, গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে, তা অতিশয় মৌলিক ও অতুলন। তাঁর ভাষার ব্যবহার, তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা ও গদ্যরচনা সেই প্রবল ও নন্দিত মৌলিকতার অভ্রান্ত প্রমাণ। কিন্তু আমরা এখানে তাঁর ভাষা-প্রয়োগের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও অনর্গল উচ্চারণের আলোচনা করব না,[৯] বরং লক্ষ করব সুকুমারের ভাষা-বীক্ষণ — ভাষার রহস্য সম্বন্ধে তাঁব জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তকে।

২

'বর্ণমালাতত্ত্ব'-(১৩৬৩)-এর "ভাষার অত্যাচার" প্রবন্ধটিতেই ভাষা সম্বন্ধে সুকুমার রায়ের প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও আলোচনার সাক্ষাৎ পাই। তার বাইরে, সুকুমারেব কবিতা ও নাটকে, ভাষা সম্বন্ধে তাঁর যে-ভাবনার পরিচয় আছে তা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়। অর্থাৎ সেগুলিতে তিনি নিজের জবানিতে স্পষ্ট করে আমাদের কিছু জানাচ্ছেন না, কিন্তু তাঁর প্রয়োগ থেকে, বা চরিত্রগুলির সংলাপ থেকে, অন্তর্লীন ভাষাচিন্তাকে আমাদের উদ্ধার করে নিতে হচ্ছে। "ভাষাব অত্যাচার"-এর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর অন্যান্য রচনা পড়লে ভাষা বিষয়ে তাঁর আগ্রহের যে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, সেটি হল শব্দ ও অর্থের নিগূঢ় সম্পর্ক বিষয়ে। শব্দ অর্থাৎ ওঅর্ড হল এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটি নির্দিষ্ট রূপ। এই ধ্বনিবদ্ধ ভাষাগত এককটির সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্কটি ঠিক কী? ধ্বনিগঠিত সমগ্র শব্দটিতে অবশ্যই একটা অর্থ পাই আমরা। কিন্তু ওই শব্দের পৃথক পৃথক ধ্বনি-অংশে কি অর্থের অংশ আছে? উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করে সুকুমারের প্রশ্নের পটভূমিকাটি পরিষ্কার করা যাক।

'নাম' — এই কথাটির একটি অর্থ আছে। এ কথাটি ন্+আ+ম্ — এই তিনটি আলাদা ধ্বনির সমবায়। তাহলে 'নাম' অর্থের কোনো একটা অংশ কি 'ন্' ধ্বনিতে আছে? 'আ' ধ্বনিতে আছে? 'ম্' ধ্বনিতে আছে? ওই অর্থকে তিনটে ভাগে ভেঙে এই তিনটে ধ্বনির মধ্যে বিতরণ করা কি সম্ভব?

সহজ বুদ্ধিতেই বলতে পারি, তা আদৌ সম্ভব নয়। নাম-এর অর্থের এক তৃতীয়াংশ যদি ন্-এর থাকে, তাহলে 'নাচ'-এর ন্-এর ওই অর্থ থাকার কথা। কিন্তু নাম-এর অর্থের ওই অনুমিত ন্-নির্ভর এক তৃতীয়াংশের সঙ্গে 'নাচ' অর্থের এক তৃতীয়াংশের কোনো সাদৃশ্যই পাব কি আমরা?

এমন-কী দুটি শব্দেরই ধ্বনিগত দুই-তৃতীয়াংশ হল 'ন্+আ' = না; কিন্তু তার ফলে দুটি শব্দের অর্থের দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে কি মিল পাচ্ছি আমরা? কখনোই না।

ভাষাবিজ্ঞানের দ্বিধাহীন উত্তর — শব্দের ধ্বনিগত শরীরগঠনের সঙ্গে, কী সমগ্র ধ্বনিরূপ, কী আংশিক ধ্বনি — কারও সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অর্থের কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীন তর্কের (নোমিনালিস্ট ও কনভেনশনালিস্টদের) জবাবে, এবং প্রাচ্যের ধ্বনিগত মিস্টিসিজ্‌ম ও মন্ত্রশক্তিকে অস্বীকার করে ভাষাবিজ্ঞান বলে, ...the linguistic sign is arbitrary.[১০] এ শতাব্দীর গোড়ায় ফের্দিনান্দ দ সোশ্যুর-এর (১৮৫৭-১৯১৩) এই কথা উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিগঠন ও তার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ আপতিক, আন্তরিক নয়। শুধু আপতিক না বলে হয়তো বলা উচিত নৈমিত্তিক বা conventional। অর্থাৎ সমাজের সকলে মিলে বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থ স্বীকার করে নিয়েছে, তাই সে-অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলায় 'কুকুর' অর্থ বোঝাতে আমরা k-u-k-u-r এই পাঁচটা ধ্বনি পরপর সাজিয়ে দিই, ইংরেজ সাজায় তিনটি ধ্বনি — d-o-g, আবার জার্মান সাজায় চারটি h-u-n-t (বানানে hund)। বাংলা ইংরেজি ও জার্মান শব্দ তিনটিতে ধ্বনিগত মিল যৎসামান্য, কিন্তু অর্থগত মিল প্রায় সবটাই। এ থেকেই বোঝা যায়, শব্দের ধ্বনিশরীর আর তার অর্থ কোনো অনিবার্যতার সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়।

"ভাষার অত্যাচার" প্রবন্ধে লক্ষ করি, সোশ্যুর একথা বলার খুব অল্প ক-দিনের মধ্যেই সুকুমারও একথা গ্রহণ করেন, হয়তো স্বাধীনভাবেই, কারণ সোশ্যুর তিনি পড়বেন এমন সম্ভাবনা কম। সোশ্যুরের বই ইংরেজিতে পাওয়া গেছে ১৯৫৯-এ মাত্র। এ প্রবন্ধে সুকুমার স্পষ্টই বলে দেন, "নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভাষা জিনিসটা গোড়া হইতে একটা কৃত্রিমতার কারবার।[১১] কৃত্রিমতা এই অর্থে যে, গোরু-র গ্-ও-র্-উ — এই চারটি ধ্বনির সঙ্গে গোরু জীবটির কোনো সম্পর্ক নেই, এই ধ্বনিসমবায়ের উপর অর্থটি নেহাৎই চাপিয়ে দেওয়া। তাই এই কৃত্রিমতা। 'গাধা' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র দশজন লোক কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবতে শুরু করে — "কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে"[১২] এইরকম এক-একটা অর্থ তৈরি হয়ে যায়। এই সব অর্থের কী সীমাবদ্ধতা বা শক্তি আছে, সে কথা সুকুমার এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, অর্থটা ভাষার পক্ষে জরুরি, অর্থের গৌরবই ভাষার গৌরব। "ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য।"[১৩] এখানে সুকুমার শব্দ বলতে ওঅর্ড (word) বোঝাননি, বুঝিয়েছেন ধ্বনি বা sound.

যারা ধ্বনি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, সুকুমারের রচনায় তাদের প্রচুর দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন 'চলচিত্তচঞ্চরী'র শ্রীখন্ডদেব। সে-ব্যক্তি তার "গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থিসিস অভ ফোনোটিক ফরম্‌স" তত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করে:

"মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে'। গো মানে গোরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ — পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি? সুতবাং এটা সাধন কবলে গো বললেই মনে হবে

পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র সূর্য, ব্রহ্মান্ড। 'রু' মানে কি? 'বব রাব রুত রোদন' 'কর্নেরোতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং', 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের অব্যক্ত মর্মব শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ-দুঃখ ক্রন্দন — সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে — মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স — দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব বস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খন্ডিকায় এইবকম দেড়হাজাব শব্দ আমি খন্ডন কবে দেখিয়েছি।[১৪]

শ্রীখন্ডদেব অবশ্য শব্দ বলতে sound আর ওঅর্ড দুইই বুঝিয়েছে। আর সে ওঅর্ডকে পৃথক পৃথক ধ্বনিতে ভাগ না করে ভাগ করেছে সিলেব্‌লে, তাতে তার একটু সুবিধে হয়েছে। কারণ, এক সিলেব্‌লের শব্দ প্রচুর পাওয়া যায়, তার মানেও আছে। তাই সিলেব্‌ল থেকে সে অর্থ দোহন করতে পারছে। কিন্তু ভাষার সমস্ত শব্দকে এভাবে ভাঙা যায় না। তাই বাংলাভাষার দেড়-দু লক্ষ শব্দের মধ্যে তাকে মাত্র দেড় হাজার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শ্রীখন্ড বাবাজি অর্থকে সম্পূর্ণ বর্জন করছে না, বরং আস্ত শব্দ ভেঙে শব্দখন্ডের মধ্যেও সে অর্থের সন্ধান করছে। একটা শব্দ ভেঙে সে পাচ্ছে একাধিক অর্থ, আবার প্রতিটি শব্দখন্ডের বহুর্থকতা (polysemy) তাকে অর্থের এক বিপুল ভান্ডারের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে — এতেই সে উচ্ছ্বসিত। কাজেই শ্রীখন্ডদেব ধ্বনি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে অর্থের বহুধা সম্ভাবনা আবিষ্কারের জন্য, অর্থকে বর্জন করবার জন্য নয়। তার চেষ্টার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে, কিন্তু তার অভীষ্ট অর্থই। সে সিলেব্‌লের শরীর ভেঙে প্রতিটি ধ্বনির অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেনি ভারতীয় তন্ত্র বা স্ফোটতত্ত্বের ধরনে, করলে তার চেষ্টা সার্থক হত না। সুকুমার সে কথা জানেন।

৩

কিন্তু সুকুমারের অন্য একটি চরিত্র শুধু ধ্বনিরই অর্থ আবিষ্কার করছে, শব্দের নিজস্ব অর্থকে বর্জন করে। সে 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকের গুরুজি হরেকানন্দ। এখানে সুকুমার প্রাচীন পৃথিবীর ধ্বনিগত মিস্টিসিজ্‌মের কুসংস্কারকে নিয়ে আরেকটু ঠাট্টা করে নিয়েছেন। এ নাটকে বিহারী স্বপ্ন দেখেছে "একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে ঘড় ঘড় করে নাক ডাকছে।"[১৫] হরেকানন্দ তার ব্যাখ্যা করছে এই ভাবে

শব্দই আলোক। শব্দই বিশ্ব — শব্দই সৃষ্টি — শব্দই সব। আব দেখ, সৃষ্টিব আদিতে এক অনাহত শব্দই ছিল, আব কিছুই ছিল না। দেখ — প্রলয়েব শেষে যখন আব কিছু থাকবে না — তখনও শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ।

পরের সংলাপে হরেকানন্দ এ কথারই বিস্তার ঘটায় :

বেদ বল, পুবাণ বল, স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এসব কি? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতগুলো শব্দ — এই ত? এই যে সব শঙ্খ ঘন্টা, মন্ত্রতন্ত্র ক্রীং ক্লীং ঝাড় ফুঁক নাম জপ এসব কি? একি শব্দ নয়? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম্' শব্দ কবে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পাবত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়।... বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন? শিবেব মুখে বিষাণ কেন? হাতে তাব ডমরু কেন? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে চলতে বীণা বাজায় কেন?... আব অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান কর্নে ধ্বনিত হয়ে

আসছে, সে কি শব্দ নয় ? আর সেই কালিন্দীব কূলে যমুনার তীবে শ্যামের যে বাঁশরী বেজেছিল, সেও কি শব্দ নয় ? এমনি করে ভেবে দেখ, যা ভাববে তাই শব্দ। শাস্ত্রে বলেছে, 'শব্দ ব্রহ্ম'[১৫] —

এখানে শব্দের sound অর্থ ধরে নিয়ে হরেকানন্দ পৃথিবীর যাবতীয় শব্দের একটা স্ব-তন্ত্র জগত বা antonomous system খাড়া করতে চাইছে। এবং সেই প্রণালীতে শুধু ভাষার ধ্বনি (linguistic sound) নেই, আছে ভাষাবহির্ভূত (non-linguistic) সমস্ত ধ্বনি — শঙ্খ, ঘন্টা, বিষাণ, বীণা, বাঁশি ইত্যাদির আওয়াজ, সেই সন্নিসির নাকের ডাক পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, এই সব ভাষা-বহির্ভূত বা অ-ভাষিক ধ্বনি কখনো কখনো ভাষা-সংকেতের কাজ করে, কিন্তু জ্ঞাপন বা communication, ভাষার যা প্রধান কাজ, তা এগুলি দিয়ে খুব সুষ্ঠুভাবে হয় না। হরেকানন্দ ভারতীয় বিশ্বাস ও প্রণব মন্ত্র, নিউ টেস্টামেন্টের In the beginning there was Word, তন্ত্রেব হ্রীং ক্লীং, মন্ত্র ঝাড় ফুঁক-এর ধ্বনি-ম্যাজিক ইত্যাদি মেনে নিয়ে অর্থের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করতে চাইছে।

সে কিছু শব্দের বা ওঅর্ডের বর্ণনা করছে "জ্যান্ত জ্যান্ত" শব্দ বলে, আবার বলছে অর্থ-হীন "ঢৌঁড়া" জাতীয় শব্দেব কথা। ঢৌঁড়া শব্দের তেমন স্পষ্ট অর্থ নেই, বা বিপজ্জনক অর্থ নেই, ফলে তাদের নিয়ে কোনো সমস্যাও নেই। কিন্তু যে-সব শব্দ "জ্যান্ত জ্যান্ত" — তাদের "চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে ধরে মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে।"[১৭] বিষ হল "অর্থের বিষ", তা "জমে জমে উঠতে থাকবে, আর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে" ফেলতে হবে। বিষধর সাপেব এই বিস্তৃত মেটাফর নাটকের শেষে আর-একটু স্পষ্ট করছে হরেকানন্দ, বলছে শব্দেব বিষদাঁতটাই হল তার অর্থ, আগে, তাকে ভাঙতে হবে।

অর্থ নিয়ে অনেক সমস্যা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। "ভাষার অত্যাচার" প্রবন্ধে সুকুমার একে একে বলছেন সে সব সমস্যাব কথা। অর্থ একটা বস্তু বা ধারণার বহুমুখী পরিচয়কে একটা নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। "যে-কোনো জটিল জিনিসকে কতগুলি পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিযা লোকে মনে করে বিষযটাব একটা নিষ্পত্তি কবা গেল।"[১৮] এতে যারা চিন্তার দায় থেকে বেঁচে যায় তাদের কথাই নিবন্ধে সুকুমার বেশি কবে বলছেন, যেখানে একটা শব্দকে তারা একটা জটিল ধারণার বিকল্প ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু হরেকানন্দের আপত্তি একটু অন্য জায়গায়। তার মতে শব্দের মধ্যে অর্থ বস্তু সম্বন্ধে ধারণাকে অতিশয খণ্ডিত করে দেয় :

যদি বল 'পৃথিবী গোল' — তাব সঙ্গে অর্থ জুডে দেখ, কি ভযানক সংকীর্ণতা। পৃথিবী সূর্যেব চারদিকে ঘোবে তা বলা হল না, পৃথিবীব উত্তবে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হল না — তাব তিন ভাগ জল আব এক ভাগ স্থল, তা বলা হল না — তবে বলা হল কি ? গোটা পৃথিবীব সবটাই তো বাদ গেল।[১৯]

হরেকানন্দকে সুকুমার অতিরঞ্জনের মধ্যে ফেলে তার ভাবনা নিয়ে ঠাট্টা করছেন। হরেকানন্দের অভিযোগে যদি বিন্দুমাত্র সারপদার্থ থাকত, তাহলে পৃথিবীর কোনো বস্তু সম্বন্ধে কোনো statement করাই সম্ভব হত না, কারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্ণনাত্মক বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করলেই বিষয়টির বাকি পরিচয় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে হচ্ছে। শব্দের বা ওঅর্ডের

এইটাই কাজ, সেইজন্যই ভাষায় এত বেশি শব্দ দরকার হয়। প্রতিটি শব্দ, অন্তত আদর্শের দিক থেকে অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে, একটা নির্দিষ্ট খবর দেয় বিষয়টি সম্বন্ধে, তাতেই তার সাফল্য। অবশ্য যা আদর্শের দিক থেকে বা ঔচিত্যেব দিক থেকে প্রত্যাশিত তা বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময় সম্ভব হয় না। এক শব্দের বহু অর্থ দাঁড়ায়, প্রয়োগ অনুসারে অর্থের বদল হয়, তখন সমস্যাও দেখা দেয়। "ভাবুক-সভা"র ভাবুক দাদাও হরেকানন্দেব মতোই বলে ওঠে —

"অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া! ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা! যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে 'অর্থ অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে।"

সে আরো বলে,

(আরে) অর্থেব শেয কোথা, কোথা তাব জন্ম?
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকেব কম্ম?
অভিধান, ব্যাকবণ, আব ঐ পঞ্জিকা —
যোলো আনা বুজরুকি আগাগোড়া গঞ্জিকা।[20]

কিন্তু তাই বলে অর্থকে পুবোপুবি বাদ দিতে হবে — এ কোনো সুস্থমস্তিষ্ক বিবেচনার কথা নয়, "ভাষা নিজের অর্থগৌরবেই সত্য"। তাই হবেকানন্দ যখন অর্থেব "বিষদাঁত" ভেঙে দিয়ে অর্থহীন হিজিবিজি মন্ত্র তৈবী করছে —

হলদে সবুজ ওবাং ওটাং   ইটপাটকেল চিৎপটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি   নো অ্যাডমিশন ভেবি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সাবে গামা   নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি   ধর্মতলায় কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি   ব্লটিং পেপাব বাঘেব মাসি।[21]

তখন ভাষার অর্থের লজিক ও সংগতি সে ভেঙে দিচ্ছে। তার ছাত্ররাও "গৌ গাবৌ গাবঃ" মন্ত্র জপ করছে — যা ব্যাকবণের শব্দরূপ (paradigm)-এর তালিকা মাত্র, যা অর্থযুক্ত বাক্য নয়।

এ কাজ সুকুমার সমর্থন করেন না, সমর্থন করে না তাঁর চবিত্র বিশ্বকর্মা। সে ক্রুদ্ধ হয়ে তর্জন করে বলে "বিদ্রোহের বাজেনি সানাই? শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?" তাই সে 'শব্দকল্পদ্রুম' ছুঁড়ে মারে এবং "দ্রুম শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন" ঘটে।

হরেকানন্দ শব্দ থেকে অর্থকে নিষ্কাশন করতে চেয়েছিল এইজন্য যে, অর্থ ভাবকে সীমাবদ্ধ করে — রবীন্দ্রনাথের নারদ যেমন বলে "মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চাবিধারে, ...সীমা দেয় ভাবের চরণে।"[22] এই শতাব্দীতে আবার শব্দ বা ভাষা সম্বন্ধে একশ্রেণীর কবি-লেখক-নাট্যকারের মনে সংশয় জেগেছে ভাষা তার প্রকাশক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে বলে। শ্রীমতী আইরিস মারডক তাঁর সার্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে বিষয়টি বুঝিয়ে জানিয়েছেন, We can no longer take language for granted as a medium of communication. Its transparency has gone.[23] তাই আধুনিক কালের নানা রচনায় স্বচ্ছ, সুবোধ্য গদ্য-সংলাপের পরিবর্তে, অবোধ্য ধ্বনির অস্ফুট উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। বেকেটের নাটকে বোবা চরিত্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ইউজিন ইয়োনেস্কোর 'লা শেজ্' বা 'দ চেয়ার্স' নাটকের 'বক্তা' চরিত্রটির বক্তৃতার নমুনা তাই — M m m,

M m m, Gueue, Gou, Gu... এই নাট্যকারেরই 'স্যালিউটেশন্‌স' নাটকে সাধারণ ভদ্রতাসূচক "কেমন আছেন" প্রশ্নের জবাবে তৃতীয় ভদ্রলোক বলছে, Getting on... Adoloscently, arthritically, asteroidically, astrolabically, astrabiliously, balalaikally, baseballically, cacophonically, calliphysically, caniculishly, cantiieverishly ইত্যাদি। কংক্রিট কবিতার প্রবক্তারা পাতায় অক্ষর সাজানোর প্যাটার্ন তৈরি করে, শোনার ভাষাকে দেখার বস্তু করে তুলে তা থেকে নতুন অর্থ বার করার চেষ্টা করছে।[২৪] এসব অবশ্য ঘটছে সুকুমারের পরে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। কিন্তু সুকুমার যে-সমস্যাটা ধরেছিলেন, তার সঙ্গে আধুনিকদের সমস্যার একটা যোগ নিশ্চয়ই আছে। ' ভাষার অত্যাচার"-এ সুকুমার লক্ষ করেছিলেন, শব্দ ব্যবহার করে আমরা চিন্তার অস্পষ্টতা আড়াল করবার চেষ্টা করি। "এক-একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়।"[২৫] সুকুমার দেখিয়েছেন, "সনাতন ধর্মবিধি", "ত্যাগ", "ভারতীয় বিশেষত্ব", "হিন্দুত্বের ছাঁচ" ইত্যাদি শব্দ খানিকটা পূজাবেদির তেল-সিঁদুর মাখা মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে — এদের "স্বরূপলক্ষনাদির বিষয়ে আমাদের ধারণা যতই অস্পষ্ট" হোক না কেন তাতে "ঐ-ঐ শব্দনির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আমাদের আস্থা ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না।" ফলে ভারী ভারী শব্দ আমরা খানিকটা চিন্তার দৈন্য ঢাকা দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করি, ওই 'স্যালিউটেশনস' নাটকের চরিত্রের মতো। সুকুমারের নাটকে ও কবিতায় এই বিষয়টি বারবার এসেছে। তাঁর চরিত্ররা বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষা-প্রতিম শব্দের ইট দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করেছে। "পাগলা দাশু"-র "চালিয়াৎ" গল্পে শ্যামচাঁদ এই কারণেই "ভাল্‌কেনাইট টিউব", "ইরিডিয়াম", "স্টাইলো এন্ড ফাউন্টেন পেন কো, ফিলাডেলফিয়া" এই সব বলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। 'ঝালাপালা'র পন্ডিত একই কারণে ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছে এবং অজস্র ভুল সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিচ্ছে ব্যাকরণের সব প্রাথমিক সূত্র থেকে, ন্যায়শাস্ত্রের বা অমরকোষের উদ্ধৃতি হিসেবেই। 'চলচিত্ত-চঞ্চরি'তে "অনৈকাগ্রতা" অনভিনিবেশ, চঞ্চলচিত্ততা", "মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপল্‌স" ইত্যাদি কথা একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের দ্বারা এই mystification-এর চেষ্টা পুরনো মন্ত্রেরই আধুনিক সংস্করণ। 'হ-য-ব-র-ল'-তে কাক এই জন্যই হিসেবের আগে 'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমাবত খেসারত দলিল দস্তাবেজ"... ইত্যাদি ইত্যাদি। না লিখলে "হিসেব টিকবে কেন?"[২৭] ইত্যাদি লিখে রাখে। সুকুমার লক্ষ করেছেন, ভাষা "এক-এক সময় উদ্যোগী হইয়া আমাদের অজ্ঞতার উপর পান্ডিত্যের রঙ ফলাইতে থাকে। নিতান্ত সামান্য বিষয়েরও প্রকান্ড সংজ্ঞানির্দেশ করিয়া, অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না তাহারও একটা নামকরণ করিয়া, আমাদের বিজ্ঞতার ঠাট-বজায় রাখে এবং আমাদের পান্ডিত্যের অভিমানকে নানারূপ ছেলেভুলানো কথার সাহায্যে আশ্চর্য রকমে জাগাইয়া রাখে।"[২৮]

৪

শব্দ ও তার অর্থ বিষয়ে এত সব ভাবনা সুকুমারের, তা থেকেই তাঁর কবিতায় শব্দার্থের ওই নানা মাত্রা ও সম্বন্ধকে তাঁকে ব্যবহার করতে দেখি। আগেই বলেছি, তিনি জানেন "ভাষা জিনিসটাই

একটা কৃত্রিমতার কারবার।" শব্দের নানা অর্থ আছে, বিভিন্ন প্রতিবেশে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ স্ফুট হয়, এতেই প্রমাণ হয় যে শব্দের ধ্বনিশরীরের সঙ্গে তার অর্থের কোনো নিত্য ও অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। তবু সাধারণ মানুষের কাছে অর্থটাই সব — 'মিডিয়াম'-এর চেয়ে 'মেসেজ'টাই বড়। এই বোধটি চমৎকাব প্রকাশিত হয়েছে 'খাই খাই'-এর "আশ্চর্য" কবিতায়

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি —
বাঁদব বেকুব আজব হাঁদা
বকাট্ ফাজিল অকাট্ গাধা
আবাব লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি যতন করি —
"শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে ধনবে, লক্ষী যাদু।"
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
বচিয়া উঠিল খাতাব কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখব কটি
কেহ খুশী, কেহ উঠিল চটি।
রকম বকম কালিব টানে
কাবো হাসি কাবো অশ্রু আনে,
মাবে না, ধবে না, হাঁকে না বুলি
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?"[২১]

কিন্তু নিজে শিশুদের জন্য লিখতে গিয়ে শুধু চমৎকারজনক অর্থের দিকেই নজর দেননি সুকুমার শব্দটির ধ্বনিগঠনকেও তিনি বহুভাবে কাজে লাগিয়েছেন। শুধু যে-সব শব্দে ধ্বনিমাত্রার একটি বাড়তি সম্বন্ধকে ব্যবহার করেছেন, যেমন হন হন, কট কট, ধুপ্ ধাপ্ ইত্যাদি অনুকার শব্দের প্রয়োগে — সেটুকুমাত্র নয়। সুকুমার শব্দের দ্ব্যর্থকতা বা বহু-অর্থকতাকে বিচিত্রভাবে এনেছেন তাঁর নানা রচনায়। একজন যে-অর্থে একটা কথা বলছে, অন্য জন সম্পূর্ণ আরেক অর্থে কথাটা ধরে নিচ্ছে — এর ফলে তাঁর নাটকে বেশ কিছু দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। সুকুমারের শব্দ ও অর্থের সম্পর্কবিন্যাসের এই বিচিত্র স্তরগুলিকে আমরা কয়েকটি ছকে সাজাবার চেষ্টা করি :

ক. শব্দের ইডিয়মবদ্ধ বা মেটাফর-আশ্রিত ব্যাপক অর্থ না ধরে অতিরিক্ত আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ

'আবোল তাবোল'-এর সেই বিখ্যাত রাজা, যে রোদে-রাঙা ইঁটের পাঁজার উপর বসে ঠোঙা ভরা বাদামভাজা খাচ্ছিল। কিন্তু গিলতে পারছিল না — তার ঘটেছিল এই বিপত্তি। সে "ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক-বার" — এই প্রশ্নে 'ন্যাড়া'কে একটি ব্যক্তি হিসেবে ধরেছে এবং 'বেলতলাতে যাওয়া' ব্যাপারটিকেও আক্ষরিক অর্থেই বেলতলায় যাওয়াই বুঝেছে। ফলে "কিন্তু প্রশ্ন ক-বার যায়" নিয়ে সে উদ্‌বেজিত। এ প্রশ্নের যে উত্তর দিচ্ছে, সেই রোগা ভিস্তিওয়ালাও একই ভাবে

সামান্য ন্যাড়াকে ন্যাড়া-ব্যক্তি, সামান্য বেলতলাকে বিশেষ বেলতলা, এবং যাওয়াকে যে-কোনো যাওয়া বুঝে নিয়ে বলছে,

নেড়াকে তো নিত্যি দেখি আপন চোখে পরিষ্কার —
আমাদেরি বেলতলা সে নেড়া সেথা খেলতে আসে
হরে দরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার।

ইডিয়মের আক্ষরিক অর্থ ধরে নিয়ে সুকুমার আরো মজা তৈরি করেন 'অন্যান্য কবিতার "ছবি ও গল্প"[৩০] কবিতায়। সেখানে তিনি ছবি এঁকেই বুঝিয়ে দেন কীভাবে হাবু "গোল্লা পেয়ে" বাড়ি ফেরে, কী ভাবে তার চোখ দুটি "ছানাবড়া" আর মুখ "হাঁড়ি" হয়, তার বাবা কীভাবে রাগে "আগুন" হন, তাকে "তুলোধুনো" করে কীভাবে পেটান তিনি, সে তার ফলে কীভাবে চেঁচিয়ে "বাড়ি মাথায় করে", তাতে তার মায়ের "বুক ফেটে যায়" কেমন করে, পিসি কেমন করে "চোখের জলে ভাসে" ইত্যাদি ইত্যাদি। 'বহুরূপী'-র "গরুর বুদ্ধি" গল্পে পন্ডিতমশাই কলুর মুখে 'ঘানিগাছ' কথাটা শুনে আক্ষরিক অর্থেই ভাবলেন ওটা একটা সাধারণ গাছ, তাতে ঘানি নামে ফল জন্মায়। পরে কলুর ব্যাখ্যায় "তৈল-নিষ্পেষণ যন্ত্র" রূপে সেটিকে চিনতে পারলেন।[৩১]

আক্ষরিকতার আক্রমণ যখন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষাতে গিয়ে লাগে, তাতে যে কী মজা হয় তার প্রমাণ আছে 'ঝালাপালা'র পন্ডিতমশায়ের গলদ্‌ঘর্ম অনুবাদ প্রয়াসে।[৩২] ইংরেজি তিনি কিছুই জানেন না, ফলে "আই গো আপ ইউ গো ডাউন' কথাটির মধ্যে শুধু 'আই' শব্দটিকেই তিনি কষ্টে সৃষ্টে 'চক্ষু' বলে অনুবাদ করতে পারলেন। এখানে শব্দের ধ্বনিরূপটির দ্ব্যর্থকতা তাঁকে প্রতারিত করেছে। সে হোক, তবু এই অনুবাদে তাঁর দ্বি-ভাষিক (bilingual) সামর্থ্যের কিছুটা প্রমাণ রাখলেন তিনি। কিন্তু তারপর বাকি অংশটা বাংলা বা সংস্কৃত ভাষা বলে ধরে নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে — 'গো' হল 'গরু', 'আপ্‌' হল জল, 'ইউ' (তাঁর শ্রুতিতে 'উই' — নাকি 'উই'-ই ছিল আগে?) হল উইপোকা, আর 'গো ডাউন' এই দুটি কথার মধ্যবর্তী শব্দসন্ধি সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর মুখে একটি কথা দাঁড়াল — 'গোডাউন' অর্থাৎ বাংলায় গুদোমখানা। পন্ডিতমশায়ের এর পরের অনুবাদ-প্রয়াসে আক্ষরিকতাও নেই।

অন্যত্র দেখি, আক্ষরিক অর্থ ধরে নেওয়ার ফলেই 'বহুরূপী'র "ছাতার মালিক" গল্পের[৩৩] দেড় বিঘৎ মানুষেরা ব্যাঙের ছাতার উপর কেবল ব্যাঙদেরই অক্ষয় অধিকার শাব্যস্ত করেছিল। শেষে বহুরূপী জন্তুটি তাদের এই জ্ঞান দেয় — "যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতাও নয়. ব্যাঙেরও কিছু নয়। তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।"

খ. দুই শব্দের মধ্যবর্তী juncture বা সন্ধির লোপ করে দুটি শব্দকে এক শব্দের সংহতি দান —

'ঝালাপালা'-র পন্ডিত মশাই 'গো ডাউন'-কে যেমন 'গোডাউন' করেছেন, তেমনি উদাহরণ দেখি 'অবাক জলপান'[৩৪]-এর এই অংশে :

পথিক। মশাই, একটু *জল পাই* কোথায় বলতে পারেন।
ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন?

গ. দ্ব্যর্থকতার সুযোগ নিয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ না ধরে শ্রোতার নিজের অভিপ্রায়-সংগত অর্থ ধরা —

ওই 'অবাক জলপান'-এই এর দৃষ্টান্ত পাই :

পথিক। ...একটু জলেব খোঁজ কচ্ছিলুম —
বৃদ্ধ। বল কি হে? পুবগাঁও থেকে এখেনে এযেছ জলেব খোঁজ কবতে — হাঃ হাঃ হাঃ। তা যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না।

'আবোল তাবোল'-এর "শব্দকল্পদ্রুম" কবিতায় এই দ্ব্যর্থকতাকেই অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন সুকুমার। তিনি জানেন যে, ধ্বনিগতভাবে একটি শব্দ এক অর্থাৎ homophonous হলেও, তার একাধিক অর্থ থাকা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এই দ্ব্যর্থকতার অপনোদন (disambiguation) ঘটে প্রয়োগে, কোন্ প্রতিবেশ বা context-এ সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার দ্বারা। বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশে বিশেষ বিশেষ অর্থ গৃহীত হয়, অন্য অর্থ বাধিত বা suppressed হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন এবং এক প্রতিবেশে অভাবিত অর্থটিকে আড়াল না ক'রে, সেইটিকেই প্রতিবেশ-বিরোধী ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাতে যে বিপুল মজা তৈরি হয় তারই প্রমাণ দেখি এই কবিতায়। এখানে 'ফোটা', 'ছুটে যাওয়া' 'পড়া', 'কাটা', 'ভাঙা', 'ঘোরা', 'নাচা' 'বাজা', 'ফাটা', 'মারা' ইত্যাদি বাংলা ক্রিয়াপদের এক প্রতিবেশবদ্ধ অর্থকে অন্য প্রতিবেশে বসিয়েছেন সুকুমার। ফলে এ কবিতায় 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্' শব্দে ফুল *ফোটে,* ফুলের গন্ধ *ছুটে* যায় 'শাঁই শাঁই পন্ পন্' শব্দে, হিম *পড়ে* 'হুড়মুড় ধুপধাপ শব্দ করে, চাঁদ ঝপ্ ঝপ্ ঝপাস, গব্ গব গবাস্ শব্দে *ডুবে* যায়, রাত *কাটে* 'খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ শব্দে, ঘুম *ভাঙে* দুড় দাড় চুর মার করে। সুকুমার কী বিস্ময়কর কৌশলে চোখ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভবকে, এমন কী রাত কাটা, ঘুম ভাঙার মতো নিছক ধারণার বিবৃতিকে violent কানের বা শ্রুতির অনুভবে রূপান্তরিত করেছেন তা লক্ষণীয়। এখানে তাঁর প্রধান অস্ত্র বাংলা শব্দের দ্ব্যর্থকতা, তারই দোহনের ফলে এই বিপুল রসের উল্লাস তৈরি হয়েছে।

ঘ. শব্দের অর্থকে না ধরে কেবল তার ধ্বনিশরীরকে বিষয় বলে ধরে নেওয়া —
এরও উদাহরণ পাই 'অবাক জলপান'-এ—

পথিক। ...মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?
ছোকবা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবাব মিলবে? দাঁড়ান, এক্ষুনি মিলিযে দিচ্ছি — জল চল, তল বল ফল — মিলেব অভাব কি? কাজল-সজল উজ্জ্বল — জ্বলজ্বল —

বস্তুতপক্ষে 'অবাক জলপান'[৩৫]-এর নামকরণ থেকে আরম্ভ করে সর্বত্রই ভাষাগত দ্ব্যর্থকতাকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন সুকুমার। উপরের উদ্ধৃতিতে 'মিলবে' কথাটির দ্ব্যর্থকতা ছোকরা ও পথিকের সংলাপকে আরো বেশি আকর্ষক করে তুলেছে।

ঙ. বিচিত্র প্রয়োগ ও প্রতিবেশ দেখিয়ে ভাষায় শব্দের দ্ব্যর্থকতা ও বহুর্থকতার অজস্র সম্ভাবনা আবিষ্কার —

এটিকে আমরা আবিষ্কারের মজা নাম দিতে পারি। "খাই খাই"-এর "খাই খাই" কবিতাতেই এটি বেশি করে — প্রায় সর্বাঙ্গীণ একটি তালিকার রূপ পেয়েছে, "পাকাপাকি" কবিতাতেও এর নিদর্শন পাই। 'খাওয়া' ক্রিয়াপদের কত বিচিত্র প্রয়োগ, "যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে" তার মস্ত লিষ্টি করেছেন সুকুমার চতুর্মাত্রিক সরল কলাবৃত্তে — বিড়ি খাওয়া, জল

খাওয়া, কলা খাওয়া, সুদ খাওয়া, হাওয়া খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, খাপ খাওয়া, মিশ খাওয়া, পাক খাওয়া, খাবি খাওয়া, বেত খাওয়া, গালি খাওয়া, নুন খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া ইত্যাদি — এমন-কী 'কচু পোড়া খাওয়া' 'ঘন্টা খাওয়া' পর্যন্ত। "পাকাপাকি" কবিতায় 'পাকা' ক্রিয়াপদের বিচিত্র প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ঠিক তার পূর্ববর্তী "দাঁড়ের কবিতা"য় কাক ব্যাকরণ অনুশীলনের এক অতিশয় সূক্ষ্ম নিপুণতা দেখিয়ে কাঁকড়ার সঙ্গে নিজের, হয়তো দাঁড়ি মাঝির সঙ্গেও নিজের আত্মীয়তা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। কাঁকড়ার দাঁড়া আছে বলে সে 'দাঁড়ি', দাঁড়ি মাঝিও 'দাঁড়ি', আর 'দাঁড়কাক' নিজে দাঁড়ে বসেছে — কাজেই সেও 'দাঁড়ি'। এ ধরণের কবিতা এক ধরণের মনোজ্ঞ ব্যাকরণ-পাঠ। সুকুমার এতে-যে শুধু শব্দের প্রয়োগ-প্রতিবেশ অনুযায়ী তার অর্থের বিভিন্নতা ও মাত্রাভেদ দেখিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, কোথাও কোথাও লক্ষ করেছেন যে, শব্দটির ধ্বনিগত উপস্থিতি তার সবাঙ্গীণ বা ন্যূনতম অর্থগত উপস্থিতির সূচক নয়, যেমন 'খাই খাই'-এ "ফলাহার" কথাটির অর্থে ফলের উপস্থিতি জরুরি নয়, আবার "জল খাওয়া" বলতে শুধু জল খাওয়াই বোঝায় না। 'হ-য-ব-র-ল'-র "মিশিপাখা শিখিপাখা" গানের যে-সমালোচনা হয়, তাতে শাব্যস্ত হয় যে "গানটা ভারি শক্ত"। কিন্তু ব্যাকরণ (ব্যা+করণ, এবং ব্য=B.A.) শিং বি এ সমালোচনার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সংযোগ করে বলে, "শক্ত আবার কোথায়? ঐ শিশিবোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তাছাড়া তো কিছু শক্ত পেলাম না!" শ্রীমান ব্যাকরণ শিং শিশিবোতল শব্দটির অর্থকেও ধরেনি, ধরেছে অর্থের যে-অন্তিম reference, সেই বস্তুটিকে। সকলেই জানেন যে, ভাষায় শব্দের অর্থের তিনটি দিক আছে। তার দুটি ভাষাগত, একটি ভাষাবহির্ভূত। ভাষাগত অংশদুটি হল শব্দের ধ্বনিগত শরীর আর তার অর্থ। এ অর্থটি হল একটি ধারণা বা concept। আর অর্থটি নির্দেশ করে পৃথিবীর বাস্তব কোনো বস্তু বা ধারণাকে, যার সঙ্গে ভাষার কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্ক arbitrary — তা আমরা আগেই জানিয়েছি। কিন্তু ব্যাকরণ শিং এই আপতিক সম্বন্ধটিকে ভুলে গিয়ে শব্দটিকে বস্তু বলে ভুল করেছে। খাওয়ার চেষ্টা করলে শিশিবোতল শক্ত লাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাষার শব্দ বা ওঅর্ড হিসেবে 'শিশিবোতল' শক্ত কি না — তার বিচার অন্যরকম।

চ. স্পষ্ট অর্থহীন ভারী ভারী শব্দ প্রয়োগ করে হাস্যরস সৃষ্টি —

এ বিষয়ে আমরা আগে কিছুটা আলোচনা করেছি। 'ঝালাপালা'-র পন্ডিত প্রায়ই বিকট সব উদ্ধৃতি দেয়। 'হ-য-ব-র-ল'-র কাক হিসেবের আগে বাঁধা বয়ান শেখে। এতে শব্দের অর্থগত মজা ছাড়াও পাশের অন্য শব্দের সঙ্গে contrast বা অসংগতিতে একটা অন্য মজা তৈরি হয়, পন্ডিতের উদ্ধৃতিতে খানিকটা malapropism-এর মজার মতো। সুকুমার "ভাষার অত্যাচার" নিবন্ধে gobbledygook অর্থাৎ প্রায়-নিরর্থক ভারী ভারী শব্দ প্রয়োগের (ও তার জটিল বিন্যাসের) শক্তির কথা ইঙ্গিতে বলেছিলেন, তাঁর নিজের রচনাতেও তার সার্থক নিক্ষেপে সরসতা তৈরি হয়েছে প্রচুর জায়গায়।

৫

ফলে "খ্যাপার গানে নাইকো মানে নাইকো সুর" বলে 'আবোল তাবোল'-এর পাঠকদের সতর্ক করলেও মানে বা অর্থ নিয়ে সুকুমার বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং শব্দের অর্থের বৈচিত্র্য বা

polysemy-কে তিনি বহুভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর খেলা ও খেয়ালের রস তৈরি করার জন্য। তাঁর অভিজ্ঞতায় ও সৃষ্টিতে লোকেরা শব্দের ধ্বনি-সংগঠনের অর্থ বার করে ফেলে, শ্রীখন্ডদেব শুধু নন, সাধারণেরাও সদ্যোজাত খুড়োর মুখে 'মামা গাগা'-র বদলে 'গুংগা' শুনে ভেবে নেয় — "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে, বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।" সুকুমার শব্দ ও অর্থের এই বিচিত্র সম্পর্ককে খানিকটা খেলার ছলে আবিষ্কার করতে যান, এবং এই খেলাটাই তাঁর আত্মোৎসর্গময় কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষটি ব্যাকরণে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন — তার প্রমাণ তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত ছাত্ররা প্রায়ই সংস্কৃত পড়ে বা পরীক্ষা দেয়। "পরিবেষণ" কবিতার ('খাই খাই') আরম্ভই করেন "পরি" পূর্বক 'বিষ্' ধাতু, তাহে 'অনট্' বসে" বলে[৩৭], 'হ-য-ব-র-ল'-তে সাদৃশ্য বা analogy-র সূত্র ধরে ন্যাড়া বলে 'মজারু' ব্যাকরণ সিদ্ধ প্রয়োগ — "সজারু ক্যাঙারু দেবদারু হতে পারে" যখন। অভিধান, শব্দকোষ শব্দকল্পদ্রুম ইত্যাদির উল্লেখ প্রচুর জায়গাতেই ঘটেছে। ছাগলছানার নাম যেভাবে 'ব্যাকরণ শিং' হয়ে যায় তাতে ব্যাকরণে তাঁর বিশেষ অধিকার অবশ্যই প্রমাণিত হয়।

বর্ণমালাকে অনুসরণ করে সুকুমার 'চ' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণকে ধরে ধরে একটি কবিতা লিখেছিলেন, মধ্যযুগীয় বাংলা (ও সংস্কৃত) সাহিত্যের 'চৌতিশা'-র ধরণে "বর্ণমালাতত্ত্ব" নামে যে-কবিতা লিখেছিলেন[৩৮] রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য অন্যত্র[৩৯] তার সুন্দর আলোচনা করেছেন। এতে সুকুমারের সেই ভাষা-ক্রীড়ার অদম্য উল্লাসকেই মূর্ত হতে দেখি। 'খেয়ালখাতা'য় তিনি বাংলা লিপির ক্ষেত্রেও কিছু নতুন অক্ষরচিহ্ন উদ্‌ভাবনের পরিকল্পনা করেছিলেন, বিশেষত ব্যঞ্জন + স্বর ও যুক্তব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে — কিন্তু সেগুলির কোনো সংহত সুশৃঙ্খল রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। বলতে পারি, তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয় ছিল শব্দ ও শব্দার্থের নানা সম্বন্ধ। ভাষার ধ্বনির উপর তাঁর অসামান্য দখলই অর্থের বিষয়ে তাঁকে আগ্রহী করে তোলে। দুয়ে মিলে তাঁর প্রতিভা যে-বিশিষ্টতা পেয়েছে তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১) "বাংলা ভাষা পরিচয়" (১৯৩৮)-এর ভূমিকা। দ্রঃ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, ১৯৬১, ১৪শ খন্ড, ৪৩৭ পৃ।

২) 'সমগ্র শিশুসাহিত্য' (এর পরে 'স-শি'), সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৬৬ পৃ।

৩) তদেব, ১৬৭-৮ পৃ

৪) তদেব, ১৫০ পৃ

৫) তদেব, ১৫২ পৃ

৬) তদেব, ১৬৮ পৃ

৭) তদেব, ৮৯ পৃ

৮) লিউইস ক্যারল-এর Through the Looking glass-এর 'হাম্‌টি ডাম্‌টি' অধ্যায়ের "Jabberwocky" কবিতার brilling, slithy, mimsy ইত্যাদি কথাগুলি প্রসিদ্ধভাবেই স্মরণীয়; ক্যারল "Looking-Glass Insects" অধ্যায়ে

Horse-fly থেকে Rocking-horse-fly-ও করেছেন, Dragon-fly, Snap-Dragon-fly-ও বানিয়েছেন। বানিয়েছেন Bread-and-butter-fly। কিন্তু এটা যেভাবে করেছেন তিনি, সুকুমারের 'হাতিমি' তা থেকে আলাদা। ক্যারল শব্দের অনুষঙ্গ থেকে করেছেন নতুন সৃষ্টি, সুকুমার দুটি পৃথক শব্দ একসঙ্গে জুড়ে 'কলম' করে (দুটি এক ধরণের সিলেব্‌লের একটি রেখে — 'হাতি-তিমি' থেকে 'হাতিমি' করে) প্রাণীটিকে শাব্দিক রূপ দিয়েছেন।

৯) সুবীর রায়চৌধুরী তাঁর "সুকুমার রায় ও বাংলা ভাষা" ('বারোমাস' নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৯৪) প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১০) Saussure, Ferdinand de, (1915) 1959, *Course in General Linguistics*, New York etc , McGrew-Hill Book Company, p-67.

১১) 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', ১৩৬৩, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৯ পৃঃ (পরে শুধু 'বর্ণমালাতত্ত্ব')

১২) তদেব।

১৩) তদেব, ২৮ পৃ

১৪) 'স-শি', ৮৮ পৃ

১৫) তদেব, ৯১ পৃ

১৬) তদেব।

১৭) তদেব, ৯২ পৃ

১৮) 'বর্ণমালাতত্ত্ব', ২০ পৃ

১৯) 'স-শি', ৯৪ পৃ

২০) তদেব, ৯০ পৃ

২১) তদেব, ৯৩ পৃ

২২) দ্রঃ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৫ম খন্ড, ৯৫ পৃ

২৩) Murdoch, Iiris, 1953, *Sarte*, Yale University Press, p.27

২৪) এই লেখকের, "ঝাপসা কাচ ঃ আধুনিক নাটকের সংলাপ" (দ্র ঃ সমর নন্দী সম্পা 'শিল্প ও সংস্কৃতি', শারদ সংখ্যা, ১৯৮১, ২৮৩-৭ পৃ) নিবন্ধটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৫) 'বর্ণমালাতত্ত্ব', ২২ পৃ

২৬) 'স-শি', ৩৬ পৃ

২৭) তদেব, ২৯ পৃ

২৮) 'বর্ণমালাতত্ত্ব', ২৪ পৃ

২৯) 'স-শি', ১৭ পৃ

৩০) তদেব, ২৪ পৃ

৩১) তদেব, ৪৮ পৃ

৩২) তদেব, ৭৩ পৃ

৩৩) তদেব, ৪৮-৯ পৃ

৩৪) তদেব, ৮২ পৃ

৩৫) 'অবাক জলপান' কলকাতায় ফিরিওয়ালাদের ফেরি-করা একরকম খাবার, ডালমুট ইত্যাদি যার প্রধান উপাদান। 'জল' পানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিছুদিন আগেও গলিতে গলিতে 'অবাক জলপান' ডাক শোনা যেত।

৩৬) 'স-শি', ৩১ পৃ

৩৭) তদেব, ১২ পৃ

৩৮) 'বর্ণমালাতত্ত্ব', ৯-১৩ পৃ

৩৯) বর্তমান লেখক সম্পাদিত 'সুকুমার রায় শতবার্ষিক নিবন্ধ সংকলন'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিতব্য।

সুকুমার সাহিত্যে বিজ্ঞান

বিমান বসু

সুকুমার রায়ের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'সূক্ষ্ম হিসাব' 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় সেই ছিল শুরু। তারপর ১৯২৩ সালে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর প্রায় একশ'টি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও কারিগরী আবিষ্কার ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে লেখা তাঁর ঐ সব রচনায় তাঁর সাবলীল ও মৌলিক ভঙ্গির যে উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় তা আজকেও খুবই কম বিজ্ঞান লেখকের রচনায় দেখা যায়।

সুকুমার রায়ের বিজ্ঞান রচনায় পারদর্শিতার পেছনে যে তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। উপেন্দ্রকিশোর নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ছোটদের জন্য অজস্র লিখেছেন। 'মুকুল' পত্রিকায় 'সেকালের কথা' নামে প্রাচীনকালের জীবজন্তু ইত্যাদি নিয়ে তাঁর অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আকাশের কথা' শিরোনামে তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা, এবং 'বাণ ডাকা', 'দুরবীন' প্রভৃতি সুন্দর প্রবন্ধ।

উপেন্দ্রকিশোর ছাড়াও সে সময় জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চারের জন্য নিয়মিত বিজ্ঞান নিয়ে লেখা শুরু করেছেন। জগদানন্দ রায় বিশেষ করে ছোটদের জন্য লিখেছেন গ্রহ-নক্ষত্র (১৯১৫), পোকামাকড় (১৯১৯), বিজ্ঞানের গল্প (১৯২০), গাছপালা (১৯২১), বাংলার পাখী (১৯২৪), নক্ষত্রচেনা (১৯৩১) ইত্যাদি অসংখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক বই। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান রচনা সংকলন 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। বলা যেতে পারে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে, যে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সুকুমার রায় তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। কিন্তু তবুও, সেকালের অন্য বিজ্ঞান লেখক ও সুকুমার রায়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েই গেছে। তা হলো সুকুমার রায়ের বহুমুখী প্রতিভা। তিনি ছোটদের জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান লেখকই নন, বরং একজন আদর্শ শিশু সাহিত্যিক ও শিল্পী ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান রচনায় সেজন্য শিশু মনের উপযোগী উপমা ও উদাহরণের প্রাচুর্যই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁর রচনায় যে জিনিষটা সহজেই চোখে পড়ে তা হল তাঁর রচনা ভঙ্গীর বৈচিত্র। সাধারণ বিবরণমূলক রচনা ছাড়াও তিনি লিখেছেন স্বচ্ছ, সরল ভাষায় নানা রকম হিসেবের কাহিনী, আত্মজীবনীর ধারায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক কাল্পনিক কাহিনী। সাধারণ রচনা ছাড়া বহু বিজ্ঞানীর জীবনীও লিখেছেন তিনি ছোটদের উপযোগী করে।

সুকুমার রায়ের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'সূক্ষ্ম হিসাব'-এই তাঁর লেখার মৌলিক ভঙ্গী চোখে পড়ে। তিনি লিখেছেন :

খুব তাড়াতাড়ি 'কাট্' বলিতে চেষ্টা করত। কতক্ষণ সময় লাগে ? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কথাটা শেষ হইতে প্রায় এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। একটা দ্রুত চলন্ত ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ ছয় হাত চলিযা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানিক হিসাবীব কাছে সময়েব এ হিসাবটা খুবই মোটা। ট্রেনটা একচুল পরিমাণ নড়িতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধানও রাখিয়া থাকেন। এইখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বালিয়া দেখ, আলোক ছুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ লোকে দেখিবে 'এই আলো জ্বলিল'। 'তৎক্ষণাৎ' বলিলাম, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিবেন "তৎক্ষণাৎ নয়, একটু পরে। ওই অনেক দূরে যারা রয়েছেন তাদেব কাছে আলো পৌঁছিতে কিছু সময় চাই ত।" যদি জিজ্ঞাসা কর "কতখানি সময় লাগে" তিনি বলবেন "ট্রেনটা যতক্ষণে এক ইঞ্চি যাবে, আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে মধুপুরে হাজির হবে।

আলোর গতিবেগের এত সরল হিসেব বোধহয় এর আগে কোনও লেখকের রচনায় দেখতে পাওয়া যায় নি।

'বেগের কথা' (১৯১৮) লেখাটিতেও একই ধরণের উপমা ব্যবহার করেছেন তিনি :

তাল গাছেব উপর হইতে ভাদ্রমাসেব তাল যদি ধুপ্ করিযা পিঠে পডে তবে তাব আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়, কিন্তু ঐ তালটাই যদি তালগাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেযাবাগাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠেব ওপব পডিত, তাহা হইলে এতটা চোট লাগিত না। কেন লাগিত না ? কাবণ, বেগ কম হইত। কোন জিনিস যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তাব বেগ বাড়িয়া চলে। ...

বন্দুকের গুলি জিনিসটা আসলে খুব মাবাত্মক নয; হাতে ছুঁড়িযা মাবিলে তাহাতে চোট্ লাগিতে পাবে, কিন্তু সে চোট খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিস যখন বন্দুকের ভিতব হইতে বাকদেব ধাক্কায় প্রচন্ডবেগে ছুটিযা বাহিব হয় তখন আস্ত মানুষটাকে এপাব-ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার বোখ থামিতে চায না।

পদার্থবিজ্ঞানের কোনও জটিল তত্ত্ব নেই, অথচ কত সোজা ব্যাখ্যা !

সুকুমার রায়ের সহজ হিসেবের আরও একটি অভিনব উদাহরণ পাওযা যায় সন্দেশ পত্রিকার তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লেখা 'সন্দেশের হিসাব' রচনায়। ঐ রচনায় তিনি তিন বছরে সন্দেশের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা, ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ, কাগজের মোট ক্ষেত্রফল, অক্ষরের সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে কিছু মজাদার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছেন। যেমন, তিন বছরে প্রকাশিত ছত্রিশটি সংখ্যায়, প্রতি সংখ্যা তিন হাজার কপি হিসেবে মুদ্রিত কপির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ আট হাজার। প্রতি সংখ্যায় ৩২ পাতা হিসেবে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা হয় চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার। ছাপা কাগজগুলো একসঙ্গে ওজন করলে মোট প্রায় ২১৫ মণ হতো,

অর্থাৎ তোমাদের প্রায় দু'শ জনেব সমান। সন্দেশগুলি যদি একটাব উপর একটা উঁচু থাক করে সাজান যেত তবে প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ হ'ত — কলকাতাব মনুমেন্টেব চারগুণ। যদি উপরে উপবে না বেখে লম্বালম্বি সার বেঁধে বসাতে তবে সে সার কলকাতা থেকে ব্যাবাকপুর অর্থাৎ প্রায় ১৭-মাইল লম্বা হ'ত।

যদি প্রত্যেকটি পাতা আলগা ক'রে ঐ রকম পব পর বসান যেত, তা দিয়ে এখান থেকে প্রায় নেপাল বা বর্মা পর্যন্ত লম্বা লাইন পাতা যেত।

এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ পৃষ্ঠায় যত অক্ষর আছে সব যদি এই লাইনে সাব দিয়ে গাঁথা যেত, তাহলে লাইন ধবে স্বচ্ছন্দে বিলাত চ'লে যেতে পারতে।

এতগুলি ছেঁড়া পাতা জুড়ে যদি চাঁদোয়া তৈরী করা যেত, তবে সেই চাঁদোয়াব নীচে অন্তত আড়াই লক্ষ লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

'শরীরের মালমশলা'য় (১৯১৯) পাওয়া যায় আর এক হিসেব। জানতে পারা যায় যে দু'মন ওজনের একজন সাধারণ মানুষের শরীরের চর্বি দিয়ে এক পোয়া ওজনের গোটা ত্রিশেক মোমবাতি এবং তার হাড়ে সঞ্চিত ফসফোরাস দিয়ে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা তৈরী হ'তে পারে।

'বায়োস্কোপ' (১৯২০) রচনায় Time lapse photography'র সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তিনি :

এমন কলও তৈরী হয়েছে যাতে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ হাজার ফটো তোলা যায়। এইরকম তাড়াতাড়ি ফটো তুলে তারপব যদি দেখাবার সময় বেশ ধীরে ধীরে সাধারণ বায়োস্কোপেব ছবিব মতো দেখান হয় তাহলে দ্রুত ঘটনাব ছবিও বেশ স্পষ্ট কবে সহজভাবে দেখবাব সুবিধা হয়।....

যে ব্যাপাবটা ঘটতে অনেক সময লাগে তাকেও বায়োস্কোপেব ছবিতে খুব অল্প সমযেব মধ্যে চট্‌পট্‌ ঘটিয়ে দেখান যায়। ফুল গাছের টবে সবেমাত্রা অঙ্কুব গজাচ্ছে, সেই অঙ্কুব থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তারপব ফুল ফুটবে — বসে বসে দেখতে গেলে কতদিন সময় লাগে। বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে — আব দেখবার সময চটপট দেখিযে যাও — তাহলে দেখবে যেন চোখেব সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিযে বেড়ে উঠছে আব ফুল ফুটছে!

লেখক নিজে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার ছিলেন বলেই এত সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে ছোটদের বোধগম্য করে একটা জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন।

'কয়লার কথা'য় (১৯১৭) আবার একেবারে আলাদা ভঙ্গি চোখে পড়ে। আত্মজীবনীর ধারায় লেখা রচনাটিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ থেকে কয়লার উৎপত্তি এবং আধুনিক যুগে তার আহরণ ও ব্যবহারের অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন তিনি যা সহজেই যে কোনও বয়সের পাঠককে আকৃষ্ট করে।

বিশাল বিশাল গাছের ডাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মাটির তলায় পচতে পচতে চাপে আর গরমে পাথর হয়ে জমে ওঠার পর খনি থেকে বেরিয়ে আসা কয়লার অভিজ্ঞতার প্রাণবন্ত বিবরণ পাওয়া যায় ঐ রচনায় :

তাবপব বাইবে এসে দেখলাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই। সেসব গাছপালা নাই, সে সব জীবজন্তু নাই — যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দু-পেয়ে জন্তুব আশ্চর্য সব কান্ডকারখানা। তুমি ছোক্‌রা বড় যে আমায় তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতিব কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিযে তোমাব ঘবেব আগুন জ্বলে. আমাব গুণেই রেল চলে, স্টিমার চলে, কলকাবখানা সবই চলে।....

"শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয়, প্রতি বছব কত হাজাব মণ গাছেব সার তৈবি হয় তোমরা কি তাব খবর বাখ? তাবপর ঐ যে আলকাতরাব মতো চট্‌চটে কালো নোংবা জিনিস, যাকে তেল-কয়লা বললাম — তা থেকে বাসায়নিক পন্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য জিনিস বানিযেছেন তাদেব নাম কবতে গেলেও প্রকান্ড পুঁথি হয়ে যায়! ....এ সবই সম্ভব হচ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমবা ত আমায় খাতির করবে না — কাবণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো বাস্তাব কয়লা।

'শনির দেশে' (১৯১৯) রচনাটিতে দেখতে পাওয়া যায় সুকুমার রায়ের লেখার আরও এক অভিনব ভঙ্গি। পৃথিবী থেকে শনি পর্যন্ত এক কাল্পনিক মহাকাশ যাত্রার ধারাবিবরণির স্টাইলে লেখা রচনাটিতে সৌরমন্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের বিষয় বহু তথ্য নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করেছেন তিনি। শনির বলয়ের ছবিটি পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন তিনি পাঠকের সামনে :

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক — ছোট ছোট ঢিপির মতো, পাথরেব ডেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো লক্ষ

লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্ত মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

আধুনিক কালে গ্রহযান থেকে পাঠানো শনির বলয়ের ছবিতেও ঐ একই চেহারা চোখে পড়ে।

সুকুমার রায়ের কিছু রচনায় তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে লেখা 'কাঠের কথা'য় তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম ব্যাপক হারে গাছ কাটার কুফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

প্রতি বৎসর এত কোটি মণ কাঠ মানুষ খরচ করে এবং তার জন্য এত অসংখ্য গাছ কাটতে হয় যে অনেকে আশঙ্কা করেন, হয়ত বেহিসাবী যথেচ্ছ গাছ কাটতে কাটতে কোন্ দিন পৃথিবীতে কাঠের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। এরকম যে সত্যি সত্যিই হতে পারে, তার প্রমাণ নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে।

আজ বাস্তবিকই ব্যাপক বনহীনতা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯২০ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী গডার্ড যখন প্রথম বহুস্তর বিশিষ্ট রকেটের সফল পরীক্ষণ করেন ঠিক তারপরেই সুকুমার রায় তাঁর 'চাঁদমারি' প্রবন্ধে ঐ ধরণের রকেটে চেপে চাঁদে পাড়ি দেবার কথা লিখেছিলেন :

আজকাল শুনতে পাই, কামানের গোলাব চাইতে চাঁদে হাউই ছুঁড়ে মাবা নাকি অনেক বেশি সহজ। আমেবিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক গডার্ড সাহেব একরকম আশ্চর্য নূতন ধবণেব হাউই বানিযেছেন। তার ভিতবে এমন অদ্ভুত কৌশলে বারুদ পোরা থাকে যে সে বাকদ একেবাবে সমস্তটা ফাটে না — থেকে থেকে একবার বাকদ ফুটে ওঠে আব তাব ধাক্কায় হাউই ক্রমাগত এগিয়ে চলে। প্রথম ধাক্কাতেই হাউই অনেক দূব পর্যন্ত যায, তারপব যেই তেজ কমে আসতে থাকে, অমনি আবার দ্বিতীয় ধাক্কা এসে লাগে। সেটাব বেগ কমতে না কমতেই আবাব তৃতীয ধাক্কা। এমনি কবে নিজের ভিতরকার বারুদেব কাছে বারবাব ধাক্কা খেয়ে সে হাউই অসম্ভব উঁচুতে উঠে যায।...

"আরও অনেকখানি বড় করে যদি চাঁদমাবি হাউই বানান যায়, আব তার মধ্যে দু'চাব জন মানুষ থাকবাব মতো ঘবেব ব্যবস্থা কবা যায, তাহলে মানুষও চাঁদে বেডাতে যেতে পাববেনা কেন?.... হয়তো তোমবা সব বুড়ো হবাব আগেই শুনতে পাবে যে চাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবাব জন্য রওনা হযেছে। তারা যদি গিয়ে ফিবে আসতে পারে, তাহলে কত যে আশ্চর্য অদ্ভুত কাহিনী তাদেব কাছে শুনতে পাবে তা এখন কল্পনা কবাও কঠিন।

১৯৬৯ সালের একুশে জুলাই চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীকেই বাস্তবায়িত করেছে।

ভারতে ১৯২৭ সালে প্রথম নিয়মিত ভাবে বেতার প্রচার শুরু হবার পাঁচ বছর আগে সুকুমাব রায়ের 'আকাশবাণীর কল' প্রকাশিত হয়। ঐ রচনায় বেতার প্রচার ও গ্রাহক যন্ত্রের জটিল কার্যবিধির সরল ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, যদিও তাতে 'রেডিও'র পরিবর্তে বরাবর তিনি 'টেলিফোন' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন :

বাতাসে যেমন সর্বদাই ঢেউ খেলছে, আকাশেও তেমনি আলোর তরঙ্গ, বিদ্যুতের তরঙ্গ সর্বদাই খেলে বেডাচ্ছে। স্টেশনের কলগুলির কাজ হচ্ছে সমস্ত কথা ও সুরগুলিকে ধরে তা থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে আকাশময় ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যুতের ঢেউগুলি শব্দের বাহন হয়ে চাবিদিকে হাজাব হাজাব মাইল ছড়িয়ে পডে। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, কারণ সে আর বাতাসেব ঢেউ নয়, সে এখন বিদ্যুতের তরঙ্গ। সেই বিদ্যুতের তবঙ্গ যখন তোমাব বাড়িতে তোমার টেলিফোনের যন্ত্রে এসে আঘাত কবে তখন সে আবাব শব্দের ঢেউ হযে তোমার কানের ভিতবে কথা ও সুরেব সৃষ্টি কবে। স্টেশনের যন্ত্রের সামনে যে কথা ও যেমন সুর শোনান হয ঠিক সেই কথা তেমনি সুবে অতি পবিষ্কার ভাবে তুমি ঘরে বসেই শুনতে পাববে।

অনেকগুলো স্টেশন মিলে যখন একসঙ্গে আকাশে ঢেউ ছড়াতে থাকে তখন অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলাব মতো একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে; সেইজন্য স্টেশনওযালারা নিজেদেব মধ্যে একরকম বন্দোবস্ত কবে

নিয়েছে যে এক-এক স্টেশন থেকে খালি এক-একরকম ঢেউ ছাড়া হবে। আকাশে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে তাকে স্টেশনওয়ালাদের ইচ্ছেমত ছোট বা বড় করা যায়। যেমন একটা স্টেশন থেকে যদি একশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়া হয় তাহলে তার পাশের স্টেশন থেকে নব্বুই হাত কি একশ দশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়তে পারে, কিন্তু একশ হাত ঢেউ ছাড়বার হুকুম তাদের নেই। শ্রোতারা যে টেলিফোনের কল ব্যবহার করে তাতে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সে কল খালি একরকম বিদ্যুতের ঢেউয়েতেই সাড়া দেবে। বেহালার কানে মোচড় দিয়ে যেমন তারের সুর অনেকটা নামান বা চড়ান যায় তেমনি টেলিফোনের শব্দ ধরবার যন্ত্রটিকেও নানারকম ঢেউয়ের তালে চড়িয়ে বা নামিয়ে বাঁধা যায়। এমনি করে "যে গান কানে শোনা যায় না", যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই সশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে।

টিউবরেল বিষয় নিয়ে লেখা 'ভুঁইফোঁড়' (১৯২০) রচনায় তিনি লিখেছিলেন :

কথা হচ্ছে, কলকাতায় এইরকম ভুঁইফোঁড় সুড়ঙ্গের রেল বসান হবে। তা যদি হয়, তখন আর বর্ণনা দেবার দরকার হবে না, টিকেট কিনে চড়ে দেখলেই পারবে — আর মনে করবে, এ আর একটা আশ্চর্য কি ?

সত্যিই ত, আজ কলকাতার মেট্রো চড়ে, ক'টা লোকই বা অবাক হয়।

সুকুমার রায়ের বিজ্ঞানী মনে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কোনও স্থান ছিল না। তাঁর কিছু রচনায় তাঁর এই মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষে বা সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীতে প্রলয়কান্ড ঘটার অলীক ভীতির প্রতি কটাক্ষ করে তিনি ১৯১৭ সালে 'প্রলয়ের ভয়' লিখেছিলেন। ঐ রচনায় তিনি প্রচলিত ধারণা ভেঙে বৈজ্ঞানিক মতটাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন :

অপরিচিত জিনিস দেখলেই মানুষের মনে ভয় বিস্ময় বা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জিনিস সর্বদাই দেখতে পাই তাতে মন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে সেটাতে আর কোনও রকম আশ্চর্যবোধ হয় না। মনে কর, এই সূর্য যদি প্রতি দিন না উঠে হঠাৎ এক-একদিন ঐরকম ভয়ানক আগুনের মত মূর্তি নিয়ে হাজির হতো, তাহলে অধিকাংশ লোকেই যে একটা প্রলয়কান্ড হবে মনে করে ভয়ে অস্থির হতো তা বুঝতেই পার। চাঁদকেও যদি দু-দশ বছরে ক্বচিৎ এক-আধবার দেখা যেত তবে লোকে না জানি কত আগ্রহ করে কত আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখত, আর না জানি সেটা আমাদের চোখে কি সুন্দর লাগতো। ধূমকেতুগুলো যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না এসে ঐ চন্দ্র সূর্যেরই মতো নিতান্ত সাধারণ জিনিস হত, তবে তাদের ঐ ঝাপসা ঝাঁটার মতো চেহারা দেখে ভয় পাবার কোনই কারণ থাকত না। কিন্তু তারা কিনা হঠাৎ কেমন করে খবর না দিয়ে আসে যায়, মানুষের কাছে তাই তাদের এত খাতির।

আর-একটি ভয়ানক জমকালো ব্যাপারের কথা না বললে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায় — সেটি হচ্ছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিসটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনও ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটি পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকান্ড কালো ছায়া দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাহাড় নদী সব গ্রাস করে ছুটে আসতে থাকে — যখন বনের পশু আর আকাশের পাখি পর্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হয়ে থাকে কেউ চিৎকার করে আর্তনাদ করে তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? বিশেষত যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য, যাদের কাছে সূর্যের এই হঠাৎ-নিভে-যাওয়ার কোনই অর্থ নেই, তারা যে তখন পাগলের মত অস্থির হয়ে বেড়াবে, এ ত খুবই স্বাভাবিক।

প্রায় একই সময় প্রকাশিত 'আষাড়ে জ্যোতিষ' নিবন্ধের সারমর্ম ঐ একই : "মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলায় না কল্পনা সেখানে অভাব পুরাইয়া লয়।"

খাঁটি বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা ছাড়াও সুকুমার রায়ের কয়েকটি এমন রচনা আছে যেগুলিকে অনায়াসে কল্পবিজ্ঞান শ্রেণীতে ধরা চলে। তাঁর 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী' ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রচনা। অনেকটা আর্থার কনান ডয়েলের 'দি লস্ট ওয়ার্লড্' উপন্যাসের অনুকরণে লেখা

রচনাটিতে সুকুমার রায়ের উর্ব্বর কল্পনাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর আঁকা ছবিগুলি যা তাঁর 'হ্যাংলাথেরিয়াম', 'গোমরাথেরিয়াম', 'ল্যাংড়াথেরিয়াম', 'বেচারাথেরিয়াম' ও 'চিল্লানোসোরাস' কে যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

সুকুমার রায় ছিলেন একজন শিশু সাহিত্যিক। তাঁর বেশীর ভাগ রচনাই গল্প কাহিনী, ছড়া ও কৌতুক নাটক শ্রেণীর, যা সেসময়কার বাংলা শিশুসাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সে তুলনায় তাঁর বিজ্ঞান-রচনার সংখ্যা খুবই কম, এবং তাঁর অন্য রচনাগুলির মত সেগুলি সমাদর পায়নি। তবুও, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার যে জোয়ার এসেছিল তাতে সুকুমার রায়ের অবদান যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই।



সুকুমার রায় ও তরুণ ব্রাহ্মসমাজ

স্বপন মজুমদার

ছেলেবেলার সুকুমার রায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী লক্ষ করেছিলেন, "ছোটবেলা থেকেই দাদা যেমন আমাদের খেলাধূলা সব কিছুরই পান্ডা ছিল, তেমনি বন্ধুবান্ধব আর সহপাঠিদের মধ্যেও সে সর্দার হল। সর্দারি করা মোটেই তার স্বভাব ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যার জন্য সকলেই তাকে বেশ মানত। দলের সকলে নিজে থেকেই যেন তাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। বড়রাও তার কথার বেশ মূল্য দিতেন।"[১]

১৯০১ সালের মাঘোৎসবে, তখন এলাহাবাদ-প্রবাসী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায়ও সুকুমারের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সুহৃৎ কেদারনাথ লিখেছেন, "উৎসবের শেষের দিকে, বালক-বালিকা সম্মিলনে গিয়ে দেখিলাম যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হলের বেঞ্চিগুলি শিশু ও কিশোরের দল পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। কোনও বেঞ্চিতে স্থান পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টায় অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে কয়েকটা বেঞ্চিতে একটু বড়ছেলের দল ছড়াইয়া বসিয়াছে এবং সেখানে অপরিচিত অন্য কাহাকেও স্থান দিতে তাহারা অনিচ্ছুক। আমি প্রবাসী ও কলিকাতায় অপরিচিত সুতরাং আমার স্থান হওয়া দায় হইয়া দাঁড়ালো। এমন সময় চোখে পড়িল যে একটা বেঞ্চিতে একজন নতুন আগন্তুককে বসাইবার জন্য খুব ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। বেঞ্চির এদিকের শেষে একটি হৃষ্টপুষ্ট তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলে এবং তাহার পাশের একজন অন্যদলের চার পাঁচ জনকে ঠেলিয়া তাহাদের দলের একজনকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে বড়রা আসিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় সুট পরা ভদ্রলোক — পরে জানিলাম তিনি প্রফেসর সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ — স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, "কি হচ্ছে তাতা, বোয়ার ওয়ার?"... হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি উত্তর দিল — ওরা একে বসবার জায়গা দেবে না বলে ঠেলাঠেলি করছে। তাহাতে প্রফেসর বলিলেন, "জোরে ঠেলা দিয়ে ওকে তোমাদের দুজনের মাঝখানে সট্ করে বসিয়ে নাও।" যেমন কথা তেমনি কাজ; নতুন ছেলে বসিল। পরে অবশ্য বড়দের চোখের নীচে আর ঠেলাঠেলি না হওয়ায় অনেকে স্থান পাইল এবং আমিও বসিলাম। পরে জানিলাম ঐ তাতারই নাম সুকুমার ...।"[২]

বাড়ির বাইরে তাঁর এই প্রথম পাওয়া স্মৃতিচিত্র যেন অমোঘভাবে ধরিয়ে দেয় সুকুমারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী ও ওতপ্রোত সম্পর্ক। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমার স্বাভাবিকভাবেই আশৈশব লালিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পরিমন্ডলের মধ্যে। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল সমাজপাড়ার পরিবেশে : ১৮৯৫ পর্যন্ত ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে, ১৯০৯ পর্যন্ত ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাসের গলিতে, ১৯১১-য় বিদেশ যাওয়ার আগে পর্যন্ত ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদার প্রাঙ্গণ। শান্তা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, "১০ই

মাঘ উপাসনা শেষ হবার পর হত ১১-এর জন্য মন্দির সাজানো। সে-ও একটা বিরাট ব্যাপার। সুকুমার রায়, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী বা জংলী[৩] ও তাঁদের চেয়ে অল্প বয়স্ক একদল ছেলে সারা রাত ধরে গ্যাঁদা ফুলের মালা ও অন্যান্য ফুলপাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজাতেন।"[৪] বিদেশ থেকে ফেরার সময় তাঁর পৈতৃক বসতবাড়ি আপার সার্কুলার রোডের পুবদিকে ১০০ গড়পার রোডে; স্থানান্তরিত হলেও তাঁর সমাজের কর্মক্ষেত্র তখনও ঠিকানা পাল্টায়নি।

১৮৭৮-এ ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় ভাঙনের পর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হল, তার প্রধান প্রবর্তক হয়ে উঠলেন এক তরুণ বিদ্বান্ যুবক : আনন্দমোহন বসু। ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে তাকে আকর্ষণ করতে হবে দেশের তরুণ সমাজকে, এই বিশ্বাস থেকেই ১৮৭৯-র ২৭ এপ্রিল তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রসমাজ তথা তাদের শনিবাসরীয় সাপ্তাহিক সঙ্গত Students' Weekly Service. ১৮৮০-র প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানেই প্রচলিত হল এক নতুন উৎসব : বালক-বালিকা সম্মেলনের। কালক্রমে মাঘোৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এই অনুষ্ঠান। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে, সুকুমার ও তাঁর সমবয়সীরা যখন এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তখনকার উৎসবে নিমন্ত্রণকর্তার ভূমিকা নিতেন ডাক্তার নীলরতন সরকার আর ছেলে-মেয়েদের গল্প বলতে আসতেন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। গল্পের শেষে খাঁটি সাহেবি পোষাকে হ্যাট পেতে ভিক্ষা নিতেন অনাথ আশ্রমের জন্য। বালক-বালিকাদের সাপ্তাহিক সমাবেশ হত রবিবারে। কোন এক বছরে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় সম্ভবত সুকুমারের লেখা মজার একটি নাট্যলেখ অভিনয় করে পরিবেশন করেছিল ছেলেমেয়েরা। "কেউ "বাঃ" কেউ "কিন্তু" কেউ "যদি" কেউ-বা "বটে" সেজেছিল। "বাঃ" স্টেজে ঢুকেই বলল :

"আমার নাম বাঃ,
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা।"

"যদি" ঢুকেই বলল :

"আমার নাম যদি,
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।"

"বটে" ঢুকেই বলল :

"আমার নাম বটে,
কটমটিয়ে তাকাই যখন সবাই পালায় ছুটে।"

শেষের দিকে একটা গানে ছিল :

"নিষ্কম্মারা গেল কোথা
পালাল কোন দেশে ?"[৫]

ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত বালক ও ছাত্র-রূপে সাধারণ সমাজের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেও পাঠ্যাবস্থা সমাপ্ত হওয়ার আগে সুকুমার কিন্তু সমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি; করলেন ১৯০৬-এ স্নাতক হওয়ার পর, ১৯০৭ সালে। তবে তখনও SWS-এ কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর কর্মপরিধি। ১৯০৯ সালের ১১ ডিসেম্বর 'বর্ণবিভেদ কি অবিমিশ্র অমঙ্গল' বিষয়ে এক বিতর্কসভায় তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯১০-এ তাঁরই উদ্যোগে প্রবর্তিত হয় 'যুবকদের প্রার্থনাসভা'। তখন থেকেই উপাসকমণ্ডলীরও তিনি সহকারী সম্পাদক। একটু

লক্ষ করলেই দেখা যায়, এরই সন্নিহিত সময় থেকে SWS-এর অনুষ্ঠানগুলি ক্রমেই হয়ে উঠেছে আরও কর্মচঞ্চল, আরও সমাজসচেতন। এইসময়ে সুকুমারের সমাজজীবনের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র ছিল ব্রাহ্ম ধর্মদেশনার জগতে। আদিসমাজে দেবেন্দ্রনাথ তখন অবসিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ আর তত উৎসাহী নন; তার একমাত্র আকর্ষণ তখন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত তাঁর কর্মজগৎ কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে। কেশবচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও নিরুৎসাহ। ঠিক তখনই, নবীন বঙ্গের গুণী সমারোহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রাণোচ্ছল। কলকাতার মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম পরিবারের বাইরে বৃহত্তর বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে তার শাখাকেন্দ্র, আর এদেরই কেন্দ্রমণি হয়ে গড়ে উঠছে কলকাতার উপাসকমন্ডলী। এই বিস্তারের পরিকল্পনা বা রূপায়ণে সুকুমারের ভূমিকা কী ছিল নিশ্চিত জানার মতো তথ্যসূত্র সম্ভবত আজ বিলুপ্ত, কিন্তু বিদেশযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক-রূপে এই কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত থাকাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

বিদেশে মুদ্রণবিদ্যার পাঠ নিতে গিয়েও সুকুমার ব্রাহ্মসমাজকে ভোলেননি। ১৯১১ সালেই কুচবিহারের মহারাণীর আগ্রহে ও প্রযত্নে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে। বলা বাহুল্য, বিদেশে সম্প্রদায়গত বিভেদ প্রকাশ পায়নি, নির্বিশেষভাবে সব ব্রাহ্মেরই মিলনমন্দির হয়ে উঠেছিল এই কেন্দ্র। রবিবার সকালে এমার্সন ক্লাবে, এসেক্স বা লিন্ডসে হল্-এ উপাসনায় সুকুমার উপস্থিত থাকতেন। এ ব্রাহ্মসমাজ তখন কেবলমাত্র ধর্মসঙ্গত নয়, সংস্কৃতিসত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯১২-র মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে উপস্থিতির পর এই দ্বিতীয় প্রবণতাই প্রধানতর হয়ে উঠেছে। পিতৃসুহৃদ্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক নবীন বন্ধুতার বন্ধন গড়ে উঠছে এই প্রবাসে ব্রাহ্মসমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে কেন্দ্র করে, যার রেশ প্রলম্বিত হবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর ২৯শে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়েই বিদেশ থেকে ফিরে এলেন সুকুমার। ইউ রায় এ্যান্ড সন্সের পৈতৃক মুদ্রণ ব্যবসায় ও 'সন্দেশ' পত্রিকার পরিচালনা একদিকে, অন্যদিকে সাধারণ সমাজের তরুণ ব্রাহ্মমন্ডলের পুনর্গঠন — এই দুই কর্মকান্ড অধিকার করে নিল তাঁর প্রাণবন্ত যৌবনের অবশিষ্ট কয়েকটি বৎসরের পরমায়ু।

১৯১৩ সালের শেষভাগেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাষণ দিলেন ব্রাহ্মসমাজে, বিষয় : "চিরন্তন প্রশ্ন"। ১৯১৪ সালের সূচনা থেকে সুকুমার সাংগঠনিক দায়িত্বে যুক্ত হলেন সমাজের সঙ্গে। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রস্তাবে ও চারুচন্দ্র সিংহের সমর্থনে সুকুমার নির্বাচিত হলেন সহকারী সম্পাদক (২২ জানুয়ারি)। কার্যনির্বাহিক সমিতির এ-বছরের প্রতিটি অধিবেশনেই (ফেব্রুয়ারি ৫, এপ্রিল ৩০, মে ১১, জুলাই ৩০, সেপ্টেম্বর ৭, অক্টোবর ৩১, ডিসেম্বর ১০ ও ১৯১৫-র জানুয়ারি ৮, ১২-১৪) উপস্থিত ছিলেন তিনি। ১৯১৫-র বার্ষিক সাধারণ সভাতেও শিশির বসুর প্রস্তাবে ও প্রফুল্লকুমার চন্দের সমর্থনে সহকারী সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হন সুকুমার। ফেব্রুয়ারি ১০ তারিখে কলিকাতা উপাসকমন্ডলীর অন্যতম আচার্য নির্বাচিত হন তিনি। ১৯১৬ সালে বিপিনবিহারী চক্রবর্তীর (২য়) প্রস্তাব অনুসারে ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সমর্থনে ও ১৯১৭-য় বিনোদবিহারী ঘোষের প্রস্তাবক্রমে ও হরকুমার গুহ-র সমর্থনে একাদিক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ বার নির্বাচিত হলেও তিনি পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশনা উপসমিতির সদস্য মনোনীত হন তিনি। ২৭ এপ্রিলের সাধারণ সভায়ও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

করেন। ৩-৫ অক্টোবর ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশনে মূল সমাজের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন সুকুমার। পরবর্তী বছরের যুব-সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হন তিনি। কিন্তু ১৯১৬-য় তাঁর পদত্যাগকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ পদত্যাগী সুকুমারের পরিবর্তে নির্বাচনে পরাজিত অখিলচন্দ্র ঘোষালকে সহকারী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করলে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। ১৩ জুলাই পর্যন্ত এমনই অচলাবস্থা চলার পর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সুকুমারকে তৃতীয় সহকারী সম্পাদক নির্বাচনের প্রস্তাব করলে ললিতমোহন দাস ও রজনীকান্ত গুহ-র বিরোধিতাকে সংখ্যাগুরু সদস্যরা সমর্থন জানান। তখন প্রতুলচন্দ্র সোমকে সর্বসম্মতভাবে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। এইসময় থেকে মন্ডা ক্লাবের বৈঠক আয়োজনে ও উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও সমাজের কর্মকান্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি সুকুমার। ১৯১৬-য় কোন ব্রাহ্ম ব্যারিস্টার হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে মেয়ের বিবাহ দিলে সে-বিতর্কেও লিপ্ত হতে দেখা যায় তাঁকে। ১৯১৭-র বার্ষিক সভার প্রথম দিনে (২২ জানুয়ারি) নির্বাচন বিষয়ে ও দ্বিতীয় দিন (২৯ জানুয়ারি) বিগত বর্ষের বিদায়ী কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতি ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবদুটি উত্থাপন করেন সুকুমার।

১৯১৬ সালের মাঘোৎসবে সমাজের কার্যনির্বাহিক সভায় নির্বাচিত হয়েও তাঁর নাম প্রত্যাহারের প্রধান কারণ ছাত্রসমাজ ও যুবসমিতি — ব্রাহ্মসমাজের এই দুই ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে এক নবীন প্রাণের আন্দোলন সৃষ্টি করার প্রয়োজনবোধ। সমকালীন বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজে নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশায় বহু তরুণ মাত্রা রাখতে পারেননি। ১৯১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত এক চিঠিতে বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক সত্যশরণ সিংহ লেখেন, 'ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে বাল্যকালে কিছুদিন নীতিবিদ্যালয়ে ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া ও যৌবন অবস্থায় ছাত্রসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মযুবকগণ আদর্শ চরিত্র দেখাইতে পারিতেছেন না। আজকাল এমনই হইয়াছে যে, অনেক ব্রাহ্ম দশের কাছে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন — ইহার কারণ এই যে, হিন্দুসমাজের যুবকদের অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের যুবক ও যুবতীদের পতন কিছু বেশী হইতেছে।'[৬] পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় ময়মনসিংহ থেকে লেখা শ্রীনাথ চন্দের প্রতিবাদ : 'অনেক ব্রাহ্ম দশের কাছে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন, আমরা এ সংবাদ অবগত নহি।... আজ কাল ব্রাহ্ম যুবকদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাই। তাঁহাদের অনেকে আমাদের আশানুরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেছেন না; নানা দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কাহারও কাহারও দুর্গতি ঘটিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ চরিত্র, ধর্ম্মোৎসাহী ও সেবাপরায়ণ লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। চরিত্র সম্বন্ধে অন্য সমাজের সঙ্গে তুলনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে ব্রাহ্ম যুবক ও ছাত্রমন্ডলীর উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের যে গুরুতর কর্ত্তব্য আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? লেখক ঐ সঙ্গে ব্রাহ্ম যুবতীদের কথা উল্লেখ করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছেন; আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।...ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও শ্রেণীর কন্যাগণের মধ্যে বিলাসিতা ও সুখস্পৃহার চিহ্ন দেখা গেলেও তাঁহাদের মধ্যেও বহু গুণবতী কন্যা আছেন।... সকলেই স্বীকার করিবেন, একদিন এই কন্যাদিগের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে: আমাদের চিরপোষিত আশা পূর্ণ হইবে।'[৭] চিঠির শেষে 'তত্ত্বকৌমুদী'র সম্পাদক সংযোজিত মন্তব্যে এই বক্তব্যেরই

প্রতিধ্বনি করেন। দুটি সংখ্যা পরে বাঁকিপুর থেকে যামিনীকান্ত দেব আবেদন করেন : 'আজ কেন ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে [তরুণদের] আকৃষ্ট করতে পারেন না?... আমাদের সমাজ এখন মৃতপ্রায়।... কয়েকজন প্রচারকের হাতে ব্রাহ্মসমাজের ভার ফেলে দিলে চলবে না। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা উন্নত, চরিত্রবান্‌, আজ তাঁহাদের নিকট মনের দুঃখ জানাইতেছি। তাঁহারা অগ্রসর হয়ে আমাদের পরিচালক হউন, ও সমাজকে আরও উন্নত করুন। আমাদের চালকের অভাব আছে। আমরা উপযুক্ত নেতা চাই।'[৮] ২ ডিসেম্বর ১৯১৫-র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হয় দুটি সম্পাদকীয় : "ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা" ও "উপায় কি"। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে তরুণদের উদ্বোধিত করা এবং তাদের সংগঠিত করা — এই দ্বিবিধ কাজেই সুকুমারকে নেতার ভূমিকায় দেখা যাবে এইসময় থেকে। মনে হয়, সমাজের নির্দেশে নয়, অন্তরের প্রেরণাতেই সাধারণ সমাজের কর্মকান্ড থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তরুণ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে। হিরণকুমার সান্যালের মতো তখনকার তরুণদের অনেকেরই মনে হয়েছিল, সমাজে এই ভূমিকায়ই 'আরো বড় ক'রে' পেয়েছিলেন সুকুমারকে।[৯]

এই ১৯১৬ থেকে তাঁর শেষ রোগশয্যার আগে (১৯২১) পর্যন্ত সুকুমার নেবেন নেপথ্য নায়কের ভূমিকা, আর সদ্য কেমব্রিজ-প্রত্যাগত সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সারথীর দায়িত্ব নিয়ে এলেন প্রত্যক্ষে। এঁদের ভাবনা-বিশ্বাস ও কর্মপ্রয়োগে তার অনুবাদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হয়ে উঠল সে-যুগের আগুয়ান তরুণ সম্প্রদায়ের তর্কযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্র। জ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলনে নবপ্রজন্মের বাঙালি যুবকের চিন্তাজগৎ ক্রমে অবয়ব পেয়ে গড়ে উঠছিল। সমাজ ও সংগঠন বিষয়ে তরুণদের এই উৎকণ্ঠার প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৩২৩ মাঘ ১৪ শনিবার ২৭ জানুয়ারি ১৯১৭ 'ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসবে'। এই সম্মিলনী সমিতির সম্পাদক ছিলেন সুকুমার। পন্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের প্রার্থনার পর সুকুমারের প্রস্তাবে ও হিমাংশু গুপ্তের সমর্থনে অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ ব্রাহ্ম সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। সভায় সুকুমার বলেন, প্রতিবেদকের ভাষায়, '...the time-spirit has awakened new forces long dormant in the minds of the youngmen. We do not know the potential possibilities; still these forces must be consolidated for creative purposes; and so he proposed that "Steps be taken to form a permanent Association."'[১০] এই মর্মে একটি নিবদনও প্রচার করেন তিনি :

> বিগত মাঘোৎসব সম্পর্কে ১৪ই মাঘ শনিবার কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি যুবক সম্মিলনী হয়। সম্মিলনীর কার্য্যে মহিলাগণ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ইহাকে আশাতীত সাফল্যলাভে সক্ষম করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ, ও সম্মিলনীর অন্যান্য কার্য্য বিবরণ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সম্মিলনীর নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মযুবকগণের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের ভার একটি "provisional committee"র উপর অর্পিত হয়। এই কমিটি, মহিলাদের একটি স্বতন্ত্র কমিটির সাহায্যে, এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব স্থির করিয়া সকলের অবগতি ও অভিমতের জন্য পাঠাইতেছেন।
>
> **উদ্দেশ্য**
>
> ১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রসারের জন্য সকলের সম্মিলিত চিন্তা কর্ম্ম ও আনন্দের মধ্যে আদর্শের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা।

[এই উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি থাকিলে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে উপযুক্তবয়স্ক যে কেহ বার্ষিক ১ টাকা চাঁদা দিয়া ইহার সভ্য নিব্বাচিত হইতে পারিবেন]

২) এই মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন :

যথা — (১) পাঠ অনুশীলন ও আলোচনাদি দ্বারা স্বাধীন চিন্তার বিস্তার।

(২) পত্রিকা পরিচালন ও পুস্তকাদি প্রচারের দ্বারা আদর্শের আদান প্রদান।

(৩) যথার্থ পরিচয়সূত্রে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার সম্মিলনের ব্যবস্থা করা।

(৪) ব্রাহ্মযুবকগণের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যোগরক্ষাপূর্ব্বক আবশ্যক মত তাহাদিগের কার্য্যে সহায়তা করা।

(৫) ব্রাহ্মসমাজের নানা অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহার সব্বাঙ্গীণ সেবার আয়োজন করা।

(৬) জনসেবা ও দেশের অন্যান্য লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে যথার্থভাবে যোগদান করা।

(৭) আবশ্যক মত নানাস্থানে শাখা স্থাপন করিয়া সম্মিলনীর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।

সম্মিলনীর সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী, কমিটিসংগঠন ও নিয়মব্যবস্থাদি সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়েও এই কমিটি কতকগুলি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল নির্দ্ধারণাদি প্রাপ্ত মতামত সহ সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য উপস্থিত করা হইবে; এবং ঐ মীমাংসাকে কার্য্যকরী আকার দিবার জন্য একটি স্থায়ী কমিটির উপর এক বৎসর কাল সম্মিলনীর পরিচালনার ভার অর্পণ করিবেন। সম্মিলনীর সভ্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে এই কমিটি নিব্বাচিত হইবে। সমাজের প্রবীণগণ, যাঁহারা বয়সে জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় আমাদের অগ্রগামী, তাঁহাদের মধ্য হইতে ত্রিশ জন নিব্বাচিত প্রতিনিধিকে এই সম্মিলনীর সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইবে, কমিটি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

যাঁহারা সম্মিলনীর সভ্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০০নং গড়পাড় রোডে সম্মিলনীর অস্থায়ী সম্পাদকের নিকট জানাইবেন এবং স্ব স্ব মতামত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী সুকুমার রায়
সম্পাদক, সম্মিলনী কমিটি।"

যুব-উৎসবে পড়া ও সুকুমার-সম্পাদিত 'উৎসবে' সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধ ছিল : [সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,] "জীবন ও ধর্ম্ম", [প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ,] "সূচনা", নলিনী সরকার, "বাহিরের ডাক", তটিনী গুপ্ত, "নূতনের আহ্বান", [প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,] "ব্রহ্মযুবক ও সমাজ-সমস্যা", সুনীতি দেবী, "নারীর অধিকার", শান্তা দেবী, "স্ত্রীলোকের অধিকার", জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, "নারীর স্বাধিকার", অমলচন্দ্র হোম, "আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা", সুনীতি গুপ্ত, "উৎসবের নিবেদন", বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত, "মিলনের উপায় ও অন্তরায়", সরোজকুমার দাস, "সাধনার আদর্শ", বাসন্তী মিত্র, "নারীর কথা", সুজাতা বসু, "স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", প্রীতিলতা ঘোষাল, "কর্ম্মের আহ্বান", জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, "নিবেদন", অমলকুমার সিদ্ধান্ত, "সমাজ ও আদর্শ"। ৯ এপ্রিল ঈস্টার উৎসবে প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি করে যে সঙ্গতের আয়োজন করা হয়, সেই সভায় উপদেশকের বেদী থেকে সুকুমার "যুবকের জগৎ" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে ফেরবার পর যুবসমাজের আহ্বানে ২৫ এপ্রিল 'সমাজে নারীর স্থান' ও আরেকদিন 'বাংলায় ধর্মান্দোলনের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮ অগাস্ট পন্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সম্মানসভায় ও ১৯ অগাস্ট ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা দেন সুকুমার। তাঁরই সম্পাদক থাকাকালীন স্থায়ী যুব প্রতিষ্ঠান গঠন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবও সম্মিলনী সমিতি যথাসময়ে

সমাজ-কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করেন, যদিও তার ফল বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায়না।

১৯১৮-১৯-এ SWS-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন সুকুমার। ১৫ জানুয়ারি মাঘোৎসবের ভাষণ দেন তিনি "জীবনের হিসাব"। ব্রাহ্ম যুবকদের দ্বিতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০ জানুয়ারি ১৯১৮। তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র সুশোভনচন্দ্র সরকার ২৫ জানুয়ারি তাঁর দিনপঞ্জিতে লেখেন : "I am resolved to improve myself and to adopt 'excelsior' as my motto in life—for the Utsava has profoundly impressed me." তরুণদের মনে এই সংকল্প জাগিয়ে তোলাই ছিল সুকুমারের প্রধান অভীষ্ট এবং সুশোভনচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সেই অভীষ্টসিদ্ধিরই অভ্রান্ত প্রমাণ। ২১ জানুয়ারি ১৯১৮-র বার্ষিক সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য মনোনয়নের প্রস্তাব করেন সুকুমার, সমর্থন করেন প্রশান্তচন্দ্র। অবশ্য কিছুদিন পরেই অন্য দুটি সাংগঠনিক প্রস্তাবের সঙ্গে সম্মানিত সভ্য বিষয়ে প্রস্তাবটিও প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয় তাঁদের। ঐদিনই আবার সুকুমারকে দেখা যায় বালক-বালিকা সম্মেলনে গল্পকথকের ভূমিকায়। ১৩২৪ বর্ষশেষের দিনে (১৩ এপ্রিল ১৯১৮) তরুণদের প্রার্থনাসভায় আচার্যের আসন গ্রহণ করেন তিনি।

২৭ জুলাই SWS-এর নির্বাচনে উদারপন্থীরা জয়লাভ করলে, প্রবীণদের রক্ষণশীল একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধেরর সূত্রপাত হয় প্রথম থেকেই। নবীনেরা চান, আবেদনপত্র থেকে সব নেতিবাচক শর্তগুলি বর্জন করতে। কিন্তু ২৯ জুলাই সমাজের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সভায় ললিতমোহন দাস প্রস্তাব করেন, '...old form of application for membership of the Students' Weekly Service which contains the temperence clause be retained.' হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সমর্থনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। নির্ধারিত সময়ের ব্যবধান না-থাকায় এই আবেদনপত্রে সভ্য-হওয়া সদস্যদের ভোট বৈধ কিনা এই প্রশ্ন ওঠে ১৩ অগাস্টের মুলতুবি সভায়। দুদিনই SWS থেকে সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন পরিদর্শক হিসেবে। সমাজের উদ্দেশ্য সূত্রবদ্ধ করতে গিয়ে শব্দবন্ধগত নানা বিতর্কের পর ললিতমোহন দাস ও বরদাকান্ত বসুর প্রস্তাবটিই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় দ্বিতীয় দিনে : 'The quest, realisation and propagation of liberal theistic principles and rational ideals in all aspects of life, social and individual.' ৭ সেপ্টেম্বর ছাত্র সমাজের সভায় আবেদনপত্র বিষয়ে বিতর্ক বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলে সভাপতি সুকুমার সভা বন্ধ করে দেন। ২ অক্টোবরের সভায় ২১ সদস্যের একটি আবেদনপত্র সমীক্ষা সমিতি গঠন করে দেন সুকুমার। ৪, ৬ ও ১০ ডিসেম্বর আলোচনার পর খশড়া প্রস্তাব সাধারণ সদস্যদের বিবেচনার জন্য বিতরিত হয়। ১৯১৯-এর ৪ জানুয়ারি ২০-১ সমর্থনে নতুন আবেদনপত্র ছাত্রসমাজে গৃহীত হবার পর সাধারণ সমাজে স্বীকৃতির জন্য পাঠানো হয়।

১৯১৯-২০তেও SWS-এর সহ-সভাপতি থাকেন সুকুমার, যদিও সুবোধচন্দ্রের স্থানে সভাপতি হন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মহর্ষির জীবন ও সাধনা বিষয়ে সুকুমার ভাষণ দেন ২০ জানুয়ারি। মাঘোৎসবের মধ্যেই, ২৪ জানুয়ারি, তিনি পাঠ করেন "The Burden of the Common Man" প্রবন্ধটি। ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজের উৎসবে 'ভবিষ্যতের ভরসা' আলোচনাচক্রে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়কুমার সেন, নলিনী সরকার, সুরীতি মিত্র, মনীষা রায় ও প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে অংশ নেন সুকুমার। SWS-এর সদস্যসংখ্যা ২৫০ পেরিয়ে যাওয়ায় ১২ মার্চের সভায় সুকুমারের

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয় বিভিন্ন বিষয়ে তরুণদের পরিচিত করবার জন্য সক্রিয় সদস্যদের কয়েকটি ছোট ছোট সংগত সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু ২০ মার্চ সাধারণ সমাজ থেকে নতুন আবেদনপত্রের খশড়া ফেরৎ আসায় ২২ মার্চ থেকেই ছাত্রসমাজের সদস্যরা আবার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের সুপারিশের মাত্র বারটি অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করতে সম্মত হন সমাজ কর্তৃপক্ষ, অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়। প্রশান্তচন্দ্রের যুক্তি অনুসারে ছাত্রসমাজ সংশোধনগুলি 'আপাতত' মেনে নেয়, যাতে সাধারণসভা আবেদনপত্র সংস্কার আর মুলতুবি রাখবার সুযোগ না-পায়। তবে ত্রয়োদশ সূত্রটি অর্থাৎ সাধারণসভা নির্ধারিণ করে দেবে আবেদনপত্র সংস্কৃত হয়ে কী রূপ নেবে, সমীক্ষা সমিতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। সমাজের পরবর্তী সভায় এই আপসরফা আবেদনপত্রই গৃহীত হয়। ১৫ মে প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভাব' বিষয়ে সুকুমার ভাষণ দেন। ২৩ অগাস্ট ভাদ্রোৎসবে ও ৪ নভেম্বর শিবনাথ স্মরণসভায়ও বক্তৃতা দেন তিনি। ৬ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান অনুসারে স্থাপিত হয় তিনটি 'ফ্রেটার্নিটি': সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সত্র। শিক্ষা সত্রের মধ্যে আবার অন্তর্ভুক্ত হয় এমার্সন, রবীন্দ্রনাথ, তুলনামূলক সাহিত্য ও সমাজ-বিদ্যার চারটি পাঠচক্র।

১৯২০ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহিক সমিতিতে আবার ফিরে আসেন সুকুমার। রবিবারের নীতিবিদ্যালয়েও উপদেশনা শুরু করেন এই বছর থেকে। SWS-এ তিনি হন সভাপতি। যদিও নতুন সচিব হন রক্ষণশীল হেমেন্দ্রলাল রায়, কিন্তু তিনটি সত্রের প্রতিনিধিরা সবাই ছিলেন উদারপন্থী। মাঘোৎসবে যুব-উৎসবে (২৭ জানুয়ারি) ও বালক-বালিকা সম্মেলনে (২৮ জানুয়ারি) আচার্যের উপদেশ দেন সুকুমার। ২ ফেব্রুয়ারি সিটি কলেজে মুলতুবি সাধারণসভায় আবার উত্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য মনোনয়নের প্রসঙ্গটি এবং রক্ষণশীলদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ৪৭-৩১ সমর্থনে কার্যনির্বাহিক সমিতিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ-বছরের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয় রবীন্দ্র-রচনাপাঠ ও গানের মধ্য দিয়ে। ৭ অগাস্ট বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় ভাষণ দেন সুকুমার। ২৩ অগাস্ট আনন্দমোহন স্মরণসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এক গভীর আত্মসংকট তাঁর নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য তার পরেও ২ অক্টোবর তাঁকে আবার দেখা যায় শিবনাথ স্মৃতিসভায় ভাষণ দিতে। ৪ ডিসেম্বর নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনাচক্রেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন সুকুমার।

১৯২০ সালে ফ্রেটার্নিটির অধিকাংশ সত্রেই উপস্থিত ছিলেন সুকুমার (মার্চ ২৬, ৩০; এপ্রিল ১৪; গ্রীষ্মের ছুটি; অগাস্ট ৩, ৯, ১৩, ১৭, ১৯, ২৪, ৩১; সেপ্টেম্বর ৩, ৭, ২১, ২৮; পরীক্ষা ও শীতের ছুটি)। সমাজ-নেতৃত্ব বা ধর্ম-সাধনা বিষয়ে তাঁর সংশয় উপস্থিত হলেও, প্রশান্তচন্দ্রকে ২৩ অগাস্টের চিঠিতে লিখেছিলেন, '...fraternity ইত্যাদিতে আমার লোভ ছাড়তে পারব না বোধহয়।' এইসব পাঠচক্রের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করলেও বোঝা যাবে সংগঠকদের দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতা। প্রথম বছরেই আলোচনার বিষয় ছিল : বিবাহের আদর্শ ও বিবর্তন — ওয়েস্টারমার্ক ও কার্ল পিয়ার্সনের মতামত, ধর্মে প্রার্থনা ও সম্প্রদায়ের স্থান, ঈশ্বরের বোধ কি ব্যক্তিগত, বেদান্ত অজ্ঞেয়বাদ প্রামাণ্যবাদ, বল্‌শেভিজম্ ও লেনিন, লেনিন ও গান্ধি, অপরাধ জগৎ, কংগ্রেস ও অসহযোগ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাসেল ও গান্ধি, ফ্রয়েড ব্যাডবি ইউয়েন, আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদ, সমাজবাদ; এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিকতম লেখক ও

বিশ্বসাহিত্যে গ্রীক নাটক থেকে ইবসেন ব্রাউনিং টেনিসন পর্যন্ত। সদস্যদের বাইরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষিতিমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরাও আসতেন আলোচনাসভায়।

১৯২০-র শেষ কয়েকটি মাসে ব্রাহ্ম যুবসমাজ আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য মনোনয়নের প্রশ্নে। সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্রের যৌথ রচনায় প্রচারিত হল বিবরণপত্র। ছাত্রসমাজ সিদ্ধান্ত নিলেন স্বতন্ত্র উৎসব পালনের। এমনকি সমাজমন্দিরে নয়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীদের বাড়ির ছাদে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম যুব-উৎসব (১৯২১)। সুশোভন সরকারের "স্মৃতিচারণ" থেকে জানতে পারি, এইসময় একদিন "প্রশান্তচন্দ্রের ঘরে আমরা ক'জন বসে আছি, এমন সময় ঢুকলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। বললেন, "কী আলোচনা করছ ?" আমাদের spokesman তাতাদা বললেন, "আপনাদের অন্যায়ের প্রতিবাদে কী করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করছি।" কৃষ্ণকুমার বললেন, "এসব ক'রে কী হবে ? তোমরাই দায়িত্ব নাও, আমরা সরে যাচ্ছি।" তাতাদা বলে উঠলেন, "আগে আপনাদের অন্যায়গুলো withdraw করুন, তারপর সকলে মিলে স্থির করা যাবে কী করা হবে।" [১১] সম্ভবত অন্য আরেকদিনের কথা বলেছেন হিরণকুমার সান্যাল, "তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র এসে প্রায় রোজই বোঝাতেন। তাতাদা তাঁকেই আমন্ত্রণ জানালেন, আমি আচার্য হয়ে উপাসনা করলে আপনারা আসবেন না ? কৃষ্ণকুমার বললেন, সুকুমার, তুমি যে আমাদের একজন আচার্য, তুমি বেদীতে বসলে আমরা তোমার কথা শুনব না তা কি হতে পারে ? প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতা কৃষ্ণকুমারের এই উত্তর সেদিন উপস্থিত যুবকদের মর্ম স্পর্শ করেছিল।"[১২] এর অল্পদিনের মধ্যেই কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন সুকুমার। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হল বটে, কিন্তু রোগশয্যা থেকেও প্রশান্তকুমারের 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' (১৯২১) পুস্তিকার কল্পনা ও রচনায় সাহায্য করেছিলেন সুকুমার। এরই পরিণতিতে ১৯ মার্চ ৪৪৬-২৩৩ সমর্থনে সম্মানিত সদস্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মনোনয়ন ব্রাহ্মসমাজে সুকুমারের শেষ কীর্তিফলক হয়ে রইল। ১৯২২-এর মাঘোৎসবে সমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করলেন 'অতীতের ছবি' গৌরবগাথা — ব্রাহ্মসমাজে তাঁর শেষ উপহার।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১) 'ছেলেবেলার দিনগুলি', কলকাতা . নিউ স্ক্রিপ্ট ১৯৫৮, পৃ ১২৯-৩
২) "সুকুমার রায়", 'বৈতানিক' ৩, ১৩৭২ বৈশাখ, পৃ ১৯
৩) প্রফুল্ল গাঙ্গুলীর ডাকনাম মংলি; জংলী প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলীর ডাকনাম
৪) 'পূর্বস্মৃতি, কলকাতা : প্যাপিরাস ১৮৮৩, পৃ ৬৬-৬৭
৫) শান্তা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৪
৬) বর্ষ ৪০/১১ সংখ্যা, পৃ ১৩০-৩১
৭) বর্ষ ৪০/১২ সংখ্যা, ৩ অক্টোবর ১৯১৫, পৃ ১৪২-৪৩
৮) ১৭ নভেম্বর ১৯১৫, বর্ষ ৪০/১৫ সংখ্যা, পৃ ১৭৭
৯) পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র', কলকাতা : প্যাপিরাস ১৯৭৮, পৃ ১৬৬
১০) 'উৎসব', কলিকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ১৩২৩, পৃ ৬
১১) 'প্রস্তুতিপর্ব', বর্ষ ৭/৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮২, পৃ ১২৩
১২) পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৭

সুকুমার রায়ের ছবি

শোভন সোম

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত জলরঙে আঁকা সূর্যাস্তের গম্ভীর একটি নিসর্গচিত্র ছাড়া সুকুমার রায়ের জীবিতকালে এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর আঁকা ছবিতে তাঁকে ইলাস্ট্রেটর বা গল্পকবিতার ছবি-আঁকিয়ে হিসাবেই দেখা গেছে। জলরঙের ছবিতে দক্ষতা সত্ত্বেও তিনি যেমন ইলাস্ট্রেটর হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তেমনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প সমালোচনার মতো বয়স্কপাঠ্য তত্ত্বমূলক বিষয়নির্ভর প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ মনন প্রকাশিত হলেও তিনি শিশু ও অল্পবয়সিদের জন্যই মূলত লিখেছিলেন। যশের সহজ সুগম পথ ছেড়ে তিনি শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত ক্ষেত্রদুটিই বেছে নিয়েছিলেন।

বাঙলাভাষায় প্রকৃত শিশুসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, আঠারো শ একানব্বইতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' প্রকাশের সঙ্গে। ক্লিষ্ট ভাষা, দুর্ভার বিষয় ও দুষ্পাচ্য নীতিশিক্ষার মাধ্যমে শিশুর কল্পনাকে খর্ব করে যোগীন্দ্রনাথ শিশুর জগতে আধিপত্য বিস্তার করেন নি। বয়স্কের দূরত্ব পরিহার করে ভাষা, ভাব, প্রকাশের দ্বারা শিশুর জগতকে তিনি আনন্দময় ও কল্পনাময় করে তুলতে চেয়েছিলেন। বাঙলা ভাষায় নন্‌সেনস্ রাইম তিনিই প্রথম লিখেছিলেন। আঠারো শ পঁচানব্বই থেকে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর সুহৃদ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশু ও অল্পবয়সিদের জন্য লেখা বইগুলি প্রকাশের দায়িত্ব নেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম সচিত্রিত বই আঠারো শ ষোলোতে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'। তদবধি তত্ত্বমূলক বই ছাড়া বাকি প্রায় সব বইই ছবিসহ ছাপা হতে দেখা যায়। বিশেষ করে শিশুদের জন্য লেখা বইগুলি হতো প্রচুর ছবি শোভিত। সেই সব ছবিতে থাকতো নিছক কল্পনাছাড়া বর্ণনা। যোগীন্দ্রনাথের প্রকাশনার ছবি আঁকতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু তাঁর আঁকা ছবি উপেন্দ্রকিশোরের পছন্দ না-হওয়ায় উপেন্দ্রকিশোর নিজেই তাঁর বইয়ের ছবি আঁকা শুরু করেন। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'টুনটুনির বই'-এর জন্য যে সব ছবি আঁকেন সেগুলি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ছবিতে তিনি কিভাবে গল্পের বর্ণনা সত্ত্বেও গল্পের অতীত ব্যঞ্জনা যুক্ত করেছিলেন। বাঙলাভাষায় শিশুসাহিত্যের সচিত্রণে উপেন্দ্রকিশোরই এই নূতন ধারার প্রবর্তক।

বাঙলা শিশুসাহিত্যে ও তার সচিত্রণে যোগীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের অগ্রজ হলেও সুকুমারের লেখা ও তাঁর আঁকা ছবির সূত্রে আমাদের দু'জন ইংরাজিভাষী লেখক-চিত্রকারের কথাই মনে হয়। সুকুমারের সঙ্গে নানাদিক থেকে এঁদের মিল লক্ষ করবার মতো। এই দুজনের একজন এড্‌ওঅর্ড লীয়র ছিলেন পর্যটক-চিত্রকর। জলরঙের নিসর্গচিত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে জলরঙে আঁকা নিসর্গচিত্রের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তিনি ছিলেন তারই অংশীদার। আঠারো শ বাহাত্তরে ভারতের তৎকালীন বড়োলাটের আমন্ত্রণে তিনি নিসর্গচিত্র আঁকতে এদেশে এসেছিলেন এবং কলকাতার ছবিও এঁকেছিলেন। কিন্তু সেই পরিচয় ছাপিয়ে

উদ্‌ভট লিমেরিক রচয়িতা ও মজাদার ইলাস্ট্রেশনের জন্য তিনি খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, রোগশয্যায় আঁকা ও মৃত্যুর পর কার্তিক, তেরো শ ত্রিশের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত সুকুমারের জল রঙে আঁকা সূর্যাস্তের গঙ্গার ছবিটি এই কঠিন মাধ্যমে তাঁরও দক্ষতার পরিচয় দেয়। ঐ দুজনের অপরজন, আজবদেশে এলিসের দেখা কান্ডকারখানার মজাদার গল্প ও ছবির রচয়িতা লুইস্ ক্যারল, এই ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালের ব্যক্তিটি ছিলেন চার্লস্ ডজ্‌সন নামক গণিতবিদ। গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুকুমারও ছিলেন দক্ষ। সুকুমারের ক্ষেত্রেও এই পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর লেখক-ইলাস্ট্রেটর পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। এঁরা তিনজনই ছিলেন শিশুর রাজ্যে রসের কারবারী। এলিসের বইয়ের ছবি ক্যারল নিজে এঁকেছিলেন, আর এঁকেছিলেন স্যার খেতাবধারী চিত্রকার জে টেনিয়েল। চিত্রকার হিসাবে টেনিয়েল অধিকতর যশস্বী হলেও ক্যারল ও টেনিয়েলের আঁকা একই ঘটনার ছবি দেখে বোঝা যায় রূপকল্পনা ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে তাঁদের মধ্যে কত তফাৎ ছিল।

এঁরা তিনজনেই নিজেদের লেখার ছবি এঁকেছিলেন এবং সমকালিক লেখা ও আঁকার পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা তিনজনই দলছুট ছিলেন। বয়স্কের পৃথিবীর বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে, প্রচলকে অস্বীকার করে এঁরা ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে শিশুপাঠ্য খেয়ালখুশির জগত রচনা করলেও ঐ আপাত শিশুপাঠ্য রচনা বহুক্ষেত্রেই ছিল রূপক। যদিও উদ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া রূপকের আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু রূপকের ক্ষেত্রে নিহিত মর্ম ছাড়াও যেমন রূপকের গল্পাংশ স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করা যায়, এ কারণে রূপকের মর্ম না-জেনেও শিশু পাঠক এঁদের রচনার গল্পাংশ উপভোগ করে ও তা থেকে আনন্দ লাভ করে। শিশু বয়সে এঁদের রচনা একভাবে উপভোগ্য, পরিণত বয়সে সেই রচনাই আরো গভীর উপভোগের বিষয় হয়ে ওঠে। এই কারণ এঁদের রচনা আপাতপক্ষে শিশুর জন্য হলেও তা সব বয়সি পাঠকের। এই কারণে এই তিনজনই লেখক হিসাবে কালজয়ী।

উপেন্দ্রকিশোর যে কারণে নিজেই তাঁর লেখার ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন, এই তিনজন একই কারণে নিজেদের লেখার ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। সাধারণ ক্ষেত্রে লেখক ও ইলাস্ট্রেটর আলাদা ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং পেশাদার ইলাস্ট্রেটর লেখার বর্ণনাটুকু অনুসরণ করে ছবি এঁকে থাকেন, ছবিকে সৃষ্টিধর্মী করে তোলেন না। লেখক ও ইলাস্ট্রেটরের মানসিক তরঙ্গদৈর্ঘ স্বতন্ত্র হবার কারণে বহুক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেটর লেখকের রচনার প্রতি সুবিচার করতেও ব্যর্থ হন এবং লেখকের রূপকল্পনা ইলাস্ট্রেটরের রূপকল্পনার সঙ্গে মেলে না। এই সংঘাত পরিহার করার জন্য কোনো কোনো লেখক নিজের রচনার ইলাস্ট্রেশন নিজেই করে থাকেন। এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। প্রাচীন চীনে কবিরা কবিতার সঙ্গে ছবিও আঁকতেন। এ দেশেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের লেখার ইলাস্ট্রেশন কোনো না কোনো সময় করেছিলেন। ইংরাজ কবি উইলিঅম্ ব্লেইক্ নিজের কবিতার ইলাস্ট্রেশন করতেন। প্রি-রাফায়েলাইটরা ছিলেন কবি-চিত্রকার। ইউরোপে আধুনিক কালের বহু লেখক সুদক্ষ চিত্রকরও ছিলেন। লিও তলস্তই তাঁর ছেলেমেয়েদের জুল্ ভের্ন-এর 'আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ' পড়ে শোনাতেন। তখনও বইটি সচিত্রিত ছিল না। তলস্তই নিজেই তাই এই বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেন। উইলিঅম্ মেইক্‌পিস থ্যাকারে 'ভ্যানিটি ফেয়ার' এর জন্য ছবিগুলি আঁকেন। আলেকজান্দর পুশ্‌কিন্ তাঁর 'কফিন নির্মাতা' গল্পের ছবিগুলি

এঁকেছিলেন। ডি এইচ লরেন্‌স্ 'পুনর্জাগরণ'-এর ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। পল হ্যালেরি তাঁর কবিতাব বই 'সমুদ্রতীরে সমাধিভূমি' ও 'শ্রীযুক্ত তেস্ত'-র ছবি এঁকেছিলেন আর হেরমান হেস্ কুড়ি বছর বয়সে তাঁর লেখা রূপকথা 'চিত্রকারের রূপান্তর'-এর ছবিগুলি এক বঙে ছেপে প্রতিটি বইয়ের কপিতে নিজের হাতে রঙ লাগিয়েছিলেন। সংগত কারণেই এঁরা নিজেদের কিংবা অপরের লেখার সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন।

তবে, বিশেষ করে ছোটো বা অল্পবয়সিদের জন্য লেখা বইতে ইলাস্ট্রেশনের অন্য এক বিশেষ ভূমিকা আছে। শব্দ বা বাক্য উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়, উদ্দিষ্টের প্রতিমাকে চাক্ষুষ করায় না। শব্দ বা বাক্য মূলত বস্তু বা ঘটনার পরোক্ষ প্রতীক বা প্রতিনিধি, যেমন আম-শব্দ থেকে ঐ বিশেষ ফলটির অর্থানুষঙ্গ বিযুক্ত করলে আম শব্দটি অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। অপরপক্ষে, অঙ্কিত প্রতিমা বা রূপ বস্তু বা ঘটনার চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব করে। শিশুপাঠক যা পড়ে সেটির চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব দিয়ে সেই পাঠকে সে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায। এই জন্য শব্দের ধ্বনির সঙ্গে ছবির অনুপূরণ দিয়ে শিশুকে শেখানো হয়ে থাকে, যাতে তার কাছে শব্দটি ধ্বনি মাত্র না থেকে বস্তুর অস্তিত্বের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে, কবিতা বা গল্পের ইলাস্ট্রেশন নিছক রসহীন বর্ণনা হলেই চলে না, ইলাস্ট্রেশনে বস্তু বা ঘটনার অনুষঙ্গ যেমন শিশু পেতে চায়, সেই সঙ্গে ছবি থেকে সে বাড়তি ব্যঞ্জনাও প্রত্যাশা করে।

উপেন্দ্রকিশোরের আগে এ দেশে এই ব্যাপারে শিশুসাহিত্যের কোনো ইলাস্ট্রেটর যে অবহিত ছিলেন, এমন অন্তত ইলাস্ট্রেশনগুলি দেখে, মনে করার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত বৈশাখ বারো শ বিরানব্বই-র 'বালক' এ রবীন্দ্রনাথের "বল গোলাপ মোরে বল" এর চারপাশ ঘিরে ইলাস্ট্রেটর হরীশচন্দ্র হালদার বিলাতি ইল্যুমিনেশন এর নকলে লতাকুঞ্জ ও উপরদিকে ফুলপাতার বলয়ের মধ্যে গোলাপ ফুল হাতে গাউন পরা মেমসাহেব এঁকেছিলেন। পরের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' গল্পের পাত্রদের ইনি এঁকেছিলেন যাত্রার পোষাকে, যাত্রার ভঙ্গিতে মায় মঞ্চের মতো সিন্‌সিনারি দিয়ে। ববীন্দ্রনাথের "বিম্ববতী" কবিতার ইলাস্ট্রেশন আঠারো শ বিরানব্বইতে এবং 'নদী' কবিতাব ইলাস্ট্রেশন আঠারো শ ছিয়ানব্বইতে অবনীন্দ্রনাথ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই আঠারো শ পঁচানব্বইতে তাঁব 'শকুন্তলা' বইয়ের ও আঠারো শ ছিয়ানব্বইতে তাঁর 'ক্ষীবের পুতুল' বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। উক্ত ইলাস্ট্রেশনগুলি ছিল আড়ষ্ট, ব্যঞ্জনাহীন এবং চিত্রকর হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের কোনো অসাধারণত্ব ঐগুলিতে প্রকাশ পায় নি। বস্তুত পক্ষে, অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যগন্ধী ছবিতে কৃতিত্ব দেখালেও ইলাস্ট্রেটর হিসাবে কখনো স্ফূর্তিবোধ করেন নি। উনিশ শ সাতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র যে সব ছবি নিজে এঁকে পেশাদার তক্ষণকারদের দিয়ে ধাতুপাতে খোদাই করে ছেপেছিলেন সেগুলিতে শিশুপাঠ্য বইতে যুক্ত হবার কোনো যোগ্যতা ছিল না। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা 'টুনটুনির বই'-এর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের আঁকা 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র কুমির, শেয়াল পাশাপাশি দেখলে দেখলে বোঝা যায় উপেন্দ্রকিশোর কিভাবে বাড়তি অঙ্গভঙ্গি দিয়ে ছবিকে উপভোগ্য ও শিশুর কাছে মজাদার করে তুলেছিলেন। এই উপভোগের মজা লীয়র, ক্যরল ও সুকুমারের ইলাস্ট্রেশনে পাওয়া যায়। তবে, লেখক স্বয়ং ইলাস্ট্রেটর হলেই যে ইলাস্ট্রেশন সবক্ষেত্রে সার্থক হয়, তাও নয়। এই সার্থকতা কখনো ঘটে।

ফাল্গুন তেরো শ একুশের 'সন্দেশ'-এ সুকুমার প্রাচীন অবলুপ্ত প্রাণী টেরোড্যাকটাইল বিষয়ে "সেকালের বাদুড়" লিখেছিলেন। সাধুভাষায় লেখা হলেও সেই ভাষা ছিল সরস ও উপভোগ্য। লেখাটির শেষে এই রসিকতা ছিল যে, 'এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা...।' এর সঙ্গে সুকুমারের আঁকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সেকেলে ঐ অতিকায় বাদুড়ের নিচ দিয়ে অনুপাতে ছোটো একেলে কোট প্যান্ট পরা একজন মানুষ ছুটে পালাচ্ছে। ছবির এই নিজস্ব কমেন্ট বা মন্তব্য ছিল সুকুমারের নিজস্ব সংযোজন; এই ছিল তাঁর রূপকল্পনার বৈশিষ্ট। ফলে ঐ ছবি ইলাস্ট্রেশন হওয়া সত্ত্বেও কল্পনার এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল, যা ভাষাতীত কিন্তু চিত্রসাধ্য। তেমনি দেখা যায়, 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'র বিরাট ল্যাগুড়াথোরিয়াম্‌কে গলায় দড়ি বেঁধে অনুপাতে ছোটো একজন মানুষ টেনে নিয়ে চলেছে। কিংবা, "ভয় পেয়ো না'-য় দেখা যায়, গুহা থেকে বেরিয়ে আসা কিম্ভূত প্রাণীকে দেখে কি ভাবে ছাতা হাতে বাঙালি বাবু ছুটে পালাচ্ছেন। লক্ষণীয়, দক্ষিণারঞ্জনের রাক্ষসরাক্ষসীর মতো সুকুমারের আঁকা চরিত্রগুলি শিশুপাঠকের কাছে ভীতিপ্রদ নয়, এরা মজাদার।

সুকুমারের ইলাস্ট্রেশনের বিশেষ দিকগুলি এই যে, প্রথমত, তাঁর ছবি অবয়বনির্ভর; অবয়বের চারিত্রিক বিশেষত্ব বা মজাদার ভঙ্গি প্রকাশ করা তাঁর লক্ষ ছিল। অবযব ও আনুষাঙ্গিক বস্তু বা রূপ ছাড়া কোনো বাড়তি বাহুল্য তাঁর ছবিতে নেই, ফলে পাঠক-দর্শকের মনোযোগ লক্ষভ্রষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, শৈলীগত কোনো বিশেষত্ব ও ম্যানারিজম্‌ না থাকলেও তাঁর আঁকা চরিত্রগুলির ব্যঞ্জনা তাঁর এতই নিজস্ব ছিল যে অস্বাক্ষরিত ছবিতেও ইলাস্ট্রেটর হিসাবে তাঁকে চিনে নিতে ভুল হয় না। তৃতীয়ত, তাঁর কিছু ইলাস্ট্রেশন দেখলে মনে হয় যে, হয়তো লেখার আগেই ছবিটি কল্পনায় এসেছিল এবং লেখা এসেছিল ছবির পরিপূরক হিসাবে। এর কারণ হয় তো এই যে, নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে তিনি বহুক্ষেত্রেই বাড়তি কল্পনার প্রশ্রয় দিতেন যার ফলে লেখার অনুষঙ্গ সত্ত্বেও ইলাস্ট্রেশনগুলি আলাদা ভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠতো। এ ধরণের উপভোগ্যতা পরবর্তীকালে নন্দলাল বসুর করা রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগের ইলাস্ট্রেশনে পাওয়া যায়; 'সহজ পাঠের' ছবিগুলি সহজপাঠের বাক্যাংশের অনুষঙ্গ ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ্য। চতুর্থত, নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে তিনি যত স্ফূর্ত, স্বাধীন ও সাবলীল, অপর কোনো কোনো লেখকের লেখার ইলাস্ট্রেশনে সব ক্ষেত্রে সেই গুণ বজায় থাকে নি; কোনো কেনো ক্ষেত্রে ঐ লেখকের বর্ণনাকে তিনি লক্ষ্মণের গন্ডীর মতো অলঙ্ঘনীয় মনে করেছেন। পঞ্চমত, নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে রীতির রকমফের না থাকলেও অপর লেখকের লেখার ইলাস্ট্রেশনে তিনি ঐ সব লেখার মেজাজ অনুসারে কখনো রীতির রকমফেরও ঘটিয়েছেন, যার ফলে সেই সব রকমফেরতা ইলাস্ট্রেশনে তাঁকে সবসময় চেনা যায় না। ষষ্ঠত, 'সন্দেশে' যখন তাঁর লেখাগুলি ছাপা হয় তখনকার ইলাস্ট্রেশনগুলি তিনি ঐ লেখাগুলির সঙ্গে ব্যবহার না করে 'আবোল তাবোল' বইয়ের জন্য নূতন করে ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন, যার ফলে তাঁর একই লেখার দু'ধরণের ইলাস্ট্রেশন পাওয়া যায়। এর পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। 'সন্দেশে' ছবি ছাপা হয়েছিল হাফটোনে কিন্তু 'আবোল তাবোলে' ছবি ছাপা হয়েছিল লাইন ব্লকে। এ কারণে তাঁকে ইলাস্ট্রেশনগুলি নূতন করে করতে হয়েছিল। এ ছাড়া, হয় তো 'আবোল তাবোলে' অন্তর্ভুক্তির আগে যেমন তিনি লেখাগুলির পরিমার্জনা করেছিলেন তেমনি ইলাস্ট্রেশনের ব্যাপারেও একই পরিমার্জনা বা অন্য সম্ভাবনার

প্রয়োজন তিনি বোধ করে থাকবেন।

আশ্বিন তেরো শ একুশের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত তাঁর লেখা 'ভাবুক সভা'র সঙ্গের ইলাস্ট্রেশনে দেখা যায় পূর্ণিমা রাতে জলের উপর নুয়ে পড়া ডালে পেনসিল ও 'চাঁদ' লেখা খাতা হাতে চশমা চোখে উসকুখসকু চুল চন্দ্রাহত ভাবুক বসে ভাবছে; তার উড়ুনির একটি প্রান্ত নিচে, একটি প্রান্ত উপরে ডানার মতো উড়ছে। অবশ্য "ভাবুক সভা" শিশুপাঠকের জন্য লেখা হয় নি এবং এই কবিতায় কেউ কেউ সরাসরি জীবন্ত চরিত্রও হয়তো দেখতে পান। "ভাবুক সভা" প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে পরশুরামের রচনায় ও যতীন্দ্রকুমার সেনের ইলাস্ট্রেশনে এ ধরণের চরিত্রের সাম্য হয়তো দেখা যায়। তবে "ভাবুক সভা" নাট্যকাব্যের আস্বাদন যেমন ঐ ইলাস্ট্রেশনে নূতন মাত্রা পেয়েছে, তেমনি নাট্যকাব্যের অনুষঙ্গ ছাড়াও ছবিটির উপভোগ্যতা রয়েছে। এ ভাবে, ইলাস্ট্রেশন হিসাবে আঁকা তাঁর কিছু ছবি লেখা থেকে বিযুক্ত হয়েও অর্থপূর্ণ থেকে যায়, যা সাধারণ ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কদাচিৎ ঘটে থাকে। "বুঝবার ভুল" কবিতায় কমিক স্ট্রিপের মতো যে ভাবে তিনটি ছবি পর্যায়ক্রমে গ্রন্থিত, তা দেখে মনে হয় কবিতার ভাবনার আগেই ছবি তাঁর কল্পনায় এসেছিল এবং যদিও প্রতিটি ছবির নিচে ছাপা দুটি করে পংক্তি ছবির বর্ণনাকে বলীয়ান করে তত্রাচ ঐ কবিতা ছাড়াও ছবির অর্থ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। একই কথা 'ফস্‌কে গেল' কবিতার সঙ্গে আঁকা ছবি দুটি সম্বন্ধে বলা যায়। বস্তুত পক্ষে, সাধারণ ইলাস্ট্রেশনের মতো এই বিশেষ ইলাস্ট্রেশনগুলি বিচ্ছিন্ন বা খন্ডিত বর্ণনা নয়, গোটা লেখাই এখানে চিত্রভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে সুকুমার কখনো অতিরিক্ত ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনায় চলে গেছেন। এই প্রসারণ তাঁর ইলাস্ট্রেশনকে কখনো স্বনির্ভর করেও তুলেছে। বাক্-প্রতিমা ও চাক্ষুষ-প্রতিমা একে অপরের পরিপূরক হয়েও চাক্ষুষ-প্রতিমা কখনো অন্য মাত্রা পেয়েছে। নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেই তিনি এই স্বাধীনতা দেখিয়েছিলেন। মনে হয়, কিছু ছবির রূপকল্পনাকে লেখা অনুসরণ করেছে আবার কিছু ছবি বাক্-প্রতিমার অতিরিক্ত অন্য তাৎপর্যেও চলে গেছে। "ছবি ও গল্প" কবিতার নামেই ছবির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমেই তিনি বলেছেন 'ছবির টানে গল্প লিখি...' এবং পরীক্ষার গোল্লা, ছানাবড়া চোখ, হাঁড়িপানা মুখ, রেগে আগুন, পিটিয়ে তুলো ধোনা, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলা, বুক ফেটে যাওয়া, চোখের জলে ভাসা, আহ্লাদে আটখানা-তে শব্দ-প্রতিমার অ্যাবসার্ডিটি সুকুমার আক্ষরিক অর্থে দেখিয়েছিলেন। বাঙলা বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে এই সরসতা ছিল অভিনব। আষাঢ় তেরো শ ছাব্বিশের 'সন্দেশ'-এ 'দাঁড়ের কবিতা'-র রঙীন ইলাস্ট্রেশনে দেখা যায়, লাল দেয়ালের উপর বসে থাকা পাখি আর নিচে দাঁড়ে বসে থাকা পায়ে শেকল বাঁধা মানুষ। এই ছবিটি কবিতার হুবহু বিবরণ না-হলেও কবিতাটির সঙ্গে সমঞ্জস। এতদারিক্ত, কবিতার অনুষঙ্গ ছাড়াও ঐ ছবি পাঠকের কাছে অন্য ইঙ্গিত বহন করে। "কানে খাটো বংশীধর" যে জুতোর তলায় বেড়ালের লেজ চাপা দিয়ে উপরন্তু ছাতার ডগা দিয়েও খোঁচাচ্ছে এ কথা কবিতাতে ইঙ্গিতে বলে ইলাস্ট্রেশনে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। ইলাস্ট্রেশন এখানে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এমনকি, কবিতা থেকে বিযুক্ত করেও ছবির মজা পাওয়া যায়। 'আবোল তাবোল' কবিতার চিত্ররূপ কল্পনায় কবিতার কথার অতিরিক্ত এক ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, যা কবিতার মর্মকে প্রসারিত করে। এই চিত্ররূপ লেখক ছাড়া অন্য ইলাস্ট্রেটরের পক্ষে সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। ইলাস্ট্রেশনে দেখা যাচ্ছে টেবিলের মতো ভূমন্ডলে বই কাগজ স্কেল কম্পাস নিয়ে

তত্ত্বজ্ঞানী চশমা কপালে তুলে উপর দিকে তাকিয়ে আছেন আর আকাশে ফুলফোটা খেয়াল স্রোতে চিরকালের নবীন শিশু ভেসে চলেছে। এই তত্ত্বজ্ঞানী যিনি জাগতিক তত্ত্বে বাঁধা আর এই নবীন শিশু যে কোনো বন্ধন মানে না, এরা দুজন সুকুমারেরই দুই সত্তার প্রক্ষেপন। এই কবিতা ও এই ইলাস্ট্রেশন সুকুমারের মৃত্যুর আগের প্রিমনিশন বা পূর্বজ্ঞাদের মতো। শিশুপাঠক এই কবিতায় ও ছবিতে এক ধরণের মজা পায়, কিন্তু বয়স্ক পাঠক তাঁর শৈশবের অনুভবের স্তর পেরিয়ে এর গভীর তত্ত্বে পৌঁছন। এই রূপকধর্মিতার কারণে সুকুমারের আপাত, শিশুপাঠ্য বহু কবিতা ও সঙ্গের ছবি কোনো বিশেষ বয়সের উপভোগ্যতায় বাঁধা পড়ে না।

নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে যে স্ফূর্তি ও স্বাধীনতা তিনি দেখিয়েছিলেন, অন্য লেখকের লেখার ইলাস্ট্রেশনে সব সময় সেই স্ফূর্তি ও স্বাধীনতা তিনি দেখাতে পারেন নি। হয় তো সেই স্বাধীনতা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগ্রহায়ন তেরো শ একুশের সন্দেশে অস্বাক্ষরিত রচনা "জন্তুর পরিচয়ে" তাঁর আঁকা বাঘ ও শেয়ালের ছবি ছিল স্বভাবধর্মী। ঐ বছরের মাঘের সন্দেশে চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা 'খুকুর লেখা'র সঙ্গে সুকুমারের আঁকা খুকুর ছবিও স্বভাবধর্মী। ফোটোগ্রাফিক ভিউপয়েন্টে খুকুটিকে দেখার দরুণ এর স্বভাবধর্মিতা যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি যে ফোটোগ্রাফার ছিলেন তা ছবিটির এই অভিনব দৃষ্টিকোণ্ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বৈশাখ তেরো শ একুশের সন্দেশে 'কৃষ্ণ মহাদেবকে জৃম্ভন অস্ত্র মারিয়াছেন', চৈত্র তেরো শ ছাব্বিশের সন্দেশে 'এহি ভিক্ষা', মাঘ তেরো শ সাতাশের সন্দেশে 'ঋতবাক মুনির শাপে রেবতী নক্ষত্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল' প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়ের ইলাস্ট্রেশনে সুকুমার অবনীন্দ্রনাথের ঘরানার অনুসরণ করেছিলেন। এগুলিতে যাত্রার ঢং ও দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক বিষয়ের ইলাস্ট্রেশনে যে তিনি আদৌ স্ফূর্তিবোধ করেন নি, তা বোঝা যায়। এই ছবিগুলি তাঁর নিজস্ব রীতি থেকে দূরে। অপর পক্ষে, যে লেখকের লেখায় তিনি তাঁর নিজের মেজাজের সাম্য দেখেছিলেন, সেগুলির ইলাস্ট্রেশনে তিনি কল্পনা ও স্ফূর্তি দেখিয়েছিলেন। বৈশাখ তেরো শ ছাব্বিশের সন্দেশে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুঁড়ে রাম' গল্পের কুঁড়েরামের পিঠে গাধা বয়ে নিয়ে চলার ইলাস্ট্রেশনে মজাদার ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। ঐ বছরেরই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সন্দেশে মোহনলালের "কাক ও বেঙ" গল্পের ইলাস্ট্রেশনে কাকের বিরাট হাঁ ও পা দিয়ে ব্যাঙ চেপে ধরার ভঙ্গিও অত্যন্ত মজাদার। তেরো শ ছাব্বিশে প্রিয়ম্বদা দেবীর ধারাবাহিক গল্প 'পঞ্চুলালে'র ইলাস্ট্রেশন সুকুমার করেছিলেন। এই গল্পে কুকুরের শেকল গলায় মানুষ, মানুষের পোষাক পরে হেঁটে যাওয়া পাখি, মোমবাতি মাথায় শামুকের দরজা খোলা প্রভৃতি ইলাস্ট্রেশন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের পরাবাস্তববাদী চিত্রকার হিয়েরোনিমাস্ বশের ছবির কল্পজগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। তেরো শ সাতাশের সন্দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা'র ইলাস্ট্রেশন সুকুমার করেছিলেন। এতে রয়েছে হালি শহরের অর্থাৎ হাল শহরের কলকাতার একটি কাল্পনিক মানচিত্র। শিশুর ভূগোল জ্ঞানের মতোই এই মানচিত্র সিংহিবাগান, শিকদার বাগান, মনোহর পুকুরে গলাগলি; জানবাজার, মুরগিহাটা, পাতিপুকুর, আলিপুরে হাত ধরাধরি। কোমপানি বাগানে মানুষ ওড়া গ্যাস বেলুন ও কেল্লার তোপ যেমন দেখা যাচ্ছে, সেইসঙ্গে পটলডাঙ্গার আকার পটোলের মতো, পাতিপুকুরের আকার পাতিহাঁসের মতো, মুরগিহাটার সরহদ মুরগির মতো, বেনেপুকুর যেন ষষ্ঠীপুজোর ময়দার পুতুলকৃতি আর মেছোবাজারের চৌহদ্দি মাছের মতো। এ ছাড়া যাত্রার নারদ, নারদের প্রবেশ, সোনাতোন প্রভৃতি ইলাস্ট্রেশনেও গল্পের

বর্ণনাতিরিক্ত সংযোজন দেখা যায়। মোহনলাল গঙ্গাপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় তিনি যে মজা পেয়েছিলেন ইলাস্ট্রেশনে সেই মজারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। পৌরানিক বিষয় কিংবা যে লেখায় কল্পনার অবকাশ নেই, এমন সব লেখার ইলাস্ট্রেশনে তিনি স্বস্তি বোধ করেননি এবং বহুক্ষেত্রেই তাঁর ছবি আড়ষ্ট।

তাঁর নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনেও চরিত্রের মজাদার ভাবভঙ্গি ও বিসংগতিমূলক বৈশিষ্টের উপর তিনি জোর দিতেন। "কাঠবুড়ো", গোঁফচুরি", "খুড়োর কল", "লড়াই ক্ষ্যাপা", "ছায়া বাজি", "কুমড়োপটাশ", "সাবধান", "বোম্বাগড়ের রাজা", "ভুতুড়ে খেলা", "হাত গণনা", "কাতুকুতু বুড়ো", "হাতুড়ে", "চোর ধরা", "নোট বই" প্রভৃতি কবিতার ইলাস্ট্রেশনে অবয়বের বৈশিষ্টকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; অবয়ব ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আঁকা হয়নি। দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য ঠিক যেটুকু প্রয়োজন তার বাড়তি প্রসঙ্গ নেই, যদিও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবয়বে কবিতার বর্ণনার অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা যুক্ত করা হয়েছে। এদিক থেকে তাঁর ছবি লীয়র ও ক্যারলের কাছাকাছি। এঁদেরই মতো সুকুমার তাঁর ইলাস্ট্রেশনে কমিক্যাল সিচুয়েশন বা মজাদার উপস্থপনা করেছিলেন ভাবভঙ্গি, বিসংগতি ও বৈশিষ্টের ভিত্তিতে। বৈশাখ তেরো শ একুশের 'সন্দেশ'-এ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বর্ণপরিচয়ের বর্ণগুলিকে সুকুমার এঁকেছিলেন মানুষ ও পশুপ্রাণীর নানা মজাদার ভঙ্গিতে। বর্ণমালাকে তিনি নিষ্প্রাণ নক্শা হিসাবে না দেখে দেখেছিলেন জীবন্ত অভিব্যক্তি হিসাবে যাতে শিশুর চোখে বর্ণমালা ধ্বনি-অনুষঙ্গের অতিরিক্ত এক মজাদার ব্যঞ্জনায় আকর্ষক হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে লক্ষনীয় যে, 'সন্দেশ'-এ বিদেশি ইলাস্ট্রেটরের ছবি ইংরাজি পত্র পত্রিকা থেকে ছাপা হতো। মাঘ তেরো শ উনত্রিশের 'সন্দেশ'-এ এম মরিস্-এর একটি ছবি ছাপা হয়। 'ও আবার কে রে' শীর্ষক ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পাইপ মুখে কাকতাড়ুয়া হাসছে, কাকতাড়ুয়ার এক হাতে বসা পাখি, নিচে বিস্মিত কুকুর, বেড়াল। বৈশাখ তেরো শ ত্রিশের 'সন্দেশ'-এ ফ্র্যাঙ্ক হার্ট-এর আঁকা দুটি ছবির একটিতে দেখা যাচ্ছে, জিরাফ গলা তুলে গাছের উপর ছানাসহ সারস পাখিকে দেখছে, দুটো বাঁদর বসে আছে আর হ্যামকে দোল খাচ্ছে বাঘের বাচ্চা। অন্য ছবিতে শেয়াল বই পড়ছে, বাঘ ঝুঁকে দেখছে। মনে হয়, এই মজাদার ছবিগুলি সুকুমারই ছাপার জন্য বেছেছিলেন। এ হেন মজাদার পরিস্থিতির কিছু ছবি সুকুমারও এঁকেছিলেন। শ্রাবণ তেরো শ ত্রিশের 'সন্দেশ'-এ 'এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে' অবলম্বনে তিনি এ হেন মজাদার এক পরিস্থিতি কল্পনা করেছিলেন। এক্কাগাড়ি থেকে থেলো হুঁকো হাতে বুড়ো আর খোকা ছিটকে পড়েছে। ছিটকে পড়েছে কুঁজো, ছাতা, লণ্ঠন। ব্যাঙ ভয়ে পালাচ্ছে, কাক পালাচ্ছে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটছে। মনে হয়, বিলাতি ছবির প্রেরণাতেই সুকুমার এই ধরণের ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন। 'সন্দেশে'র প্রচ্ছদের জন্যও তিনি এ ধরণের মজাদার ছবি এঁকেছিলেন।

'সন্দেশ'-এ প্রকাশকালে 'আবোল তাবোল'এর কবিতাগুলির সঙ্গে যে সব ইলাস্ট্রেশন ছাপা হয়েছিল, সেগুলি তিনি 'আবোল তাবোল' বইতে ছাপেন নি। বইয়ের জন্য তিনি নূতন করে ছবি এঁকেছিলেন। এই দুইপ্রস্থ ইলাস্ট্রেশন দু ধরণে আঁকা হয়েছিল। 'সন্দেশ'-এর ইলাস্ট্রেশনগুলি ছিল সূক্ষ্ম রেখা ও হাফটোনের বিভিন্ন পর্দাবিন্যাসে আঁকা, আলোছায়ার মাত্রার তারতম্য তাতে উপস্থিত ছিল। এ ছাড়া হ্যাচিং বা সূক্ষ্মরেখার জাল দিয়ে ডৌল ও ঘনত্বের আভাসও তাতে ছিল। ছবিগুলি ছিল আয়তাকার। সরু রেখার ঘের দিয়ে ছবির আয়তক্ষেত্র নির্দিষ্ট ছিল। এই সীমায়িত আয়তাকৃতি ও হাফটোনের ব্যবহারের দরুণ ছবিগুলিতে ফোটোগ্রাফিক আবহ তৈরি হয়েছিল।

'আবোল তাবোল' বইয়ের জন্য নূতন করে আঁকতে গিয়ে সুকুমার ছবিগুলির অবয়বে ও ভঙ্গিতে যেমন পরিবর্তন ঘটালেন, সেই সঙ্গে হাফটোন বর্জন করে আঁকলেন অপেক্ষাকৃত মোটা, খস্‌খসে ও স্পৃশ্যগুণসম্পন্ন রেখা দিয়ে। হাফটোনের সঙ্গে কিছু ছবির চারপাশের আয়তক্ষেত্রের রেখার ঘের বর্জন করলেন। এবারের ছবি হল লাইন ব্লকের উপযোগী। আগের ছবিতে ছবির স্পেস্‌ বা জমি আয়তাকার ও রেখার ঘের দিয়ে চিহ্নিত ছিল। এবারে আয়তাকার ও রেখার ঘের উঠে যাওয়ায় বইয়ের গোটা পাতাই হল ছবির স্পেস্‌। আগের ছবি লেখার সঙ্গে আলাদা অংশ হিসাবে ছিল, এবারের লে-আউটে সীমার বন্ধনমুক্ত ছবি ও ছাপা কবিতায় মেশামেশি ভাব তৈরী হল।

এই পরিবর্তনের ফলে আমরা দেখি, মাঘ তেরো শ একুশের 'সন্দেশ'-এ 'খিচুড়ি' কবিতার সঙ্গে একটি পাতায় আটটি খিচুড়ি-জন্তুর ছবি সূক্ষ্মরেখাসহ হাফটোন ছাপা হয়েছিল। 'সন্দেশ'-এ "জিরাফড়িং"-এর পাখা খুলে ওড়ার ভঙ্গি ছিল, 'আবোল তাবোল'-এর ছবিতে পাখা বন্ধ। বিছাগলের মুখ ছিল ডানদিকে, সামনের পা ছিল ছাগলের। বইতে মুখ বাঁ দিকে, ছাগলের পা আদৌ নেই। বইয়ের জন্য খিচুড়ি-জন্তুগুলি আলাদা আলাদাভাবে হাফটোনবর্জিত মোটা রেখায় আঁকা। পরের মাসের 'সন্দেশে' ছাপা "কাঠবুড়ো"র ছবিতে কাঠবুড়োর সামনে জমিতে যে ছককাটা ছিল, বইয়ের ছবিতে তা নেই। পরের মাসের 'সন্দেশ'-এ "গোঁফচুরি"র সঙ্গের ছবিতে হেড অপিসের বড়োবাবুর চেয়ার থেকে উলটে পড়া অবয়বের চারপাশে আয়তাকার সূক্ষ্ম হাফটোনের জমি ও সেই জমির চৌহদ্দিতে সরু রেখার ঘের ছিল। আবার উপরদিকে বড়োবাবুর শূন্যে তোলা হাত দুটি সেই রেখার সীমার বাইরে ঠেলে দেওয়ার ফলে, টেলিভিশনের পর্দা ঠেলে যদি হাত বেরিয়ে আসে তাহলে যে মজা হয়, তেমনি মজা ঐ ছবিতে ছিল। বইয়ের ছবিতে হাফটোন ও আয়তাকার সীমা বাদ দেওয়ায় এই বাড়তি মজা পাওয়া যায় না। বৈশাখ তেরো শ বাইশের 'সন্দেশ'-এ "লড়াই ক্ষ্যাপা'র ছবি ছিল হাফটোনে এবং লড়াই ক্ষ্যাপাকে দু হাত দিয়ে ছাতা দিয়ে গুঁতোতে দেখা গিয়েছিল, ছাতা ছিল তার ডান দিকে। কিন্তু বইতে ছাপা লাইন ব্লকে লড়াই ক্ষ্যাপা বাঁ হাতে বাঁ দিকে ছাতা তুলে অন্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তুলনায় 'সন্দেশ'-এর ইলাস্ট্রেশনে লড়াই ক্ষ্যাপার ভঙ্গির ব্যঞ্জনা অধিকতর। ঐ বছরের জৈষ্ঠে ছাপা 'কাতুকুতু বুড়ো'র ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আবক্ষ কাতুকুতু বুড়ো ও খালি গা, সামনের দিকে দু হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়ে থাকা আবক্ষ ছেলে দুজনেরই মাথা প্রায় সমান। বইয়ের ছবিতে দুজনকেই আপাদমস্তক দেখানো হয়েছে। ছেলেটি বুড়োর চেয়ে মাথায় বেশ ছোটো, ছেলেটির গায়ে জামা ও হাত দুটি পেছন দিকে রাখা। ভাদ্র তেরো শ তেইশের 'সন্দেশ'-এ "হাতুড়ে"-র ছবিতে বিভিন্ন পর্দার হাফটোন ছিল, ছবির চারপাশে আয়তাকার, রেখা ঘেরা ক্ষেত্র ছিল। হাতুড়ের ডান হাতে ছিল হাতুড়ি, বাঁ হাতে ছুরি, টেবিলে কাঁচি, পুতুলের মতো কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পিছন দিকে ঝুলতে দেখা যাচ্ছিল। একটা আস্ত কারখানার পরিবেশ তাতে ছিল। বইয়ের ছবি আমূল পরিবর্তিত। এটি হাফটোন বর্জিত লাইনব্লকের উপযোগী করে আঁকা। এতে দেখা যাচ্ছে, টেবিলে কাটা ছেঁড়া কাগুজে রোগীকে হাতুড়ে ডান হাতে চেপে ধরেছে, তার বাঁ হাতে কাঁচি, টেবিলে আঠার পাত্র, ছুরি, স্কেল, হাতুড়ি ইত্যাদি।

লীয়রের লিমেরিক, ক্যারলের এলিসের আজব দেশ ও সুকুমারের কবিতার কলাজগতে এবং এঁদের তিনজনের ছবিতে আমাদের চোখে সাম্য ধরা পড়ে। এই দুজন ইংরাজ লেখক, ইলাস্ট্রেটর

নানাভাবে সুকুমারকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; একই ভাবতরঙ্গ সুকুমারের মধ্যেও আমরা লক্ষ করেছি। ক্যারলের 'গ্রাইফন্' নামক হলেও-হতে-পারতো জোড়কলম জীবটি সুকুমারের "খিচুড়ি" ও "হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরির" জোড়কলম জীবগুলির সমগোত্রীয়। আবার সুকুমারের "কুমড়ো পটাশ"-এ বাদুড়ের মতো ডালে ঝোলা মানুষটি লীয়রের ছবির ডালে ফুটে ওঠা বাদুড়ের মতো মানুষগুলির সমগোত্রীয়। সুকুমারের কল্পনার জোড়কলম জীবের অস্তিত্ব লীয়রের কল্পনায় সাম্য পেয়েছে। ক্যারলের 'গ্রাইফন' আর সুকুমারের 'কিম্ভূত'-এর মিল কাকতালীয় নয়। গ্রাইফনের মুখ শিকারী পাখির মতো, এর ডানাও আছে, কানও আছে। আবার শরীরের বাকি আধখানা সিংহের মতো, থাবা ও লেজও তাই। সুকুমারের 'কিম্ভূত'ও গড়ে উঠেছে পাখি ও পশুর জোড়কলমে। লক্ষণীয় যে, ক্যারল ও সুকুমারের সবকটি জোড়কলম জীবই খুব নিরীহ; এদের চেহারা ভীতি উদ্রেক করে না, শিশুর কাছে মজাদার জীব হিসাবে এরা দেখা দেয়। প্রতীক ও রূপকের খাতিরে অ্যানিমেল মোটিফের ব্যবহার সুপ্রাচীন। অবশ্যই সুকুমারের জোড়কলম জীবগুলি নিছক মজাদার কল্পনাই নয়। তাঁর কিছু পশু-রূপকের মধ্যে মানব চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। কিছু পশু-রূপকের বিচিত্র নামেও তা স্পষ্ট। ফরাসি বিজ্ঞানী জর্জেস কুভিয়েরের ক্যাটাস্ট্রফি তত্ত্বে বিবর্তনের পর্যায়ে হলেও-হতে-পারতো যে জীবসমূহের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল, বিজ্ঞানের ছাত্র সুকুমার অবশ্যই সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। সুকুমারের জোড়কলম ও অদভূত জীবের কল্পরূপে এই তত্ত্বের ইঙ্গিতও হয়তো ছিল। 'হ-য-ব-র-ল'র কাক, ছাগল, কুমির, বেড়ালের মধ্যেও তিনি মানুষের অ্যানিমেশন এনেছিলেন। শিশুর কল্পনায় প্রাণীমাত্রেই মানুষের ক্ষমতাসম্পন্ন, এই কথাও হয়তো সুকুমারের মনে ছিল। সুকুমারের কল্পজগতের আচ্ছাদনের আড়ালে আমরা চেনা জগতকেই নূতন তাৎপর্যে দেখি। লেখায় যেমন তিনি গল্পচ্ছলে এক একটি বিশেষ পরিস্থিতি রূপের মোড়কে পরিবেশন করতেন তেমনি ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও নিছক গল্পের নিঃশর্ত অনুসরণ না করে এক একটি চিত্রভাষায় সপ্রাণ পরিস্থিতি চাক্ষুষ করানো তাঁর লক্ষ ছিল। এখানেই তাঁর সঙ্গে পেশাদার অন্যান্য ইলাস্ট্রেটরদের তফাৎ ছিল। তাঁর ইলাস্ট্রেশন ঘটনাক্রমের খণ্ডিত মুহূর্তকে না দেখিয়ে ঘটনার পুরো আভাস দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ইলাস্ট্রেশনে যা অসম্ভব মনে হয়, শিশুর কাছে তা আদৌ অসম্ভব ঠেকে না, কেন না শিশুর কল্পনায় অসম্ভব বলে কিছু নেই। চিত্রকারের কল্পনায়ও অসম্ভব বলে কিছু নেই। যদি থাকতো, তাহলে প্রতীকের সৃষ্টি হতো না, তাহলে শিল্পসৃষ্টি হতো না। 'শিল্পে অত্যুক্তি" প্রবন্ধে সুকুমার বলেছিলেন, 'প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে' অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতকে নিঃশর্তভাবে 'শিল্পে ব্যক্ত' করাকেই শিল্পী যদি যথেষ্ট মনে করেন, তবে শিল্পের বক্তব্য 'অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ' থেকে যায়। চাক্ষুষকে অনুকরণ না করে সুকুমার এমন এক পরাবাস্তবকে চাক্ষুষ করিয়েছিলেন, যে পরাবাস্তবের জন্ম বাস্তবতা থেকে।

সরস লেখার ভিতর দিয়ে সুকুমার নবীন বয়সি পাঠকদের আনন্দ, কল্পনার বেগ ও চিন্তার খোরাক জোগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইলাস্ট্রেশনেরও লক্ষ ছিল আনন্দের ভিতর দিয়ে শিশুমানসে কল্পনার উদ্দীপন ঘটানো ও সৃজনশীলতাকে উজ্জিয়ে দেওয়া। এই কাজে সুকুমার ভাবালুতা ও অলঙ্করণ সংগত কারণেই বর্জন করেছিলেন। ভাবালুতা কল্পনাকে নিরুদ্ধ করে, অলঙ্করণ কল্পনাকে শিথিল করে। এ কারণে অপ্রয়োজনীয় রূপের বাহুল্য কিংবা গৌণ সাজসজ্জা তাঁর

ছবিতে দেখা যায় না। উপরন্তু, তাঁর ইলাস্ট্রেশন বহুক্ষেত্রেই লেখার অনুষঙ্গমুক্ত, স্বনির্ভর হয়ে দেখা দিলেও যুগলভাবে লেখা ও আঁকায় পরস্পরের অনুপূরণ ঘটেছে।

সুকুমার চিত্রবিদ্যায় ছিলেন স্বশিক্ষিত। প্রথাগত আর্ট স্কুলে শারীরবিদ্যা না শেখার দরুণ তাঁর আঁকা স্বভাবানুসারী ছবিতেও এক ধরণের নাইভ চার্ম লক্ষ করা যায়। কোনো বিশেষ প্রথার কাছে দায়বদ্ধ না থাকার কারণেই হয়তো রেখা দিয়ে তিনি খেলাচ্ছলে যা রূপ দিতে পেরেছিলেন, পেশাদার চিত্রকারের সতর্কতায় তা সম্ভব হতো না।



শিল্পী ডি রাধাকৃষ্ণন

সুকুমার রায় ও তাঁর গান

বিশ্বজিৎ রায়

বাঙলার উনবিংশ শতকের নব জাগরণের সম্ভবত শেষ সার্থক প্রতিনিধি সুকুমার রায় যে সাহিত্য এবং অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গীতকেও তাঁর শিল্প-চর্চার অঙ্গ করে তুলবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? এক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক এবং ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টিমুখী সঙ্গীতচর্চা তাঁকে যে কিছুটা উদ্দীপ্ত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। "জাগো পুরবাসী" বলে উপেন্দ্রকিশোরের যে ব্রহ্মসঙ্গীতটি অর্ধশতাব্দীর-ও বেশী সময় ধরে বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালীদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে তেমনি সুকুমার রায় রচিত একটি বিবাহ-বিষয়ক ব্রাহ্মসঙ্গীত-ও বহু দশক ধরে বহু বিবাহানুষ্ঠানকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে বহুজনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই গানটি হচ্ছে — "প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে"। এই গানের সুরটি রবীন্দ্রনাথের "ছিল যে পরাণের অন্ধকারে" গানটির অনুসারী। এতে এক ঈশ্বরবিশ্বাসী সৎ ব্রাহ্ম যে দৃষ্টিতে বিবাহের অনুষ্ঠানটি দেখেন তার চমৎকার কাব্যিক পরিচয় পাওয়া যাবে। সুকুমার রায়ের কাছে ব্রহ্মসঙ্গীত যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল — তাঁর পুত্রের কিছু কিছু সঙ্গীত রচনার সঙ্গেও ব্রহ্মসঙ্গীতের যোগসূত্র পাওযা যায় — তার কারণ তিনি ছিলেন গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত এবং বিশ্বাসী ব্রাহ্ম। "অতীতের ছবি" কবিতাতে তাঁর মনের এই দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত।

কিন্তু সুকুমার রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের দিকে বিশেষ না গিয়ে এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের গান রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অবশ্য তিনি পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী বাঁচলে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা কোন দিকে যেত তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর যা গান রয়ে গেছে তার প্রায় অধিকাংশই হচ্ছে হাস্যরসাত্মক এবং তাঁর নাটকের।

সুকুমার রায়ের এই গানগুলি প্রধানত লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের। তাছাড়া শব্দকল্পদ্রুম এবং ঝালাপালা-তেও কিছু গান আছে, আর গানের মজার ব্যবহার আছে। শেষোক্ত দিকটি ঝালাপালা-র কেবলচাঁদ ওস্তাদের সুর ভাঁজা এবং হায়রে সোনার ভাবত দিয়ে সুরু করা গানের চেটার মধ্যে লক্ষিত হয়। তবে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে-ই সুকুমার রায় বেশ কয়েকটি সম্পূর্ণ গান যুক্ত করেন।

এই গানগুলি কিন্তু নাটকের কথোপকথন এবং অ্যাকশনেরই অন্তর্গত। কমিক অথবা অন্য কোন রকম রিলিফ দেওয়ার জন্য তারা নাটকে স্থান পায় নি। ফলে, গানগুলি, সুরের দিক থেকে সহজ, সরল এবং নিরলঙ্কার। অনেক জায়গায় কথোপকথনের মতো। যেমন, সুগ্রীব এবং রাবণের যুদ্ধপূর্ব আস্ফালন এবং ঝগড়া। কিন্তু দুই-এর গানই ঠিক এক ধরণের নয়। সুগ্রীবের গান চঞ্চল চারমাত্রার দ্বন্দের দেশী এবং প্রাকৃত শব্দে পূর্ণ আর সরুগলার উপযোগী। অন্য পক্ষে রাবণের গান অনেক গম্ভীর, মন্থরগতির ত্রৈমাত্রিক ছন্দের, তৎসম শব্দবহুল — যা মাঝে মাঝে বিদেশী শব্দের সঙ্গে মিলে আচমকা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে — এবং তা ভারি গলায় গাইলে খোলে।

কথোপকথনের গান সুর এবং কথার অসঙ্গতির দ্বারা খুবই হাসির ঢেউ তোলে যমদূত দুজনের দৃশ্যে।

সুকুমার রায় তাঁর গানে কোরাসের ব্যবহারও করেছেন কৃতিত্ব সহকারে।

বাঁদরদের গানের বেলা এই কোরাস নানারকম সুর নিয়েছে যদিও তাতে প্রকরণের বৈচিত্র খুব বেশী নেই। মোটামুটি প্রথম পংক্তি বা প্রথম দুই পংক্তিতে যে সুর দেওয়া হয়েছে তাই ফিরে ফিরে এসেছে পরের পংক্তিগুলিতে। সাধারণভাবেই বলা চলে যে সুকুমার রায়ের গানে কেবল অস্থায়ী আর অন্তরাই থাকে। যে যাই হোক, দূত যে গান গেয়ে রামকে সব খবর দিচ্ছে সেটিতে কোরাসের ব্যবহার বেশ অভিনব। দূত গেয়ে জানাল —

"আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল
মহা ধূমধাম মহা হট্টগোল ।।"

আর তার উত্তরে রাম এবং সভাষদবর্গ একযোগে গাইলেন — সা থেকে মা-তে গিয়ে — "ততঃকিম, ততঃকিম, ততঃকিম।"

এ-ছাড়া ঠুংরির চালে — যব ছোড় চলি লখনউ নগরী — সামনে রেখে তিনি যেমন অসাধারণ গান বেঁধেছেন বিভীষণের জন্য, তেমনি কীর্তনের সুরে সুগ্রীবের মুখে দিয়েছেন তেমনি মনে রাখার মতো রচনা। বলা বাহুল্য এই সব হাসির গানে প্রধানতঃ কথাই হাসির উদ্রেক করে আর সুর তাতে একটা নতুন মাত্রা যোজনা করে।

সুকুমার রায় তাঁর শব্দকল্পদ্রুম যখন বিচিত্রার সভায় গেয়ে, অভিনয় করে শোনান তখন যাঁরা তা সহাস্যে উপভোগ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গুরুজির গান —

"ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কই রে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে" —

শুনে রবীন্দ্রনাথ-ও সেটি গলায় তুলে নেন এবং সেই সময় বিচিত্রার কোন একজন বিশিষ্ট সদস্যকে আসতে দেখে আঙুল দেখিয়ে গেয়ে ওঠেন — "ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে"।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি খবর দেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে একদা বর্ষামঙ্গলের মতো ভরসামঙ্গল হয়েছিল যাঁরা পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে গানের দলে স্থান পান নি তাঁদের জন্য। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি হাসির গান রচনা করেন আর সেই সঙ্গে সুকুমার রায়ের "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা"-তে সুর দেন। বাউল ঢং-এর সুরে বসানে গানটির শেষে লয়ের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে আর কথোপকথনের ভঙ্গী এনে এতে রবীন্দ্রনাথ সুর বচনার এক নূতনত্বের পরিচয় দেন।

সুকুমার রায় রচিত দুটি ব্রহ্মসংগীত

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুররাগে জীবন মাঝে।
নীরব গানে গানে, পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে অরূপ সাজে।
প্রেম-তৃষিত সুন্দর অরুণ-আলো
হৃদয়নিভৃতদীপে জ্বালো রে জ্বালো।
পুণ্য-মধুর-ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে ॥

সুর : 'ছিল যে পরাণের অন্ধকারে' (রবীন্দ্রসংগীত)

নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়

নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়,
জীবনের আকুল স্রোতে অকুল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারা সেই প্রেমেরই পরশ বাজে
সে প্রেমের ঝরণা ঝড়ে এই প্রেমেরই বসের ধারায়,
নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।
আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপনতলে।
যে প্রেমেব ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
যে প্রেমের তবঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন প্রেমিকের প্রেম জাগে রে এমন লীলায়,
নিখিলেব আনন্দগান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।

সুর : 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে" (রবীন্দ্র সংগীত)

মুদ্রণ-বিশারদ সুকুমার

সিদ্ধার্থ ঘোষ

১০০ গড়পার রোডের সেই ঐতিহাসিক বাড়ির উপর অনেক ঝড় বয়ে গেছে, তবু আজও রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক তলা ও দো তলার মাঝে চোখ রাখলে সিমেন্টের মধ্যে খোদাই-করা হরফগুলো পড়া যায় :

FOUNDED ■ GRAPHIC ARTS & PHOTO PROCESSES ■ 1895

গড়পার রোডের বাড়িটি অবশ্য ১৮৯৫-এ তৈরি হয়নি। ১৮৯৫-এ স্থাপিত হয় 'ইউ রায়' নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনে। উপেন্দ্রকিশোর তখন হাফটোন ব্লক তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ব্রোমাইড এনলার্জমেন্টের কাজও করতেন। ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য এরপর সংস্থাটি ১৯০১-এ উঠে আসে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে এবং এই ঠিকানাতেই ১৯১০-এ আত্মপ্রকাশ করে 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'। ব্লক-নির্মাণের সঙ্গে প্রকাশন সংস্থা রূপেও কাজ শুরু হয়। যদিও তখনো নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। বইছাপার প্রেস সমেত প্রসেস বিভাগ ১৯১৩/১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ১০০ গড়পার রোডের নিজস্ব বাড়িতে কাজ শুরু করে। উপেন্দ্রকিশোরের কর্মক্ষেত্র গোড়া থেকেই বসতবাড়ি সংলগ্ন ছিল। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পচর্চার পরিবেশের অতিরিক্ত মুদ্রণ ও মুদ্রণ বিষয়ক গবেষণার সুবাসও তাই ঘিরে ছিল পরিবারের সকল সদস্যাকে।

১৯১১-য় মুদ্রণ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেতে পৌঁছনোর পর নভেম্বর মাসে একটি চিঠিতে সুকুমার লিখছেন, 'হাফটোন আর three colour এরা যা করে সে কিছুই নয়। দু তিনটা three colour-এর প্রুফ তুলল একটাও রঙ ঠিক হয়নি। সেইগুলোকেই touch ক'রে ব্লক করতে লাগল — আমাকে বলল প্রথম প্রুফে এর চেয়ে ভাল রঙ হয় না। আমি বল্লাম নেগেটিভ ঠিক হলে প্রায় ছবির মত প্রুফ হওয়া উচিত।'

পড়লে মনে হতে পারে হয় তাঁর পিতাকে নয়তো ভাই সুবিনয়কে বুঝি এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন সুকুমার। কিন্তু তা নয়, তাঁর মা বিধুমুখী দেবীকে চিঠিটি লিখেছিলেন তিনি।

একথা আর নিশ্চয় বলার প্রয়োজন নেই যে মুদ্রণ বিষয়ক শুধু প্রথম পাঠ নয় বিশেষজ্ঞের পাঠ সুকুমার তাঁর পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। সুকুমারের বিলেতে আগমনের আগেই হাফটোন প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে উপেন্দ্রকিশোরের আটটি মৌলিক গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছিল পেনরোজ অ্যানুয়াল-এ। মুদ্রণ জগতে যেটি 'বাইবেল' রূপে গণ্য হ'তো। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের উভয়েরই মৌলিক গবেষণার বিষয়টি ছিল হাফটোন ব্লক-নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত।

১৯১০-১১ থেকেই গড়পারে নিজস্ব বাড়ি তৈরির ও সেখানে ছাপাখানা সমেত ব্লক তৈরির বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু করেন উপেন্দ্রকিশোর। ঠিক এই সময়েই গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি

লাভ ক'রে বিলেতে এলেন সুকুমার। এবং লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে মুদ্রণ বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপেন্দ্রকিশোর তথা ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর প্রতিনিধি রূপেও কাজ করেছেন।

বিলেত থেকে পিতাকে লেখা সুকুমারের চিঠিগুলি ['এক্ষণ'-এ প্রকাশিত 'বিলেতের চিঠি' (শারদীয় ১৩৮৯) ও 'বিলেতের আরো চিঠি' (গ্রীষ্ম ১৩৯১) দ্রষ্টব্য] শুধু পিতা-পুত্রের আলাপ নয়, গবেষক ও তাঁর ছাত্রের মধ্যে, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর প্রতিনিধির মধ্যে মত ও তথ্যাদি বিনিময়। বিলেতে থাকার সময় বিভিন্ন মুদ্রযন্ত্র নির্মাণকারী সংস্থা পরিদর্শন করেন সুকুমার নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য মুদ্রযন্ত্র নির্বাচনের জন্য। এবং শেষ পর্যন্ত হার্স্টার্স-এর Brilliant IV মডেলটি কিনে পাঠান। তাছাড়া Manders Bros. থেকে প্রুফ তোলার বিশেষ কালি, গ্রস্‌ভেনার চার্টারি অ্যান্ড কোম্পানির আর্ট পেপার ইত্যাদি কিনে পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। ডিকিন্‌সন্‌স্‌ অ্যান্ড স্পাইসার ব্রাদার্স-এর আর্ট পেপার নিয়েই খোঁজখবর করেছেন। হাফটোন নেগেটিভ তৈরির জন্য প্রসেস ক্যামেরায় যে গ্লাস-স্ক্রিন ব্যবহার হতো, সে-কালে তার নির্মাতাদের মধ্যে বিখ্যাত দুটি সংস্থা Haas এবং Levy-র পণ্যের তুলনামূলক বিচারও করেছেন তিনি অর্ডার দেওয়ার আগে।

নিজেদের প্রতিষ্ঠানে অফসেট মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও সুকুমারের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিভিন্ন চিঠি থেকে। লিটন কোম্পানির ফ্ল্যাটবেড অফসেট যন্ত্রের কথা লিখছেন, লিখছেন 'মান্‌' কোম্পানি থেকে ক্যাটালগ ও কোটেশন সংগ্রহের কথা। নব উদ্ভাবিত বা সদ্য প্রবর্তিত বিবিধ মুদ্রণ কৌশল নিয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন ও ভারতীয় পরিস্থিতির বিচারে নিজস্ব সংস্থার কাজে তার মধ্যে কোন্‌টি উপযুক্ত নির্ধারণ করা ইত্যাদি দায়িত্ব তিনি বিলেতে থাকার সময় পালন করেছিলেন।

১৩২০-র বৈশাখে 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়, সুকুমার বিদেশে। 'সন্দেশ'-এর বহুপ্রশংসিত ভূমিকার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে নতুন কথা একটিই এখানে প্রাসঙ্গিক। এক অর্থে 'সন্দেশ' ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর 'হাউস-জার্নাল'ও নিশ্চয়। তার পাতায় পাতায় যত ছবি তার ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হতো গড়পার রোডের বাড়িতেই। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের সাহিত্যকৃতি শুধু নয় 'সন্দেশ'-এর পাতায় ধরা রয়েছে পিতাপুত্রের মুদ্রণবিষয়ক গবেষণার সাফল্য-কাহিনী। একটি শুধু উদাহরণ দিই। সম্ভবত 'সন্দেশ'-এর পাতাতেই এ-দেশে প্রথম photo-micrograph ছাপা হয়। মাইক্রোস্কোপের মধ্যস্থতায় ক্যামেবায় গৃহীত একটি মাকড়শার ছবি। উপেন্দ্রকিশোরের আমলে এই ছবিটি সাদায়-কালোয় ছাপা হয়েছিল। তারপর সুকুমারের সম্পাদনা কালে ছাপা হয়েছিল মাছির রঙীন ফোটো-মাইক্রোগ্রাফ।

সুকুমার যখন বিলেতে অফসেট ফোটো-লিথোগ্রাফির শৈশব। দু'রঙ ছাপার উপযোগী রোটারি অফসেট মেশিন প্রথম তৈরি করেছে George Mann & Co. ১৯১০-এ। সুকুমারের চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। তিনি বুঝেছিলেন, সূক্ষ্ম হাফটোন প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের কাজে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে খুব সুবিধা হবে না। কিন্তু 'বই' বা 'সন্দেশ' ছাপার জন্য এই পদ্ধতির উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯১৩-র ১৬ই মে তিনি লিখছেন, 'আমার মনে হচ্ছে একটা Litho Machine with letterpress attachment কেনাই বোধহয় ভাল। "সন্দেশ" আমার মনে হয় Litho ক'রে

1895-1924

We have been making half-tone blocks since 1895 by our original methods and scientific processes.

It is this experience of more than a quarter of a century, backed up by constant attention to accurate workmanship, that has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the photo-engraving world.

Our plans for the immediate future include besides extensive additions to our plant and machinery, the introduction of improved methods and appliances for working the half-tone process and also of new processes of reproduction for the highest classes of work.

U. Ray & Sons

100, GURPAR ROAD

CALCUTTA.

ছাপাই সহজ হবে — অর্থাৎ, type compose ক'রে তার থেকে litho transfer নিয়ে zinc থেকে ছাপা। ছবি direct zinc এর উপর এঁকে কিম্বা litho transfer paper-এ এঁকে transfer ক'রে নিলেই চল্‌বে — ব্লক করার চেয়ে অনেক quick, সস্তা আর সহজ হবে।'

অন্যত্র, "ছেলেদের রামায়ণ" ইত্যাদি বই যদি compose ক'রে তা' থেকে transfer ক'রে

পাৎলা zinc or aluminium-এর উপর litho ক'রে রাখা যায় আর type থেকে না ছেপে সেই Litho plate থেকে ছাপা যায় তা হ'লে প্রত্যেক edition-এ compose করার খরচ বাঁচে, type এর wear & tear বাঁচে, অথচ stereotype এর চেয়ে অনেক simple, portable, আর illustration ঢোকান যতদূর cheap আর সহজ হ'তে হয়। zinc এর উপর ছবি এঁকে বা কাগজে এঁকে transfer ক'রে দিলেই হ'ল। ছেলেদের বই, label, poster ইত্যাদি মোটা কাজে lithography থেকে খুবই সাহায্য পাওয়া যাবে। সেই জন্য আমি lithographic printing ইত্যাদি বিষয়েই এখন বিশেষ ক'রে ঝোঁক দিয়েছি।'

প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের 'ফোটোগ্র্যাভিওর' ও 'কলোটাইপ' পদ্ধতি নিয়ে হাতেকলমে কিছু গবেষণা করেছিলেন সুকুমার। ১৯১২র ৭ই জুনের চিঠিতে লিখছেন, 'কলোটাইপে screen grain introduce ক'রে দেখলাম process এত সহজ হয়ে আসে যে এ দেশে সহজেই collotype হতে পারবে।' ফোটোগ্র্যাভিওর সম্বন্ধ তাঁর অভিমত, পদ্ধতিটি সহজ, ব্লক করা কিছু শক্ত নয় কিন্তু 'মেশিন প্রিন্টিং খুব complicated তাতে ছাপতে হ'লে copper roller-এর ওপর photogravure করতে হয়'।

বিলেতে শিক্ষানবিশ পর্বে মুদ্রণ বিশারদ সুকুমারের নিজের হাতের কাজের একটি নমুণা আজো সুরক্ষিত। সুকুমারের চিঠি থেকেই তার বর্ণনা দিচ্ছি, 'গত সপ্তাহ থেকে খুব important কাজ আরম্ভ ক'রেছি। London County থেকে রাজাকে একখানা বই present করা হয়েছিল তার মলাটটা Hand-tooled leather তার gold-এর কাজ — আগাগোড়া সব হাতে করা। Mr. Newton আমাকে সেটা reproduce করতে দিয়েছেন — আগাগোড়া লিথো। একটা tint ব্লক, একটা গোল্ড, একটা Leatherএর texture আর একটা embossing block... drawing করা হয়ে গেছে — letteringগুলো Mr. Griggs এঁকেছেন। কাল Goldএর কাজটা stoneএ transfer করেছি। সোমবার Leatherএর textureটা করব। বোধহয় আসছে সপ্তাহে শেষ হবে। Reportএ ছবিটা বেরবে — আমার নাম এবং...'

লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল স্কুল অফ ফোটোএন্‌গ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি-তে (বোল্ট কোর্ট, ফ্লিট স্ট্রিটে) এবং ম্যাঞ্চেস্টারের মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেক্‌নোলজিতে বিবিধ মুদ্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তিনি, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল বিলেতের মুদ্রণ বিশারদদের। 'হাফ্‌টোন' চর্চা বিশেষ ক'রে হাফটোন সংক্রান্ত ক্যামেরার কাজে উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র ও ছাত্র সুকুমারের নতুন কিছু শেখার ছিল না। সুকুমারের বিলেতে আগমনের পরেই 'son of a celebrated photoengraver' বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিলেতে আগমনের পূর্বেই 'পেনরোজে' আটটি ও তাঁর বিলেত প্রবাস কালে আরো একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের সুবাদে উপেন্দ্রকিশোর তখন সুবিখ্যাত। কিন্তু তাত্ত্বিক মূল্য যতই স্বীকৃত হোক, বিলেতের অভিজ্ঞ মহলেও উপেন্দ্রকিশোরের প্রস্তাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ও অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করেছিলেন সুকুমার। এবং তার বিহিতের জন্য হাতেকলমে বহু পরীক্ষা চালিয়েছিলেন মুদ্রণ বিশারদদের সন্দেহ মোচনের উদ্দেশ্যে।

পেন্‌রোজ-এ প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের শেষ রচনা ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গবেষণাপত্র 'মাল্টিপ্‌ল্‌ স্টপ'। পিতার উদ্ভাবিত ও প্রস্তাবিত এই 'মাল্টিপ্‌ল্‌ স্টপ' প্রবর্তনের জন্য সুকুমারের

প্রয়াসের বহু উল্লেখ রয়েছে তাঁর বিভিন্ন চিঠির বিভিন্ন অংশে :

'সোমবার L.C.C. স্কুলে Multiple diaphragm দেখাব — Mr. Newton আর অন্যান্য teachers থাকবেন।'

'L.C.C.তে Multiple stop-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে।... কিন্তু এখানকার লোকেদের এ বিষয়ে ভয়ানক গোঁড়ামি।... আমার সন্দেহ Mr. Bull বোধহয় এই সব Stop সম্বন্ধে একটু prejudiced — তাই তাঁকে কাল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটু আমতা আমতা ক'রে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন — কিন্তু আরেকটু চেপে ধরতেই বললেন, "আমার মতে Round Stopই সবচেয়ে ভাল"। আমি বল্লাম "বেশ ত! multiple stopএ ত round holes ব্যবহার করতে বাধা নেই।" তখন থতমত খেয়ে গেলেন, বল্লেন "Yes! Yes! I really have'nt given much thought to it."'

'Multiple Stops সম্বন্ধে Mr. Fishenden এর prejudice এখন ভেঙ্গে আসছে। সেদিন কয়েকটা wet plate negative ক'রেছিলাম। দেখে খুব খুশী হ'লেন — "Beautiful dots" বললেন।'

সুকুমারের পত্রাবলিতে আলোচিত কারিগরি প্রসঙ্গ মুদ্রণবিশারদদের কাছেও অনেক ক্ষেত্রে আজ দুর্বোধ্য। যে-সব বিষয়ে তিনি অনুশীলন ও অধ্যয়ন করেছিলেন প্রথমে সেগুলির রূপরেখা প্রদান করা তাই আবশ্যক। কিন্তু এই প্রবন্ধের পরিসরে তা সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠককে এ-বিষয়ে হয়তো বিলেতের আরো চিঠি'র তথ্যপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি সাহায্য করতে পারে। (এক্ষণ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯১)।

সুকুমারের দু'টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল পেন্‌রোজ পত্রিকায়। ১৯১২-য় প্রকাশিত Half-tone Fact Summarised প্রবন্ধ সম্বন্ধে সুকুমার একটি চিঠিতে লিখছেন, 'সাধারণতঃ halftone theory সম্বন্ধে এখানে যেসব অদ্ভুত কথা শুনতে পাই সেইটে লক্ষ্য করেই articleটা লিখেছি।'

আর দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, '"Standardizing the Original [১৯১৩-৪] বলে একটা article লিখ্‌ছি। Original এর exposure value আর range চট্‌ ক'রে বার করবার একটা method Manchester থাক্‌তে work out করেছিলাম...'

'ব্রিটিশ জার্নাল অফ ফোটোগ্রাফি'র ১৯১৩-র ১৮ জুলাই সংখ্যায় সুকুমারের একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশের সময় পত্রিকা সম্পাদক মুখবন্ধে লিখছেন : Mr. Sukumar Ray, in response to our invitation to write a full explanation of the pin-hole theory of the formation of the half-tone dot, sends us the following, which we have pleasure in printing.'

প্রসেস কর্মীদের সাধারণ দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে শ্রম ও সময় বাঁচাবার উপযোগী একটি স্লাইডিং স্কেল উদ্ভাবন করেছিলেন সুকুমার। বিলেত থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'Stop apertureটা Camera extensionএর againstএ set করলেই screen mark এর কাছে distanceটা read off করা যাবে। একটা rough calculator বানিয়ে স্কুলে দেখিয়ে এসেছি।'

পরের চিঠি থেকে জানা যায়, 'Penrose-এর Factoryতে ওটা manufacture হবে — তাই ওদের একটা model scale বানিয়ে দিয়েছি।'

পেনরোজ কোম্পানি এই ক্যাল্‌কুলেটর বিক্রিব কোনো লভ্যাংশ সুকুমারকে দিত কিনা জানা যায় না। যেমন জানা যায় না উপেন্দ্রকিশোর উদ্ভাবিত 'স্ক্রিন অ্যাড্‌জাস্টমেণ্টে ইন্ডিকেটর' নামক যন্ত্রাংশের জন্য তিনি কোনো রয়ালটি পেয়েছিলেন কিনা। তবে অনুমাণ করা যায় যে পান নি, কারণ যন্ত্রটির পেটেন্ট নেওয়া হয়েছিল পেনরোজ কোম্পানিরই নামে (যদিও পেনরোজ পত্রিকাতেই উপেন্দ্রকিশোরের লেখা এই যন্ত্রাংশেব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল)। পেনরোজ কোম্পানির তৈরী প্রসেস ক্যামেরায় সংযুক্ত এই যন্ত্রাংশের প্রতিচ্ছবিও মুদ্রিত হয়েছে সে-যুগে। উপেন্দ্রকিশোর আরো একবার প্রতারিত হয়েছিলেন শুল্‌ৎজে নামে এক ব্যবসায়ীর দ্বারা। উপেন্দ্রকিশোরের একটি গবেষণাপত্রে '60° Screen' নিয়ে আলোচনা প্রকাশ হওয়ার পর শুল্‌ৎজে সেই আইডিয়া আত্মসাৎ ক'রে পেটেন্ট নেয়। সেই সংবাদ জানার পর উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক সত্তা এতটুকু বিচলিত হয়নি। শুধু নৈর্বক্তিক এক মন্তব্য করেছিলেন তিনি ·

'To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention What directly concerns them is the addition of a valuable resource to their equipment.'

সুকুমারের মধ্যেও পিতার ব্যবসায়িক মনোভাবের অভাব বা তার প্রতি অনীহা সঞ্চারিত হয়েছিল। সম্ভবত অকস্মাৎ উপেন্দ্রকিশোরের ও তারপব অকালে সুকুমারের প্রয়াণের পর ইউ রায় অ্যান্ড সন্স উঠে যাওয়ার এটি অন্যতম কারণ। কিন্তু তার আগেই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পন্ন করেছিল — ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রসেস শিল্পের বিকাশের সূচনা হয়েছিল এই কোম্পানিতে। ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এ যাঁরা কাজ শিখেছিলেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরবর্তী কালে স্থাপন করেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান — এক চেন্‌ রিঅ্যাক্‌শন জাতীয় প্রক্রিয়ায় হাফটোন ব্লক-নির্মাণ, বিশেষ ক'রে কলকাতায়, কুটীর শিল্প হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মুদ্রণ বিষয়ে আগ্রহ থেকেই নিশ্চয় উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার উভয়েই বাংলা হরফ সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, হরফ সংস্কার সংক্রান্ত চিন্তাগুলি উপেন্দ্রকিশোর লিপিবদ্ধ করার সময় পান নি।

সুকুমার সময় পেয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা জনিত কিছু খসড়া করেছিলেন তিনি। মাত্রদু'টি পাতাতে ছড়ানো কিছু এলোমেলো লিপির মধ্যেও কিন্তু তাঁর বাংলা টাইপোগ্রাফি বিষয়ে গভীর উপলব্ধিব পরিচয় রয়েছে। সংযুক্ত বর্ণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার ও 'কার্ন' টাইপগুলিকে বর্জন করার কথা বাংলাদেশে প্রথম তিনি চিন্তা করেন। 'কার্ন' টাইপ বলতে ু, ূ, ি, ী ইত্যাদি হরফ বোঝায়, যাদের অংশবিশেষ হরফের দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, হরফদেহের অবলম্বন ছাড়াই শূন্যে ঝুলে থাকে। আমরা জানি, বিভিন্ন হরফে বিভিন্ন রূপ নিয়ে যুক্ত হয় উ-কার। যেমন — হু, গু, পু, রু, শু। সুকুমারের খসড়ায় এই সব ক্ষেত্রেই উ-কারকে র-সংযুক্ত ভঙ্গিতে [রু] ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'ন' ও 'গ' অথবা 'হ' ও 'ন' দ্বারা গঠিত যুক্তাক্ষরগুলি তিনি এমন ভাবে লিখেছিলেন যাতে যুক্তাক্ষরের দুটি অক্ষরের কোনোটি তার স্বাতন্ত্র্য না হারায় — এক নজরেই যাতে অক্ষর দু'টি চেনা যায় (যাকে অক্ষরের transparency বা স্বচ্ছতা রক্ষা বলা হয়)। 'ম' ও 'ভ' যুক্ত করার সময়ে তিনি 'ভ'-কে 'ম'-এর নীচে না বসিয়ে পাশে বসিয়েছিলেন। ক + র এবং ত + র সংযোগে উৎপন্ন যুক্তাক্ষরদুটিকেও

তিনি transparency দিতে চেয়েছিলেন। 'কার্ন' টাইপ হিসাবে 'ন'-কে বর্জন করার জন্য 'ন'-কে নিচুতে স্থাপন করার প্রস্তাবটিও আকর্ষণীয়।

পিতা-পুত্র প্রস্তাবিত হরফ সংস্কারের খসড়া থেকে পুনর্লিখিত।

সুকুমার রোগশয্যায় জীবনের শেষ কয়েক দিনে তৈরি করেছিলেন 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের ডামি। শ্রী সত্যজিৎ রায়ের সংগ্রহভুক্ত সেই 'ডামি' একটি ঐতিহাসিক নিদর্শণ। কবি সুকুমার, গ্রন্থচিত্রকার সুকুমারকে আমরা চিনি কিন্তু 'ডামি' কপিটি না দেখলে 'পুস্তক নির্মাণ' সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা উপলব্ধি করা যায় না। বাংলায় 'বুক প্রোডাক্শান' সম্বন্ধে আদ্যপান্ত পরিকল্পনার সাক্ষ্যবাহী এর চেয়ে প্রাচীন কোনো নিদর্শন আছে বলে আমার জানা নেই। 'আবোল তাবোল'-এর অধিকাংশ কবিতা প্রথমে 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আর্ট পেপারে (বা নিউজপ্রিন্টে) মুদ্রিত হতো 'সন্দেশ'। কবিতাগুলির ইলাসট্রেশনও তাই অধিকাংশই হাফটোন ব্লক থেকে ছাপার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বই ছাপা হবে অ্যান্টিক কাগজে, হাফটোন ব্লক ভালো খুলবেনা। সুকুমার তাই সমস্ত হাফটোন ব্লক পরিহার করার জন্য নতুন ক'রে ইলাসট্রেশন করলেন — পেন্ অ্যান্ড ইংক স্কেচ। তৈরি হলো নতুন লাইন ব্লক। সেই নতুন ব্লকের থেকে তোলা প্রুফের কাগজ কেটে নিজে হাতে বসিয়ে দিলেন 'ডামি' কপির স্থান বিশেষে।

* পরিশিষ্ট ১, ২, ৩ দ্রষ্টব্য

সহায়ক রচনা গ্রন্থপঞ্জি :

Dipankar Sen, 'How Sukumar Ray Proposed to Reform Bengali Types', *All India Type Founders' Souvenir Volume of the Seventh Conference*

সিদ্ধার্থ ঘোষ, কারিগরী কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, *দে'জ*, ১৯৮৮

Half-tone Facts Summarized

SUKUMAR RAY, B.Sc.

"Theories", said a practical operator, "don't pay. There are no end of half-tone theories; but, for my part, I prefer to be guided by experience"—as if there can be any theory worth the name, without practical experience—without well-observed facts to build them upon. Unfortunately, however, the word "theory" implies to a good many people nothing more than the arm-chair speculations of an unpractical mind. Hence all our ill-informed notions about the endless conflict of theories, and this unfortunate divorce between theory and practice—for it is self-evident that there can be no sound or systematic practice without an intelligent appreciation of underlying principles. After all, these theories are different ways, more or less, of stating the same series of facts. It has often been pointed out that the "practical experience" of successful operators, when analysed, reveals a "surprising conformity" to theoretical requirements. Yet, it is remarkable what a number of misconceptions exists regarding the most elementary facts of the half-tone theory.

Let us make a few simple practical experiments to make matters clear. On a fairly big sheet of paper, say, about 2 feet square, cut out a neat little square hole about 1/12 of an inch in size. Using this as a pinhole, observe what sort of an image of the sun you get on a piece of white paper, held at various distances beneath the hole. It will be found—

1. When the "pinhole" is very near the paper, say, about an inch, the image is a small and sharply-defined *square*. It is, in fact, an image of the hole cast by the sun—the apparent size of the "pinhole", when so near, being very large compared with the sun.

2. When the hole is a few feet away we get a big round image of the sun, more or less perfect, but rather feeble—the hole at such a distance being small enough to act as a true pinhole.

3. At intermediate distance, where the apparent sizes of the pinhole and the sun are about equal, we find a blurred, roundish "barrel-shaped" image, which is really a compound of the two kinds of images described above. The margins of the images, instead of being abrupt, will be found to fade away more or less gradually.

The above experiments may be repeated in a dark room with a *bright* artificial light, by placing before the latter a mask with a 2-in. or 3-in. circular opening, covered with ground glass or tissue paper. By varying the shape of this opening a series of interesting observations can be be made.

We have only to imagine these phenomena taking place on a greatly reduced scale to get a perfect idea of what happens in the camera behind each screen hole—with this important reservation, that in actual practice we work entirely within limits corresponding to the third condition described above, when the pinhole (screen hole) has about the same apparent size as the light source (lens opening). The first condition (too close a screen distance) we try to avoid so as to get rid of the "screeny effect", while the second condition is never actually observed, being masked by the overlapping of adjacent dot images, their margins running into each other and thus partly obscuring the dot formation.

Now, the dot formation may be variously looked upon as a series of pinhole images of the lens aperture formed by the screen holes—or as a shadow of the screen thrown by the lens opening—or as variations in the illumination at various points due to the interposition of opaque obstacles (the screen lines). In the first case, we consider each point in a screen hole as giving a true pinhole image of the lens aperture, the resultant dot being an aggregate of all these images. In the

second case, we resolve the diaphragm aperture into a similar series of points, each casting a perfect shadow of the screen, the dot images being obtained by compounding this medley of shadows. In the third case, we determine the illumination at various points in and about a dot by finding out how much of the lens aperture would be visible from those points obscured by the screen lines. There is really nothing to choose between these various ways of looking at the thing, for they lead, when worked out, to precisely similar results and conclusions regarding the shape, size and character of the graduated dot. These are therefore merely different ways of stating the "pinhole theory".

To state the conditions of vigorous gradation more definitely, the term "normal" is applied to that particular screen condition at which the lens aperture, viewed from the plane of the image, seems just small enought to fit into the screen hole. The exact value of this can be definitely experessed in terms of the screen, stop and camera extension. Every operator, however "practical" and experienced, will find it worth his while to get familiar with this condition—not for the purpose of slavish and indiscriminate adherence to it, but simple in order that all allowances for variations of copy, and for the different types of negatives required for different purposes, may be properly estimated as definite departures from some well-defined starting point. There are several methods, mechanical, optical or mathematical, of finding out the "normal" screen distances corresponding to various screens, camera extensions and stops—or, as some could prefer to have it put, the "normal" stop for any combination of camera extensions, screen distances and rulings.

The gradation of the dots is of the greatest importance, for it governs the "growth" of the dot with increasing exposure or, what amounts to the same thing, with increasing illumination. Of the various minor factors known to have an influence on the character of the dot the best known, but least unders-

tood, is diffraction, or the straying of light rays beyond their straight path. The effects of diffraction, being more or less feeble, should be looked for in the comparatively light-free spaces between the dots, as they are very readily masked by the brighter glare of the dot proper. Under ordinary circumstances diffraction is a more or less negligible evil, chiefly apparent as bands or veils in spaces that should be clear. But with fine screens, small stops and long screen distances, it attains its maximum effectiveness, giving a crisp "pinpoint" character to the dots, which is found very suitable for the "flash" or the shadow exposure. Diffraction also appears at times to influence the joining-up.

So far we have only dealt with the purely optical formation of the dot We must not forget, however, that the sensitive plate has its own peculiar way of interpreting this dot-image. It is well known that owing to "irradiation"—or internal halation within the film—a point of light on the sensitive plate assumes the form of a small graduated circle, which, of course, tends to grow bigger with increase of this phenomenon of exposure. But the diffusive effect of this phenomenon is partly compensated for by the marked tendency of the process plate— with its short under-exposure curve and great density—to sharpen up the edges of the dots. The practical effect of irradiation is, therefore, to somewhat increase the permissible range of departure from "normal" conditions, enabling the dot variation to be carried right into the shadows even with short screen distances. This, however, is not always an unmixed blessing, for though it might make up for the slight initial lack of gradation it would still be a poor compensation for the general loss of detail. This extra facility is moreover responsible for a great deal of careless operating and a consequent increase of the fine etcher's troubles. The very fact that so many operators invariably aim at getting "fat" high-light dots, so as to leave plenty of margin for fine etching, is a disquieting symptom.

The question of the ideal dot formation has scarcely received the consideration it desrves. Hitherto too much attention has been given to the mere range of the dots, and too little to their etching characteristics, which, after all, is the final criterion of suitability. That the shape and character of the dots have a very important bearing on the behaviour of the half-tone image in the etching bath will be apparent to all who have an opportunity of observing how the smoothness and delicacy of gradation in a four-line or 60° screen half-tone are retained in the etching. And, with certain types of manipulated dots,—but that is another story.

Penrose's Pictorial Annual,
vol. 18, 1912

Standardizing the Original

SUKUMAR RAY, B.Sc.

Of all the troubles that beset the path of the unwary half-tone worker, there are none more disconcerting than the pitfalls sprung upon him by the perversity of orginals. More often than not, it is in negotiating the uncharted regions of "tricky" originals that the operator comes to grief. Attempts have been made at various forms to systematize and simplify the various optical factors, a proper correlation of which is necessary for the production of a successful half-tone negative. But the complaint usually is that these do not touch the real difficulty of the problem, for, it is said though they may offer valuable guidance for the treatment of a more or less fictitious "average" subject, the operator is still dependent to such an extent on the vagaries of his originals, that he may as well cease to trouble himself about "principles" and "exact" methods. and fall back upon that excellent thing—the "operator's judgement." Now judgement is no doubt a very desirable and necessary commodity, for it represents the well-assimilated experience of the past; but it surely has nothing to lose by being supplied with some definite data for its guidance. In this article I propose to make a few suggestions for renderting some "delightful uncertainties" of half-tone work a little less delightful.

It is surprising how easily the eye can be misled as to the photographic values of a subject, not only by differences of colour and tone, but also by slight variations in the relative distribution of lights and shades. It has been suggested somewhere that a process studio should provide itself with a comprehensive and classified protfolio of typical orginals—so that, when the operator is in doubt about any particular

copy, he has simply to dip into the collection and consult the records entered therein against some similar subject. This would no doubt be an excellent plan, but the time and labour that have to be expended before a sufficiently representative collection can be compiled an ' classified, in the ordinary way of business, are enough to discourage a confirmed enthusiast. It is possible, however, to devise a modification of this method which would not only be simple and practical, but would give us all the required information in a very definite and useful form.

Before describing the method, we may discuss briefly the precise nature of the information we require about an original. First of all, we must know what we may call the *exposure factor*—which, in half-tone work, is practically governed by the *deepest* tone present in the subject, being, in fact, the minimum exposure required to produce sound, printable dots in the shadows. This would be strictly applicable only to originals having a moderate range of contrasts, where we are aiming at something like a facsimile reproduction. In all cases where gradation has to be artificially accentuated or compromised, it is necessary to determine the *range* of tones,—or, in other words, the relative exposure factors of the lights and shades in the original. Equipped with such definite information, the operator is in a position to say at once what the main exposure would be, and also what liberties he can take in the way of high-light exposures or unusual stops. He would also know when, and to what extent, it is really necessary for him to have recourse to "flashing", or other abnormal procedures.

In order to determine the exposure factor and range of an original, we only require a few graded strips of different colours, the relative exposure factors of which are known. For all practical purposes, it is enough to have a good scale of greys, one or two well-chosen browns and some P.O.P. strips toned to different degrees of warmth. Unfortunately, howev-

er, the idea of calibrating a scale of densities is in many minds associated with fearful visions of mechanical and mathematical complications. To all such the following method can be strongly recommended as being simplicity itself. Briefly, the method is to compare a half-tone photograph of the graded strips with a similar photograph of a *known* series of exposures made under similar conditions of screen, stop and development. This known series can be readily obtained by exposing on an opal glass evenly illuminated from behind, and progressively masking off at definite stages in the exposure. To secure uniformity, the negative should be made on dry plates and printed together—preferably on glossy self-toning paper. On now comparing the known series with the unknown under a microscope or strong magnifying glass, it would be found quite easy to assign definite exposure equivalents to the latter, with a degree of accuracy sufficient for our purpose. The known exposure series must, of course, be sufficiently extensive to include the whole range of tones given by the graded strips. The values obtained in this way are really *actinic* values of our graded strips. which are the inverses of their exposure factors. Thus if we consider the lightest patch, corresponding to white paper, as having an exposure factor of 1, and find it equivalent to our known exposure of, say, 100 seconds,—a very dark or non-actinic patch would correspond to an exposure of about 3 seconds and would therefore have an exposure factor of about 100/3 or 33. The graded strips should be marked once for all with the exposure factors obtained in this way and each gradation patch provided with a neat hole to facilitate direct comparison with the original. In practice, it is not necessary for the colours to be anything like a dead match—as the comparison of two slightly dissimilar tints can be made very effectively through any blue filter that does not transmit too much red.

The operator should get into the habit of mentally classifying his originals according to the range of their gradations,

which, as we have shown above, is the exposure factor of the shadows divided by the exposure factor of the high-lights. As we cannot, in a half-tone negative, approach anything like a full range of tones, it would often be found necessary to compromise matters in order to suitably accomodate a long scale of gradations within the limits presented by the "pin-point" shadow dots and substantial high-lights to suit the taste of the operator or the etcher, or whoever may happen to be the dictator. Some originals, again, would require the gradation to be artificially enhanced, so far as a right interpretation of the original would justify. The operator, in attending to these niceties, will find plenty of scope for the legitimate exercise of his ingenuity.

Penrose's Pictorial Annual,
vol. 19, 1913-14

The Half-tone Dot

Mr Sukumar Ray, in response to our invitation to write a fuller explanation of the pin-hole theory of the formation of the half-tone dot, sends us the following, which we have pleasure in printing:

Consider the stop-opening as an illuminated area and the screen hole as made up of a number of points, each of which, if it could be isolated, would give us a true undistorted image of stop. Take the case of a single screen-hole and consider what happens at the image plane when the screen distance is gradually increased, remembering all the time that each point in the screen-hole is a true pin-hole. While the screen is very close to the image plane, the pin-hole-image, due to each point in the screen-hole, would be correspondingly small—much smaller, in fact, than the screen-hole itself so that we have a series of infinitely small images of the stop corresponding to a series of points in the screen-hole. The resultant effect of this aggregate of points-like images is to reproduce the shape of the screen-hole, point for point. Thus, at this stage, the pinhole-image is an image of the pinhole itself. This corresponds to the familiar "screeny" effect given by too short a screen distance.

As we move the screen away, these tiny images cease to be mere points, and, with their gradual growth in size, the shape of the total image is also progressively modified, till it begins to approximate roughly to the shape of the individual pinhole image of which it is made up. To the half-tone worker this is the most important stage. But, not until we rack the screeen out to a considerable extent does the total image become anything like a true replica of the stop aperture. For, the pinhole image having at this stage grown much larger than the srceen-hole may be considered practically coincident—t-

he extent to which they are out of register being relatively small in comparison with their size. In other words, the screen hole is here far enough away to be considered a mere point. In actual practice, however, we can never observe this condition for long before we could reach such a distance the dot images from adjacent screen-holes would overlap and get hopelessly mixed up with each other.

All half-tone work is, therefore, confined within a limited range of screen distances where each individual pinhole image is comparable in size with the screen-hole, so that the total image is as much an image of the screen-hole as of the stop opening. Here we are apparently landed in the midst of a fearful complication. As we have seen, each point in the screen-hole is reproduced in the dot image as a complete picture of the stop, which is the same thing as saying that for each point in the stop we get a complete projection of the screen-hole accommodated within the dot image. The easiest way of working out the dot image, therefore, is to take various points in and about the dot and find out how many points in the stop can send their lights to those points, or. in other words, how much of the stop would be visible from those points, unobstructed by the screen lines. Thus, taking a concrete case—a round stop adjusted for the normal distance—we can represent it by a diagram as in Fig. 1. Looked at from the centre, C, of the dot image the stop seems just inscribed within the screen-hole, A, A1, A2, A3, so that the whole of the stop opening is visible from the point C, which is therefore the point of maximum illumination. If now, we shift our line of sight ever so little towards B, the screen line will at once intervene, and there will be a progressive falling off in the illumination, until at B it is only half of what it is at C, as only half the stop opening is visible. Similarly we can find out the illumination at any otehr point: thus, at A it is a quarter of that at C, since only a quarter of the stop can be seen. By straying still further away from C we come to points

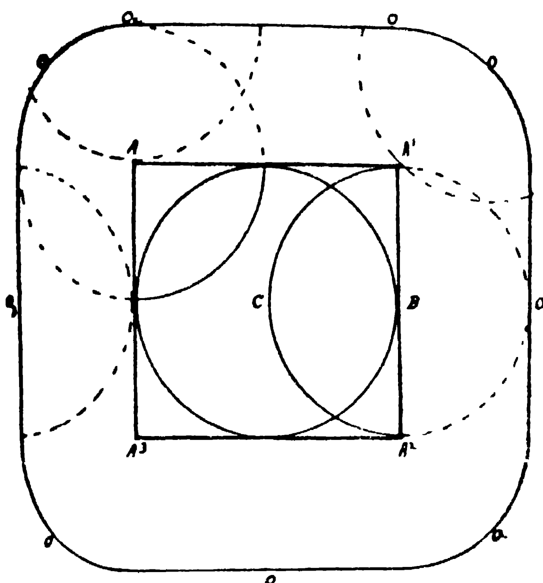


Fig. 1.

O, 01, 02, 03 etc, at which the stop is totally eclipsed by the screen lines. These points of zero-illumination represent the extreme fringe of the dot, and they have been joined up in the diagram to show the real shape of the dot image under these conditions, which would be reproduced at a long enough exposure if there were no irradiation effects to modify it.

Working on these lines we can make a complete survey of the actual structure of the dot under different optical conditions. Fig. 2 gives us some typical sections, or illumination curves, of the dot-images given by round and square diaphragms. Phase I. corresponds to too short a screen distance (or too small a stop). Phase II. is the "normal" condition considered above. Phase III. corresponds to the largest stop (or longest screen distance) permissible in actual practice such as would be used for the high light exposure. Beyond Phase III. the dot image becomes flat and practically usless.

Let us conclude with a few general observations which may be helpful to those who are unable to reconcile what is said above to their own preconceived ideasa about the subject—

1. The sectional dot image obtained by considering a mere section of the stop and screen is quite different from an actual section of the complete dot projection due to the complete stop and the complete screen-hole.

2. No theory can be complete which does not take into account all the facts of the case. That such phenomena as diffraction, interference, and irradiation, often influence the

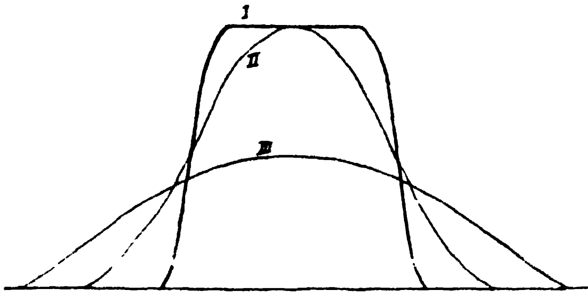


Fig. 2.

dot image, or its interpretation by the sensitive plate, have long been well established, and the pinhole theory need have no quarrel with them.

3. Just beyond the noraml distance, the dot-section is not a truncated cone, but a continuous curve, somewhat flatter and shallower than at the normal distance. With a 1:1 screen the projections beyond the normal are further modified owing to the overlapping of adjacent dot images. Between Phase II. and Phase III. there is no flat or ungraduated patch in the centre of the dot, as is sometimes supposed.

SUKUMAR RAY

The British Journal of Photography হইতে পুর্ণমুদ্রিত।
(July 18, 1913, pages 554 & 555).

কবিতার অনুবাদ : সুকুমার ও রবীন্দ্রনাথ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১৯১২-১৩ সালে বিদেশ বাসের সময় লন্ডনের *Quest* পত্রিকায় সুকুমার রায় একটি রচনা প্রকাশ কবেন : The Spirit of Rabindranath Tagore। বচনাটির বৈশিষ্ট্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীয় রচনার অনুবাদ কবছিলেন সে সময়। সুকুমার রায়ের রচনাটি প্রকাশের আগে *Gitanjali. Songs Offerings* বেরিয়ে গেছে। এই অনুবাদগ্রন্থ থেকে দুটি কবিতা সুকুমার ব্যবহার করেছিলেন তাঁব প্রবন্ধে। একটি, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', অপরটি 'মরণ যেদিন দিনের শেষে'। সুকুমার নিজে অনুবাদ করেছিলেন সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি', প্রভাতসঙ্গীত থেকে 'নির্ঝবের স্বপ্নভঙ্গ', উৎসর্গ থেকে 'সুদূর'* আর 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে', এছাড়া একটি কবিতাংশ 'হৃদয-অরণ্য'।

১৯১৩ সালে লন্ডনে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁব দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থের জন্য কবিতা সংকলন করছিলেন। এপ্রিল মাসে ইয়েটসকে *The Gardener*-এর পান্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন তিনি। এর একটি কবিতা, সুদূর · যার প্রথম অংশটি এই :

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিযাসি
দিন চলে যায, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহাব
পবশ পাবাব প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি
ওগো সুদূব, বিপুল সুদূব, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাসরি।

সুকুমার রায় এই কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন এবং সুকুমারের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লক্ষ্য কবেছিলেন। সুকুমাব ১৯ জুন ১৯১২ সালে লন্ডনে উইলিয়াম পীযাবসনেব বাড়িতে ববীন্দ্রনাথেব উপস্থিতিতে 'সুদূর', 'পরশপাথব', 'সন্ধ্যা', 'কুঁড়িব ভিতব কাঁদিছে গন্ধ', ইত্যাদি অনুবাদ পডেছিলেন। এই কবিতাপাঠের আসরে *Wisdom of the East*-এর সম্পাদক ক্র্যানমার বীঙ (Cranmer Byng) সুকুমারকে বলেছিলেন যে তিনি এই অনুবাদ ছাপবেন। সুকুমাবের অনুবাদটি এই :

I am restless
I am athirst for the great Beyond
Sitting at my window,
I listen for its tread upon the air, as the day wears on.
My life goes out in longing
For the thrill of its touch.
I am athirst for the great Beyond
O Beyond! Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call
I forget, alas! that my hapless self,
Is self confined, with no wings to fly.
I am eager, wistful,
O Beyond, I am a stranger here.
Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call.
In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue.
O Beyond, I am a stranger here
O Beyond! Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call
I forget, alas! that my hapless self
Has no winged horse on a path unknown
I am distraught,
O Beyond, I am forlorn,
In the languid sunlit hours
In the murmur of leaves, in the dancing shadows,
What vision unfolds before my eyes
Of thee—in the wide blue sky?
O Beyond! Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas! that my hapless self
Lives in a house whose gates are closed

বীঙ এ অনুবাদ ছাপেননি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন :

I am restless. I am athirst for far-away things.
My soul goes out in a longing to touch the skirt of the dim distance
O Great Beyond, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that I have no wings to fly, that
I am bound in this spot evermore.

I am eager and wakeful, I am a stranger in a strange land.
Thy breath comes to me whispering an impossible hope
Thy tongue is known to my heart as its very own.
O far-to-seek, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that I know not the way, that I have
not the winged horse.

I am listless. I am a wanderer in my heart.
In the sunny haze of the languid hours, what vast vision of
thine takes shape in the blue of the sky!
O farthest end, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that the
gates are shut everywhere in the house where
I dwell alone.

পীয়ারসনের বাড়িতে কবিতাপাঠের আসরের পরের দিন রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠি লেখেন। লক্ষ্য করার বিষয় তাতে সুকুমার রায়ের অনুবাদের কথার উল্লেখ নেই। তিনি অজিতকুমারের প্রশংসা শুনেছেন এবং ইয়েটস অজিতকুমারের অনুবাদ পছন্দ করবেন বলে রথেনস্টাইন ভাবছেন, এই কথা অজিতকুমারকে জানাচ্ছেন। বীঙ যে সুকুমারের অনুবাদও পছন্দ করেছেন, সে কথা বললেন না, বরং জানালেন, বীঙ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বয়ং অনুবাদ করতে চান।

এই চিঠি লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার নিজের অনুবাদ রথেনস্টাইনকে দিয়েছেন, রথেনস্টাইন সেগুলো পাঠিয়েছেন ব্র্যাডলে, ব্রুক আর ইয়েটসকে। তাঁদের মতামত, এই ২০ জুন ১৯১২ তারিখে অজ্ঞাত। যখন পাওযা যাবে, ৭ জুলাই ১৯১২, রথেনস্টাইনের বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত অনুবাদ পাঠের পর, তখন অজিতকুমার, সুকুমার, বা রবি দত্ত, আনন্দ কুমারস্বামী, লোকেন পালিতদের অনুবাদের আর প্রযোজন হবে না। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন অজিতকুমার, তাঁর অনুবাদের খাতা রথেনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন এবং রথেনস্টাইনও তাঁর Men and Memories-এ এই কবিতার খাতার প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন অজিতকুমারকে জানাচ্ছেন, তাঁর নিজের অনুবাদ ইযেটস ইত্যাদি কবি-সমালোচকেরা অত্যন্ত প্রশংসা করছেন, তখন অজিতকুমার উল্লসিত হচ্ছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বযং অনুবাদ করবেন জানলে এই কাজে তিনি কখনো হাত দিতেনই না।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রথেনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন, অনুবাদ কাব্যিকতা বা অন্ত্যমিল তাঁর পছন্দ নয়। মডার্ন রিভিউতে বা দি নেশনে, অজিতকুমারের যে অনুবাদ দেখা যায় (প্রথমটিতে, আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে) তাতে এই কাব্যিকতার ছোঁয়াচ এবং অন্ত্যমিল আছে। লোকেন পালিতের কবিতা অনুবাদেও (মডার্ন রিভিউ-এ, নিষ্ফল কামনা, তারকার আত্মহত্যা) অন্ত্যমিল আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কবিতার অনুবাদ গ্রন্থগুলো একটার পর একটা প্রকাশ করতে থাকেন ১৯১২ থেকে, তখন অন্যের করা কোনো অনুবাদ নেন নি। গল্পের অনুবাদ যখন সংকলিত হচ্ছে, তখন অবশ্য অন্যের করা অনুবাদগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন, সংশোধন করে অথবা ম্যাকমিলানের রীডারের সংশোধনে। কিন্তু কবিতার মতো গল্পের অনুবাদে তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করেননি। তাঁর তৃতীয় অনুবাদগ্রন্থ *The Cresent Moon*-এ 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে' আর

'তবে আমি যাই গো তবে যাই', রবীন্দ্রনাথ নূতন করে অনুবাদ করেন অজিতকুমার-কুমারস্বামীর অনুবাদ গ্রহণ করেননি। পঞ্চম গ্রন্থে, *Lover's Gift and Crossing*-এ, নিয়েছিলেন 'বৃথা এ ক্রন্দন' তাঁর নিজের অনুবাদে, লোকেন পালিত এ কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অনুবাদ গ্রহণ করেননি। এই পঞ্চম গ্রন্থে নিয়েছিলেন 'সব পেয়েছির দেশে', তবে তাঁর নিজের অনুবাদ। যদিও অজিতকুমার এই কবিতার অনুবাদ করেছিলেন — অনুবাদটি *The Nation*-এ বেরিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেনও, সবাই তার প্রশংসা করছেন।

মডার্ন রিভিউতে আর একটি কবিতা বেরিয়েছিল, 'সমুদ্রের প্রতি'। অনুবাদ করেছিলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায়। এটি রবীন্দ্রনাথ তাঁব কোনো অনুবাদ গ্রন্থে স্থানও দেন নি, নিজেও অনুবাদ করেননি। ওই একই সংখ্যায় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 'সুদূর'-এর অনুবাদও করেছিলেন।

সুদূর স্থান পেয়েছিল দ্বিতীয় গ্রন্থে, *The Gardener*-এ, তবে কবির স্বীয় অনুবাদে। সেরকমই পরশপাথর, রবীন্দ্রনাথ নূতন অনুবাদ করে নিলেন ওই দ্বিতীয় গ্রন্থে। কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের অনুবাদ না নিয়ে নিজের অনুবাদ নিলেন চতুর্থ গ্রন্থ, *Fruit Gathering*-এ। সুকুমারের করা 'সন্ধ্যা' কবিতাটি কোনো অনুবাদ গ্রন্থে নেন নি তিনি।

সুকুমার রায়ের চিঠিতে আমরা জেনেছিলাম সুকুমার অন্যান্য কবিতার মধ্যে এই কবিতাগুলোর অনুবাদ শুনিয়েছিলেন পীয়ারসনের বাড়িতে। The Spirit of Rabindranath Tagore-এ এই কবিতাগুলো তিনি অনুবাদ করেছিলেন : হৃদয়ের গীতিধ্বনি (সন্ধ্যাসঙ্গীত), নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে, সেগুলোও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদগ্রন্থে নিলেন না, নিজেও করলেন না। একমাত্র 'সুদূর' কবিতাটি নিয়েছিলেন।

২

'সুদূর'-এর দুই অনুবাদে পার্থক্যের ধরনগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'ব্যাকুল বাঁশরির' অনুবাদে সুকুমার করেছিলেন passionate clarion call, রবীন্দ্রনাথ keen call of the flute। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ঠিক করেছিলেন। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে passionate সংগতিহীন, ব্যাকুল বাঁশরি আর্থিক অনুবাদে keen flute সংগত। দূব থেকে বাঁশিই ব্যাকুল হয়ে বাজে, শঙ্খ নয়। clarion call-এর সঙ্গে কর্তব্যবোধের অনুষঙ্গ আসে। যে অনুষঙ্গটির এই কবিতায় আসার কথা নয়।

'তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী' সুকুমার করেছিলেন for the thrill of its touch। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবিতায় যেটা ছিল না সেই নতুন রূপকটা আনলেন, to touch the skirt of the dim distance। অন্য অনুবাদকের পক্ষে এই স্বাধীনতা নেওয়া অসম্ভব ছিল। 'তারি আশা চেয়ে থাকি' সুকুমার খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন। listen for its tread upon the air — কিন্তু 'দিন চলে যায়, আমি আনমনে, তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে' পুরো পঙ্‌ক্তিটিই বাহুল্যজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেছেন, এই ত্যাগের স্বাধীনতাও অন্য অনুবাদকের নেই।

সুকুমারের self confined (আছি এক ঠাঁই) হলো bound in this spot; সুকুমারের wistful (উৎসুক) হলো wakefulআর hopeless hope (দুর্লভ দুরাশা) হলো impossible hope। এছাড়া

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে সংহতি আনলেন

তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী

In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue (সুকুমার)
Thy tongue is known to my heart as its very own (রবীন্দ্রনাথ)

তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত

Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call (সুকুমার)

Thy breath comes to me whispering an impossible hope (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে সুকুমারের অনুবাদের চাইতে মার্জিত, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* সম্পাদনা করেছিলেন ইয়েটস এবং স্টার্জ মুর। তবে তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সামান্যই হাত দিয়েছিলেন অনুমান করা যায়, গীতাঞ্জলির অনুবাদে ইয়েটসের মার্জনার ধরন দেখে।

'সুদূর'-এর একটি অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৯১২ ফেব্রুয়ারির মডার্ন রিভিউতে। ক্ষিতিমোহন সেনের ধারণা (চতুরঙ্গ, নভেম্বর ১৯৮৪) কবিতাটির অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব স্ত্রী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজির অনুবাদের পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, অনুবাদটি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের। এই দ্বিধার কারণ হয়তো এই; ওই ফেব্রুয়ারি সংখ্যাতেই সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সমুদ্রের প্রতি। তারপর একটি সমান্তরাল রেখা। তারপর 'সুদূর'-এর অনুবাদ। এর অর্থ এই হতে পারে, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দুটি কবিতার অনুবাদ করেছেন, দুটো অনুবাদের মধ্যে তাই এই সমান্তরাল দেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই অনুবাদ করতেন, সেটা একটা বিশিষ্ট ঘটনা বলে পরিচিত হতো, কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন বলে এই ফেব্রুয়ারি ১৯১২-তে কেউই শোনেন নি। এর আগে রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতার অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে, তাদের অনুবাদকের নাম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল অজিতকুমার চক্রবর্তী ও আনন্দ কুমারস্বামী (মার্চ ১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দ কুমারস্বামী (এপ্রিল ১৯১১), লোকেন্দ্রনাথ পালিত (মে ১৯১১ এবং আগস্ট ১৯১১)। এর পরে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ। ১৯১২ এপ্রিল সংখ্যায় কণিকা থেকে ৮টি কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছিল, এখানেও অনুবাদকের নাম নেই। ক্ষিতিমোহন সেন এগুলিকেও রবীন্দ্রনাথের করা মনে করেছেন। কিন্তু সংশয় থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের কবিসমাজের সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় নি। মডার্ন রিভিউর সেপ্টেম্বর ১৯১২ সংখ্যায় যখন The Infinite Love (অনন্ত প্রেম), The Small (হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা), I run as a muskdeer runs বেরিয়েছিল, তখন রামানন্দ বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন, এগুলোর অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং। সেইরকমই নভেম্বর ১৯১২ সংখ্যায় Inutile কবিতার অনুবাদকও যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা বিশেষ করে বলে দেওয়া হলো। অতএব, আমরা ধরে নিতে পারি, ফেব্রুয়ারি ১৯১২-তে প্রকাশিত সুদূরের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের নয়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

৩

The Gardener-এর পাঠের সঙ্গে মডার্ন রিভিউয়ের এই পাঠের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। সুকুমার রায়ের পাঠ না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পাঠ নিয়েছিলেন, সেটা সত্যব্রতের পাঠ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে।

I am restless
I am athirst for the far, far away.
The daylight wanes, I watch at the window,
Ah me, *my soul goes out in longing*
To touch the skirt of the vast dim distance.
I am athirst for the far far away.
Oh, the great Beyond, oh, the uttermost glimpse,
Oh, the keen call of thy clarion!
I forget, I ever forget
The I have no wings to fly,
That I am bound in this spot evermore.
I am eager and wakeful,
I am a stranger in a strange lone land, O thou the distant far
Thy voice comes to me
Bitterly sweet as the desire walking *impossible hope,*
And *thy tongue is known to my heart*
As its very own.
I am far away from thee, O thou art of reach,
Oh, the great Beyond, Oh, the farthest end,
O the keen call of thy clarion!
I forget, I ever forget
That I know not the way
That I have not the winged steed.
I am listless
I am a wanderer in my heart, O thou far away!
In the sunny haze of the languid noon-tide *hours*
In the murmur of leaves, in the play of the fitful shadows,
What vision of thine takes shape in the blue expanse of the sky!
O far-to-seek, I am ever a wanderer in my heart.
Oh, the Great Beyond, *oh the farthest end*
Oh, the keen call of thy clarion!
I forget, I ever forget
That the gates are all shut everywhere
In the house where I dwell all alone.

মডার্ন রিভিউয়ের পাঠে কবিতার নাম আছে, The far off। The Gardener-এ কোনো কবিতারই নাম নেই, এই কবিতারও নেই। উদ্ধৃত মডার্ন রিভিউর পাঠ লক্ষ্য করলে সন্দেহ করার কারণ থাকেনা যে গার্ডেনারের পাঠ তৈরি করার সময় মডার্ন রিভিউর পাঠের সাহায্য অবশ্য নেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যে, মডার্ন রিভিউর পাঠ অনেক সংক্ষিপ্ত হলো গার্ডেনারের পাঠে। পঙ্‌ক্তিবিন্যাসও পালটে গেছে, কিন্তু সাদৃশ্য এতই প্রবল যে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথই মডার্ন রিভিউয়ের পাঠ তৈরি করেছিলেন এবং ইয়েটস ও স্টার্জ মুর সংক্ষেপ, পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের মার্জনা করেছিলেন। কিন্তু যাঁরাই ইয়েটসের মার্জনার ধরন দেখেছেন গীতাঞ্জলির সময়, তাঁরাই জানেন, এতটা মার্জনা ইয়েটস কখনোই করেন নি, সামান্য এদিক ওদিক করা ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই আবার সংশোধন করে থাকেন, তাহলে পরিবর্তনও বড়ো সামান্য নয়, নিজের পাঠের পরিবর্তন এতটাই বা তিনি কেন করবেন। ফলে সিদ্ধান্ত করতেই হয়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পাঠ রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে নিয়েছেন, এমন কি নতুন বাক্‌প্রতিমা সহ : the skirt of the dim distance।

মডার্ন রিভিউতে অন্যান্যদের করা যে সব অনুবাদ বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার কোনোটিই নেন নি। সম্পূর্ণই নতুন করে অনুবাদ করেছিলেন। একমাত্র সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই সুদূর-এর অনুবাদ ছাড়া। সত্যব্রতের অনুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুবাদের এতই সাদৃশ্য যে মনে হতেই পারে, রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ এই অনুবাদটির ক্ষেত্রে সত্যব্রতের নাম করা উচিত ছিল।

Gitanjali-এর প্রথম মুদ্রণ হয় ১ লা নভেম্বব ১৯১২, *The Gardener*-এর নভেম্বর ১৯১৩। সুকুমার যখন The Spirit of Rabindranath Tagore লেখেন তখন হাতের কাছে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ছিল, কারণ সেই গ্রন্থ থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ উদ্ধৃত করছেন। 'সুদূর'-এর অনুবাদ যখন তিনি ১৯১২ সালের ১৯ জুন পাঠ করছেন বা *Quest* পত্রিকায় ছাপাচ্ছেন, তখনও *The Gardener* প্রকাশিত হয় নি, ফলে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কথা তিনি জানেন না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, সুকুমার কি সত্যব্রতের অনুবাদের কথা জানতেন না? মডার্ন রিভিউতে অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আবাব অনুবাদ করলেন, মনে কবা যেতে পাবে সত্যব্রতের অনুবাদ তাঁর পছন্দ হয় নি।

৪

Gitanjali-এর ভূমিকায় ইয়েটস এক বাঙালি ডাক্তার (ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র) ছাড়া আরো কয়েকজন ভারতীয়ের কথা বলেছেন যাঁদের ববীন্দ্রানুরাগ তাঁকে বিস্মিত করেছিল। তাঁদের একজন বলেছিলেন, তাঁর স্বচক্ষে দেখা — ভোর তিনটের সময় কবি ধ্যানে স্তব্ধ থাকেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় প্রায় দুঘন্টা নিযুক্ত থাকেন। কবির পিতা মহর্ষিও অনেক সময় সারা দিনই এমন ধ্যানে মগ্ন থাকেন, একবার প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ মহর্ষি নৌকোয় যেতে যেতে ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন, ফলে মাঝিদের আট ঘন্টা নৌকো থামিয়ে রাখতে হয়। সেই ভারতীয় ঠাকুর পরিবারেব বিখ্যাত লোকদের কথা ইয়েটসকে জানিয়েছিলেন। কী করে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ে কাঠবিড়ালি, কাঁধে পাখিরা এসে বসে, সেকথাও জানিয়ে ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে সাহিত্য এবং সংগীত তাঁকে ঘিরে থাকত। নীটশে কেন বলতেন যে নৈতিক বা মননশীলতার সৌন্দর্য অনেক

সময়েই শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেটা ইয়েটস এই সব ভারতীয়দের প্রবল রবীন্দ্রমুগ্ধতা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার আর্নেস্ট রীজও এমন একজন বাঙালির কথা বলেছিলেন। লন্ডনে এক থিয়েটারে তিনি যখন একটি ভারতীয় নাটক দেখছিলেন তাঁর পাশে বসা অপরিচিত এক বাঙালি দর্শক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি ওই নাট্যকারের অন্য কোনো রচনার সঙ্গে পরিচিত? তার পর সেই বাঙালিটি সেই সব কবিতা আর গদ্যের কথা বলতে শুরু কবলেন, শিষ্যের উত্তেজনার সঙ্গে, যে সব কথা শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। যেমন বলেছিলেন তেমনই দু-এক সপ্তাহ পরে এক রবিবার সন্ধ্যাবেলায় মূল বাংলায় লেখা একটি কবিতাগ্রন্থ নিয়ে এলেন সেই বাঙালিটি, তাদের কিছু অনুবাদেব সঙ্গে। "তিনি যে মুগ্ধতার সঙ্গে সেইগুলো আমাদের পড়ে শোনালেন সেই মুগ্ধতা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। কবির প্রতি এমন আনুগত্য আমাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এই রকম ছেলেমানুষী ভক্তির মধ্যে এমন এক উচ্ছ্বাসের আবেগ ছিল যা আমাদের উপনিষদের সেই কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যদি তুমি এমন বাণী কোনো শুকনো লাঠিকেও বলতে পারো, সেই লাঠিও পত্রে শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠবে।"

১৯১৩ সালে লন্ডনে যেসব রবীন্দ্রভক্ত বাঙালি ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুকুমার রায়েরই সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সেইসময় ববীন্দ্রনাথেব কবিতাব তর্জমা কবছিলেন। অজিতকুমার ১৯১১ সালেই ইংল্যান্ড থেকে বাঙলাদেশে ফিরে এসেছেন। কালীমোহন ঘোযও আছেন, তবে তাঁব রবীন্দ্ররচনার কোনো অনুবাদ দেখা যায় না। যেমন পাওয়া যায় না অন্য ভক্তদেব, অরবিন্দমোহন বসু, বা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যাযেব। এঁদের কেউ কেউ, যেমন অরবিন্দমোহন বসু অনেক পরে বলাকা বা মহুয়ার বা অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে অনুবাদ করবেন, কিন্তু কবিতার অনুবাদ তখন একমাত্র সুকুমার রায়ই করেছেন। আর একজন ছাত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, বাজা অনুবাদ করছিলেন, তবে সেই সময় কবিতা অনুবাদ কবেছেন বলে জানা যায় না। ১৯২৮ সালে তিনি অবশ্য ১৫টি কবিতা অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংল্যান্ডে সুকুমার প্রচার করছিলেন, যার প্রমাণ *Quest*-এর এই প্রবন্ধ। পত্রিকায় প্রকাশ করার আগে সুকুমার এটা পাঠ করেন East and West Society-তে ২১ জুলাই ১৯১৩। রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে সুকুমাবের সেই বক্তৃতাসভায় ভালোই লোক হয়েছিল। *Quest*-এর সম্পাদক Mr Mead সেই সভাতে ছিলেন এবং সেখান থেকেই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করেন।

রীজ যে ভারতীয় নাটকের কথা বলেছেন, সেটা সম্ভবতঃ Royal Court Theatre-এ ডাকঘর, ১৮ জুলাই ১৯১২-তে অভিনীত। সুকুমার সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। তবে প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, ববীন্দ্রনাথের এই প্রবাসকালে আরো দুটি রবীন্দ্রনাটক অভিনীত হয়েছিল লন্ডনে। ৩০ জুলাই ১৯১২ রয়াল অ্যালবার্ট হলে হয়েছিল দালিয়া, জর্জ ক্যালডেরনের নাট্যরূপ অবলম্বনে: The Maharani of Arakan। ১০ মে ১৯১৩ তারিখে ডাকঘর মঞ্চস্থ হয় আইরিশ থিয়েটারে। রাজা অভিনীত হয়েছিল লিটল থিয়েটারে, প্রভাতকুমার তারিখ দেন নি।

যে নাটকেই রীজের সঙ্গে সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদকের দেখা হোক-না কেন,

অনুমান করা যেতেই পারে তিনি সুকুমার রায়। কিন্তু সুকুমার রায়ের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হন নি।

শুধু সুকুমারের অনুবাদই নয়, আরেকজন তরুণ অনুবাদক রবি দত্ত-এর অনুবাদও রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেননি। বাংলাজানা টমসনের অনুবাদও ববীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। কেন হয়নি তার কাবণ তিনি কখনও বলেননি তবে তাঁর নিজের করা অনুবাদের সঙ্গে অন্যের অনুবাদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ মূল কবিতা অনেক সংহত করেছিলেন, কাব্যিকতা বর্জন করেছিলেন। অনুবাদতত্ত্বে আগ্রহী পাঠক এই সব অনুবাদ লক্ষ্য করতে পারেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদেব সঙ্গে তুলনা করতে পারেন।

* সুকুমার যখন কবিতাটি অনুবাদ করেন তখনও উৎসর্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবিতাটি ছিল মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলীতে। যার প্রকাশ ১৯০৩ সালে। এই গ্রন্থাবলী বিষয় অনুসারে সাজানো হয়েছিল। এর 'বিশ্ব' বিভাগের প্রবেশক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'সুদূর' কবিতাটি লেখেন।



রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুকুমার রায় কৃত অনুবাদ
কয়েকটি নিদর্শন

হৃদয় অরণ্য

There is a forest called the heart;
Endless, it extends on all sides.
Within its mazes I lost my way,
Where the trees with branches entwined
Nurse the darkness in its bosom.

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

Out of the morning-songs of birds
One stray note, I know not how, has found its way
into my secret cave to-day.
A trackless ray of the morning sun, I know not how,
Has come to seek its home here within my heart—
And my agelong sleep is over now.
The music of the world has sent its message to me.
Then strike, my heart, strike at the stony prison walls,
Break the bonds of darkness around,
And flood the world with joy.
I hear the call—the call of the distant sea.
The world within its bosom held,
The sea murmurs alone unto itself its own eternal
thoughts.
I long to hear the chant that breaks out from the
unknown deep.
Amid the silence of the listening sky.

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

what tune is that, my heart, thou singest alone to
thyself?
In summer or winter, autumn or spring, day or night,
Restless, persistent,
What tune is that, my heart, thou singest alone to
thyself?
Round thee fall the faded leaves and flowers shed
their petals,
The dewdrops sparkle on the grass and vanish, the
sunlight plays with shadows,

The rains patter on leaves.
And there in the midst of all, thy wasted weary soul
Sings the same, the same, the same unchanging tune.

I wake up from sleep at night
And listen through my heart-beats—
The same voice whispering low,
That knows no rest or pause.
A spirit, sad and weary, sits silent at my doors,
A constant dweller in my heart;
I feel the rhythmic murmur of its breath.
In the hush of mid-day, in my heart's desolate shadow,
A lonely dove sits cooing, making the lone hours
mournful,
O my heart! Hast thou learnt naught else
But only one note?
Then cease, cease my heart!
I am weary of the same, the same unchanging cry.

সুকুমার রায়ের নাটক প্রসঙ্গে

সেবাব্রত চৌধুরী

সুকুমার রায় তাঁর উদ্ভট লেখাগুলির জন্যেই বাংলা সাহিত্যে নিজের বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর এই লেখাগুলি এবং ছবি, ছেলে-বুড়ো সকলেরই উপভোগ্য, পছন্দের। তাঁর নাটকগুলি এখনও যখন-তখন যত্রতত্র অভিনীত হয়। তাঁর নাটক নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যত হয়ে দেখছি আত্মসমালোচনা বর্তমান লেখককে খোঁচায়, কেননা, আলোচনা মাত্রেরই প্রাথমিক প্রবণতা আলোচ্য রচনার অর্থ নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ; আর ননসেন্স-এর মূল লক্ষ্যই হলো যুক্তিনির্ভর অর্থকে লোপাট করা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুকুমারের উদ্ভট-রচনাগুলির তাৎপর্য বিচারের চেষ্টামাত্রেই শত্রুতামূলক হাম্‌লা। সুকুমারের শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম-এর গুরুজি এক জায়গায় বলেন 'শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায় — সে অর্থপিশাচ'। প্রসঙ্গ বদলে দেখতে গেলে মনে হয় সুকুমারের উদ্ভট রচনার আলোচকরাও 'অর্থপিশাচ',— শব্দের অর্থ খোঁজার ধান্দায় নন্-সেন্সের নির্বিকল্প উপভোগকে মাটি করা কি সমীচীন ?

যাকে আমরা নন্-সেন্স মনে করি তার বিপরীতে একটা সেন্স-এর ধারণা আমাদের রয়েছে নিশ্চয়ই। নন্-সেন্স ও সেন্স-এর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক, — এ দুয়ের দ্বন্দ্ব সর্বজনীন। এটা মনে করা একপেশে হবে যে শিল্পে বা বাস্তবে নন্-সেন্স মানেই মজার ব্যাপার, নন্-সেন্স বিরক্তি ও ক্রোধেরও উৎপাদক হয়ে ওঠে কখনো কখনো। নন্-সেন্স বলা যায় সেন্স-এর প্যারডি। প্যারডি যেমন নিছক কৌতুকের খেলা, তেমনি কখনো কখনো আক্রমণাত্মক, বিপরীত বিশ্বদর্শনের হাতিয়ার হিসেবেও মারমূর্তি ধারণ করে। প্রচলিত পূর্বতন শিল্পকাঠামোর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণকেই সাধারণত প্যারডি বলা হয়; অথচ কিছুটা প্রসারিত অর্থে দেখলে প্রচলিত সিদ্ধরসাত্মক ভাবমন্ডলের বিপরীত ব্যঙ্গাত্মক ভাবমন্ডলের বাহক শিল্পও এক ধরণের প্যারডি। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে সিদ্ধরসকে ভেঙেই নতুন শিল্পের, নতুন সিদ্ধরসের জন্ম ঘটে। এই নতুন শিল্পের সবটা নয়, একটা ধারাই ব্যঙ্গ-কৌতুকের নির্ভরতায় প্যারডি হিসেবে গৃহীত হয়। প্যারডির মধ্যে বিপরীত বিশ্বদর্শনের দ্বান্দ্বিক প্রতিফলন ঘটে; দ্বন্দ্ব-নিরসনের মাত্রার তারতম্যে রচনা কৌতুকের বা আঘাতের কারণ হয়। এদিক থেকে দেখলে সুকুমারের নাটকগুলিতে প্যারডির লক্ষণ রয়েছে বলা যায়। ব্যাপক অর্থে খুঁজে দেখলে সুকুমারের সব সৃষ্টিশীল কৌতুক রচনাতেই প্যারডির ভিত্তি পাওয়া যাবে। সুকুমারের নাটকের অন্তর্গত উপাদানগুলির পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রধানত তিনটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত . প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা, মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিকতা এবং ভাষার দ্বান্দ্বিকতা।

২

সুকুমার রায়ের নাটকে প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা গান, গদ্য পদ্য সংলাপ ও চরিত্র — এই তিনটি উপাদানের প্রয়োগেই লক্ষ্য করা যায়। তিনটি উপাদন স্বভাবতই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, প্রায়শই

অমোঘ ঐক্য গ্রথিত, যে-কোনো ভালো নাটকে যেমনটি হয়। আলোচনার সুবিধে ও বক্তব্যের সারল্যের ইচ্ছায় এ তিনটিকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে।

নাটকের গানগুলির কথাই প্রথমে ধরা যাক। সবগুলি গানই হাস্যকৌতুকে রঙ্গে ব্যঙ্গে ভরপুর, নাটকগুলির সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আবেদনের সঙ্গে বেশ মজবুত গাঁঠছড়ায় বাঁধা। বাংলায় হাসির গান, পদ্য, ছড়ার যে পূর্বতন ঐতিহ্য বহমান ছিলো, তার রীতিপদ্ধতিগুলি সুকুমাব অনায়াসে প্রয়োগ করেছেন। চটুল হাসির গানে লোক সঙ্গীতের সুবের ব্যবহার সহজাত, বাংলা গানের লৌকিক ঐতিহ্যে সরসতার এরকম একটি ধারাবাহিকতা আছে। সুকুমারের নাটকে এরকম গানে প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা না খোঁজাই শ্রেয়। কিন্তু যেখানে কীর্তনের সুরকে তার ধর্মাশ্রয়ী ভক্তিভাব থেকে সরিয়ে এনে, কৌতুককর হালকা প্রসঙ্গেব বাহন হিসেবে প্রয়োগ কবা হয়, সেখানে নির্ভুল ভাবে প্যারডিব দ্বান্দ্বিকতা থাকে। পঞ্চোপাসনার সাম্প্রদায়িক বিরোধভাব থেকে একে অন্যের উপাসনা-সঙ্গীতের কাঠামোটিকে প্যারডির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন সুকুমারপূর্ব অনেক চেনা-অচেনা কবি, লোককবি ও কবিওয়ালারা। এ ধরণের ব্যঙ্গকবিতা বা গানের উৎসে আক্রমণটাই মুখ্য, স্বধর্মীয় ভাবাবেগের লেশমাত্র তাতে থাকে না। এই কবি ও গীতিকারগণ কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী লোক, স্বধর্মে আস্থাবান পরধর্মে বিচ্ছিন্ন। স্বধর্মে ভাবাশ্রয়ী এবং পরধর্মে বিচ্ছিন্ন বলে ছিদ্রান্বেষী, যুক্তিপ্রবণ ও বুদ্ধি-আশ্রয়ী। হৃদয় এবং মস্তিষ্ক। বিশ্বাস এবং তর্ক, আবেগ এবং বুদ্ধি, সমর্পণ এবং বিচ্ছিন্নতা — এ দুয়ের সামঞ্জস্য যখন ঘটে না তখন তারা আলাদা কক্ষ বা কক্ষপথ বেছে নেয়। তাব ফলে, যখন সমর্পণ তখন শুদ্ধ উপাসনা, যখন বিচ্ছিন্নতা তখন শুদ্ধ ব্যঙ্গ-কৌতুক। রবীন্দ্রনাথে এ দুয়ের দ্বন্দ্ব আছে, সামঞ্জস্যও আছে। ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সুকুমার রায় এই সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেন নি, দুটি ব্যাপার আলাদা কামরায় ঠাঁই নিয়েছে।

দুই কোঠা-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দৈন্যের নয়, বিশিষ্টতারই পবিচায়ক। বোমান্টিসিজমের কারণে রবীন্দ্রনাথ মানসিকতার ও বাস্তবতার বহুস্তরীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে ধরতে পেরেছেন, যুক্তি এবং বুদ্ধির অতীতকেও। পূর্বতন এবং সমসাময়িক আরো কয়েকজন লেখকের মতো সুকুমাব লোকাতীত বহস্যের বাস্তা মাড়ান নি। তাঁর 'ভাবুকসভা' নাটিকায় ভাবুকতার আতিশয্যকে বেশ ভালোবাবেই বগড় কবা হয়েছে। সুকুমার ভাবালুতা নয়, বুদ্ধির পথটাকেই বেছে নিয়েছেন, এবং বুদ্ধিব ন্যায়শাস্ত্রীয় তকসর্বস্বতা বা মাথাধরা জটিলতা ও গাম্ভীর্যের বাস্তা নয়, হাল্‌কা হাসির সর্বগামী উপভোগ্য পথটিকে বেছে নিয়েছেন। খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ যেমন হাতী লোফালুফি করেন, সুকুমারও অনায়াস বুদ্ধির খেলায়, খেয়ালী কল্পনার সংযোগে অনেক ভারী বিষয়কে সামলান, লোফালুফি করেন, বিশেষত নাটকে তো বটেই। প্যারডির দ্বান্দ্বিকতাকে যাঁরা শিল্পসৃষ্টিতে প্রয়োগ কবেন, তাঁরা সজাগ বুদ্ধির প্ররোচনায়ই তা করেন। সুকুমারেব নাটকের গানগুলি সুরের দিক থেকে ছড়া, পাঁচালী, হরিনাম, কীর্তন বা ধ্রুপদী গানের ঢঙে সাধারণত গাওয়া হয়। এই প্রচলিত বাংলা গানের কাঠামোর সঙ্গে সুকুমার-রচিত গানেব কথার বৈপরীত্য আছে। গানের কথার দ্বান্দ্বিক চাপ প্রচলিত সুরেও মাঝে মাঝে অভিনব মোচড় সৃষ্টি করে, অন্তর্নিহিত ভ্যাংচানি উঁকি ঝুঁকি মারে। ঝালাপালার প্রথম গানটি লক্ষ করা যাক। 'সখের প্রাণ গড়েব মাঠ/ছাত্র দুটি করে পাঠ।' এই পঙক্তি দুটিতে এভাবে সুরাবোপ করা হয়েছে —

॥ মা মা -া । সা -া -া মা মা -া । সা -া -া ।
স খে ব্ প্রা ০ ণ্ গ ড়ে র্ মা ০ ঠ
। মা -া মা । মা পা -া মা মা -া । মা সা -া ।
ছা ০ ত্র দু টি ০ ক রে ০ পা ০ ঠ্

এখানে সা-এর ব্যবহারে একটি ভ্যাংচানি (mockery) ফুটে ওঠে, মা-তে উঠে সা-তে ফিরে থমকে দাঁড়ানো, কেন না প্রাণ্, মাঠ্ এবং পাঠ্ হলন্ত শব্দ, একটি ছদ্ম-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে। পরবর্তী গান 'সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে' পাঁচালীর প্যারডি, তাতেও প্রতি পঙক্তির শেষে সা-এর একঘেয়ে প্রয়োগে ছদ্ম-গাম্ভীর্যের নিহিত ভ্যাংচানি আছে বলে মনে হয়। লঘু কথার চাপে গুরু সুরের কাঠামোয় যেমন দ্বান্দ্বিকতা সঞ্চার হয়, প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা, তেমনি গানের কথার শব্দাবলি ও ছন্দের বিশেষ বিন্যাস গানের তালের সঙ্গেও একধরণের দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি করে। 'সাবধান হয়ে সবে' ইত্যাদি গানটি অক্ষরবৃত্ত পযাবের আদলে শুরু হয়েছে, অথচ মাঝে মাঝেই ছড়ার ছন্দের কাঠামো ঢুকে পড়ছে —

(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যেব ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক॥

আমাদের মঙ্গলকাব্যে, ময়মনসিংহগীতিকায় অক্ষরবৃত্ত-স্বরবৃত্তের এই অবিরাম মেলামেশা হামেশাই মেলে। গানের চতুর্মাত্রিক পদে (foot) ঃ অতিরিক্ত রুদ্ধদলের সমাবেশ করতে গিয়ে একরকম ধ্বনি-সংঘর্ষের কৌতুক তৈরি হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এরকম করেছেন। সুকুমারের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে 'আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না/সঙ্কটকালে চট্‌পট্ কেন যুক্তির কথা বলছে না।' গানটিতেও তালের সঙ্গে গানের কথা-বিন্যাসের এই দ্বন্দ্ব আছে, প্যারডির মেজাজে।

নাটকের গানের কথার বিন্যাস লক্ষ করলে বোঝা যায় তখনকার অনেক পরিচিত কবিতা বা গানের সঙ্গে এদের প্রায়ই প্যারডির সম্পর্ক ঘটতে থাকে। কোনো বিশেষ গান বা কবিতার সমান্তরাল সামগ্রিক কাঠামো বা আইডিয়ার সামগ্রিক প্যারডি নয়, আংশিক ভাবে কারোর রচনার সাদৃশ্য বা স্মৃতিবাহী প্যারডি বলে মনে হয়। ঝালাপালায় যখন কেবলচাঁদ গান ধরে —

আহা, পড়িযা কালেব ফেবে মোবা কি হনু বে?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ
কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু বে?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি
কেঁচোব মতো খাচ্ছে খাবি
* * * *
ব্রাহ্মণেব সে তেজ নেই
খাদাখাদ্য ভেদ নেই

ইত্যাদি, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের পন্ডিতগণের সেই গীতটির সঙ্গে এর যোগ আছে মনে হয় —

ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই,
* * * *
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই,

ইত্যাদি। এ ছাড়া গম্ভীরের সঙ্গে হালকা প্রসঙ্গ বা উপমাকে স্থাপন ক'রে ভাষা ও ছন্দে যে জগাখিচুড়ির কৌতুককর চমৎকারিত্ব, তাতে সুকুমারের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ ঘনিষ্ঠ বলেই মানতে হয়। কেবলচাঁদের গাওয়া আরেকটি গান 'হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্থ হইল', —এটিও প্যারডি, জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী ভাবমূলক গানের প্যারডি। লক্ষণীয় ব্যাপার, দেশপ্রেম, স্বদেশীয়ানা ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেকে ব্যঙ্গ কবিতা বা প্যারডি লিখেছেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা ছিলেন দেশপ্রেমিক। দেশের প্রতি ভালোবাসার কবিতা এবং গান এঁরা লিখেছেন। এঁদের প্যারডি বা ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিলো দেশপ্রেমের নামে ভণ্ডামির প্রতি, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারপূর্ণ ভীরুতার প্রতি। সুকুমার রায়ও স্বদেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন, বিলেতে অধ্যয়নকালে প্রায়ই বাঙালীর নিজস্ব পোষাক পরা, এসেক্স হল্-এ মাঘোৎসবে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এবং 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'-এই সম্মেলক গান দুটিতে অংশ নেয়া, প্রথম নাটক, লুপ্ত, যার বিষয় ছিলো রাম্স্ডেন (রামধন) নামক নেটিভ-বিরোধী সাহেবকে জব্দ করা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে লেখা, সর্বোপরি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী কবিতা 'অতীতের ছবি' —মূলত ব্রাহ্মধর্মের মহিমা, গুরুত্ব ও ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্যে, সম্ভবত সুকুমারের শেষ লেখা (১৯২২), তবু তারই মধ্যে মানবতাবাদীর স্বদেশচেতনা, জাতীয় ভেদবুদ্ধির জন্য বেদনা ব্যক্ত —

ছিল এ ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন;
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগত পানে।
* * *
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
* * *
ভেদ জনে জনে, নারী ও নরে,
জাতিতে জাতিতে বিচার ঘরে।
* * *
নিজ ধনমান নিজ বিভব
বিদেশীর হাতে সঁপিয়া সব,
ভারতের মুখে না ফুটে বাণী,
মৌন রহে দেশ শরম মানি।
* * *

পূর্বজ, সমসাময়িক বা অনুজ লেখকদের মতো সুকুমার কোনো দেশপ্রেমের কবিতা বা গান লেখেন নি, কিন্তু ভালোবাসাটা ছিলো। দেশপ্রেম বা স্বদেশচিন্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেটুকু তাঁর রচনায় ধৃত, তা মূলত উলট্-ক্রিয়ায় (inversion) ধরা পড়েছে। এ প্রতিক্রিয়ায় গম্ভীর বিষয় হাল্কা, ক্রোধ বা ভয়ের ব্যাপার হাসিতে এবং স্বাভাবিকতা উদ্ভটে রূপান্তরিত হয়। উলট্-ক্রিয়া আসলে দ্বান্দ্বিকতার একটা ধরন, দ্বন্দ্ববাদীরা যাকে ··· ান, একে অন্য হয়ে যাওয়া, দুই বিপরীত দ্বন্দ্বমূলক উপাদানের অবস্থান পরিবর্তন, তেলাপোকার কাঁচপোকায় রূপান্তর। প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা মূলত তাই।

সুকুমার রায়ের নাটকের গানে যেমন এই দ্বান্দ্বিকতা, পদ্য এবং গদ্য সংলাপেও অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। গানগুলির সুরে হয়তো সব সময় প্যারডির লক্ষণ প্রকট নয়, তবে কবিতা হিসেবে দেখলে কোনো না কোনো পূর্বতন কাব্যগীতির ছদ্ম-আদল ধরা পড়ে। নিছক গদ্য-পদ্য সংলাপে প্যারডি মূলত দু-জাতের : বিশেষ কবিতার বা কাব্য-পঙক্তির, এবং বিশেষ কাব্যরীতির, বা গদ্যরীতির। গদ্য সংলাপে বাংলা প্রহসনের কয়েকটি প্রচলিত কৌশল, বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পদ্ধতি, সুকুমার তাঁর নাটকে প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য মলিয়েরের প্রহসনের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক মনে রাখা জরুরি।

'ঝালাপালা'র জমিদার চন্ডীবাবুর অবাঞ্ছিত মোসাহেব গোষ্ঠিকে তাড়ানোর জন্য আহূত মাতুল কেদারকেষ্ট ধরে ধরে জবরদস্তি করে স্বরচিত সাহিত্যরচনা শোনাবেই। মূল উদ্দেশ্য কানের পোকা খাওয়া, কেদারের কথায় 'হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব।' বিশেষ করে পন্ডিত মশাইকে ধরে যা শোনায় তার কিঞ্চিৎ নমুনা —

ক) অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ
তপন ধীরে-ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোলে,
শিশিরসিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগদিগন্ত আমোদিত মুখরিত
উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা চমৎকার হয়েছে।
হে নিদ্রিত মানব সকল। ঐ শুনো বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া
ছুটিতেছে, হাম্বা-হাম্বা রবে তোমরা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

খ) দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, বোদ নেই,
বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, — কেবল সেই এক চিন্তা,
সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র।
— কেমন? — সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে
নৃত্য করিতে-করিতে নিত্যনবোৎসাহে — কেমন? ভাষার কেমন
একটা সহজ ভঙ্গী আছে সেটা লক্ষ্য করেছেন?

উদ্ধৃত রচনা মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্যারডি; অনুরূপ প্যারডি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'তে এর অনেক আগেই আমরা পেয়েছি। অবশ্য দুইটি নাটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিস্থিতিতে এই গদ্যপ্যারডি ব্যবহৃত হয়েছে; তবে একটি বিশেষ সাহিত্যদর্শ, রোমান্স, এবং আতিশয্যময় বর্ণনারীতির প্রতি লেখক এবং তাঁর তৎকালীন পাঠক-শ্রোতার মনোভাব এ থেকে বোঝা যায়। রচনা বিশেষে আতিশয্যমূলক বর্ণনা যে অনেক সময় উপযোগী ও অভিপ্রেত লক্ষ্য

সাধনে সফল হয়, একথা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সুকুমারের মতো লেখকরা জানতেন না বা মানতেন না এরকম মনে করার কারণ নেই। বিশেষ বিশেষ ধরনের আতিশয্যরীতিকে বঙ্কিম বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন,— যেমন ব্যবহার করেছেন রোমান্সের নানা রকম উত্তুঙ্গ আবহ সঞ্চারে, তেমনি করেছেন রোমান্সের বিপরীত প্রাত্যহিকতার রঙ্গরসিকতায়। শেষোক্ত প্রয়োগটি তাঁর 'বাবু' 'বিড়াল' ইত্যাদি রচনায় এবং উপন্যাসের স্থানবিশেষেও পাই; এ রীতি আসলে প্যারডিই। গুরুগম্ভীর গদ্যরীতির সঙ্গে বিষয়ের হাস্যকর তুচ্ছতাকে প্যারডির দ্বান্দ্বিকতায় সম্পর্কিত করা। সুকুমার, এবং তাঁর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন 'অলীকবাবু' নাটকে ব্যবহার করেন —

> সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ
> দেখিয়াছেন ? কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি,
> ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে, নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও
> বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে, ব্র্যাণ্ডি
> ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে ! হে শতমুখি !
> — হে ধূমকেতু প্রতিরূপিণি সম্মার্জনি ! হে কুণ্ডলাকৃতিধূলি
> — রাশিসমুদগারিণি !... কি বা তোমার অতুলন মহিমা !
> ...তোমার মহিমার অন্ত কোথায় ? তোমাকে প্রণাম।

নভেলের মুগ্ধ পাঠিকা হেমাঙ্গিনী যখন এ লেখা পড়ে শোনায় তখন দাসী প্রসন্ন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, বলে, "দিদিঠাকরুন ঠাকুর-দেবতাদের নাম শুনলে প্রণাম করতে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব নিকেছে।' বঙ্কিম যখন ওপরের রীতির ব্যবহার করেন, তখন তিনি নিজেই প্যারডি রচনা করেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা সুকুমার যখন এর ব্যবহার করেন, তখন তাঁরা আসলে প্যারডির প্যারডি রচনা করেন, নাটকের প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতির কৌতুককর অবস্থানে স্থাপন ক'রে, বাড়তি মজা তৈরির মতলবে।

পদ্য-সংলাপেও প্যারডি রচনা করেন সুকুমার। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং বিশিষ্ট কাব্যভাষার কাঠামোকে অবলম্বন ক'রে প্যারডি 'ছুছুন্দরীবধকাব্য' থেকে শুরু ক'রে ... পর্যন্ত অনেক লেখা হয়েছে। সুকুমারও তাঁর নাটকে এই কৌশলের প্রয়োগ করেন —

> রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি ?
> পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
> জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে কষি
> সম্বরে খদ্যোত লীলা —
> জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা
> রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
> বিশ্রামের তরে — তখনি তো মাথা তুলি
> চ্যাংপুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।

এই ছদ্ম-হেরোয়িক সংলাপ 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে দু এক জায়গায় মোক্ষম ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুকুমার কোনো রীতি বা বিষয়কে কখনো মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করেন না বলেই,

সাহিত্যের জগতে বহুব্যবহৃত কৌশলগুলিও তাঁর রচনায় তাজা থেকে যায়।

প্যারডি কোনো বিশেষ রচনার ভিত্তিতে যেমন তৈরি হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ রচনারীতিকেও প্যারডির আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুকুমার রায়ের পদ্য-সংলাপে মাইকেল যেমন, তেমনি ভারতচন্দ্র 'পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে — খাবি খেতে লাগলেন যেন ডাঙায় বোয়াল মাছ রে!' ইত্যাদি পঙক্তিতে উঁকি মারেন; উঁকি মারেন বাল্মীকিপ্রতিভার রবীন্দ্রনাথ 'ওরে পাষন্ড, তোর ও মুন্ড খন্ড খন্ড করিব।' ইত্যাদি কথায়, অথবা 'ভাবুক সভা'র এরকম সংলাপে —

কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা
আপনি নাচে নাচে রে!
ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে।

এছাড়া, শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম নাটকে, বিশেষ করে, অজস্র রবীন্দ্রকাব্যপঙক্তির প্যারডি তো আছেই। 'অন্ধকার রাতে অঙ্গহীন শব্দের পশ্চাতে/কার তপ্ত নিশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ' রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার পঙক্তি মনে করায়।

বিশেষ কবিদের রচনারীতির এ জাতীয় সকৌতুক প্যারডি যেমন নাটকে প্রয়োগ করেছেন সুকুমার, তেমনি সাধারণভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত কিছু ছন্দকাঠামো ও ধ্বনিবিন্যাসকেও প্যারডির রীতিতে কাজে লাগিয়েছেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতা লেখা হয়েছে; সংস্কৃত উচ্চারণের অনুকরণে অনেকেই মুক্তদলকে দীর্ঘস্বর হিসাবে বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। সুকুমার এই রীতিটিকে প্যারডি হিসাবে প্রয়োগ করেছেন —

শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য —
নাচে ল্যাগব্যাগ তান্ডব তালে
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে

যে উচ্চাবণ-রীতিকে সাধারণত ধ্বনিগাম্ভীর্য ও বক্তব্যের গভীরতা সৃষ্টির সহায়ক হিসাবে কবিতায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সুকুমার তাঁর নাটকের পদ্যসংলাপে তাকে অন্তর্নিহিত ঠাট্টার মেজাজে প্যারডি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অন্তর্নিহিত ঠাট্টা যেমন বক্তব্যের বক্রতায় উপরের দৃষ্টান্তের মতো 'আঁকুপাঁকু' 'ল্যাগব্যাগ' জাতীয় ভ্যাংচিমূলক শব্দে প্রকট, তেমনি নাটকীয় অ্যাকশনের হাস্যকর বৈপরীত্যে মূলত গম্ভীর কাব্যপঙক্তিগুলিকে প্যারডিরই মানসিক ও অনুষঙ্গগত ভিত্তিতে দাঁড় করায়। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে এরকম কাব্যসংলাপ একটি, যাকে প্রচলিত সংজ্ঞায় প্যারডি মনে করার কোনো কারণ নেই, সেটিকে নাটকের প্রসঙ্গে স্থাপন ক'রে দেখলে বোঝা যায়, এটিও প্যারডির দ্বান্দ্বিকতায়

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?
[যমের আবৃত্তি]
কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি —

সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি ।।
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি ।।
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে —
মোব সাথে পরিচয় জীবনের শেষে ।।
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন —
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন ।।

[পাহাড় লইয়া হনুমানেব প্রবেশ]

হনুমান। জয় রামের জয় !

[যমেব মাথায় হনুমানের পাহাড স্থাপন। যমেব পতন]

গন্ধমাদন পাহাড়ের তলায় চাপা-পড়া যমকে ওই অবস্থায় রেখে লক্ষণের চিকিৎসা, যমদূতদের আক্ষেপ 'মাইনে কে দেবে' ইত্যাদি পূর্বাপর সংলাপে ও আচরণে যমকে নিয়ে রসিকতার প্রেক্ষাপটে উপরের কাব্যসংলাপ আসলে ছদ্ম-হেরোয়িক প্যারডি।

৩

সংলাপে ও গানে যে অজস্র প্যারডিব লক্ষণ ছড়িয়ে আছে, তার মূল নিহিত বয়েছে আসলে তো নাটকের চবিত্রবলির সংগঠনেই। বিভিন্ন চরিত্র প্যারডির দ্বান্দ্বিকতায় ধৃত বলেই সংলাপের এই বিশিষ্টতা। চরিত্রের প্যারডি বলতে যেমন সাহিত্যে সৃষ্ট বিশেষ চরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ বোঝায়, তেমনি সাধারণভাবে স্বীকৃত বাস্তবে ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীব চবিত্রের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণও বোঝায়। এই ব্যাপকতর অর্থে দেখলে, সকল প্রহসনেই চরিত্রের সৃজনে প্যারডির দ্বান্দ্বিকতা থাকে, আঁকার ক্ষেত্রে যেমন কার্টুনে থাকে। কার্টুন আর প্রহসন এ দুয়েরই সামান্য লক্ষণ হল বাড়িয়ে বলা বা দেখানো। বাড়িয়ে বলা, শিল্পে, একটা মাত্রা পর্যন্ত ইলিউশন বা মায়া তৈরি করে; সেই মাত্রা অতিক্রম করলেই তা মায়াভঙ্গ ঘটায় এবং এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা উৎপন্ন করে, পাঠক দর্শক বা শ্রোতাব বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে, এবং অতিরঞ্জনের হাস্যকরতা বা বিরক্তিকরতা লক্ষ করে হাসে বা বিরক্ত হয়। যে অতিরঞ্জনে অসংগতি ধরা পড়ে, তাই হাসির বা বিরক্তির বিষয় হয়। অথচ সৌম্য শ্রদ্ধেয় মনোহর অতিরঞ্জন-কে সরিয়ে দিলে যখন আপাত বাস্তবের বা শিল্পের মায়া মোচন হয়, তখন থাকে কী? নগ্ন বাস্তবতার তিক্ত চেহারা? সাধারণত্বের ধূলিমলিন অনুজ্জ্বলতা? এ দুটি সম্ভাবনা তো আছেই, আছে তৃতীয় আরো একটি শিল্প সম্ভাবনা। নিছক কৌতুকের চেহারায় যা প্রতিভাত হয়, যেমন সুকুমারেব নাটকের চরিত্রে। প্রয়োগ পদ্ধতিটা সুকুমারের অনন্য বা মৌলিক নয়, তবে, প্রধানত এটাই তাঁর নাটকে বেশিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাস্তবে বা সাহিত্যে কিছু চরিত্র শ্রেণী বা ব্যক্তি হিসাবে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা/অমর্যাদার আসন স্তরমাফিক অর্জন করে। সমাজ যতদিন মাত্রাগত বা গুণগত পরিবর্তন বেশ বড়ো মাপে সম্পন্ন না করে, তত দিন চরিত্রের প্রতি সমাজের ও সাহিত্যের মনোভাবটা বজায় থাকে, সিদ্ধরসটা থাকে। নিয়ম মাফিক সব চলতে থাকে, কাঠামো থাকে। সময় বদলে সমাজ

ভাঙে, মূল্যবোধ ভাঙে, সিদ্ধরস ভাঙে, চরিত্রের নির্দিষ্ট জায়গা টলে, সিরিয়াস কমিক হয়, কমিক সিরিয়াস হয়। সূর্পনখা 'বীরাঙ্গনা' হয়, মহাকাব্যিক রামায়ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ' (লক্ষ্মণের শক্তিশেল) হয়। এই উলট্-প্রক্রিয়া তো উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যে বেশ ভালোভাবেই অস্তিত্ব জাহির করতে শুরু করেছিল। কখনো বাস্তবের প্যারডি, কখনো সাহিত্যের প্যারডি, কখনো দুয়ের মিশ্রণ। যেমন, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ; যেমন, পাক্কা তামাশা; যেমন, অলীকবাবু। তাহলে সুকুমার কোন্ শ্রেণীতে পড়েন, তাঁর অনন্যতাই বা কি? ননসেন্স রাইমের ক্ষেত্রে বাংলায় তিনি অনন্য, অতুলনীয় এবং সর্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু নাটকেব ক্ষেত্রে তাঁর সংলাপ সংস্থান দক্ষতা, বাচনিক অভিনয়যোগ্যতা এবং সুবিধাজনক নিরাপদ কৌতুককরতা সত্ত্বেও আমাদের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের জায়গা নেই। লক্ষণগুলো নির্দেশেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এবং তা বঙ্গীয় ও সর্বভারতীয় মূললক্ষণের বীজবাহক বলেই মূল্যবান।

জাতীযতাবাদ ও দেশপ্রেম প্রথম পর্যায়ে, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, আত্মমর্যাদা অর্জনের যে ধারার সৃষ্টি করেছিলো, সুকুমারের শৈশব সেই ধারায় লালিত ও পরিপুষ্ট, এবং তাঁব সৃষ্টিশীল জীবনের ওপর তারই প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ফলে তাঁব সাহিত্যে ও কর্মে যে মূল প্রেরণা তা ওই মধ্যবিত্তের ও শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতীয়ের আত্মমর্যাদা অর্জন ও রক্ষার সমস্যা। এই আত্মমর্যাদার ধারায় অতীত ও বর্তমানেব গৌববসূচক আখ্যান ও চবিত্র মহিমা প্রচার, মূলত যা ভাবাবেগাশ্রয়ী, এই অভিব্যক্তিব বিপরীতে মূলত বর্তমানেব, কিছুটা অতীতেরও, সমালোচনা, ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ। সুকুমারের সৃজনশীল রচনা ওই ব্যঙ্গাত্মক ধাবারই অনুসারী; ব্যক্তি, পরিবাব, আর্থনীতিক স্তবগত সমাজের (উচ্চ বা মধ্য) বিত্তভিত্তিক অবস্থান ও বঙ্গীয় বা ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার অবস্থানগত (strata) সম্পর্কের বিশিষ্টতায তা সুকুমারেব মানসে ও কলমে একটি অনন্য রূপ নিশ্চয়ই পেয়েছে। সুকুমারেব সাহিত্যে সমালোচনা parody বা inversion-এর রীতিতে এসেছে, পরোক্ষতায় এসেছে, তাই স্থানিক, কালিক ও মানসিক দিক থেকে তাব সমকালীনতা যাই থাকুক, তা একটা স্থানকালপাত্রের ওপবে সর্বজনীনতা অর্জন কবেছে। আজও তাই উপভোগ্য থাকছে। ১৯১১ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর ছোটোবড়ো নাটকগুলি লেখা হয়েছে। ঝালাপালা (১৯১১) এবং লক্ষ্মণেব শক্তিশেল (১৯১১) বিলেত যাবাব আগে, আর, বাকি নাটকগুলি বিলেত থেকে ফিরে আসাব পর লেখা। বিলেতপূর্ব নাটকদুটি ননসেন্স ক্লাবের আত্মীয়স্বজনদের জন্যে লেখা; ছোটো গন্ডীর নাট্যচর্চা প্রসঙ্গত ছোটো মাপের বঙ্গব্যঙ্গেই সন্তুষ্ট, বিষয়টিও মোটামুটি প্রথাগত ব্যঙ্গেব ধারাবাহী, ঝালাপালায় জমিদার-মোসাহেব এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পৌরানিক মহিমাকে তুচ্ছতার স্পর্শে হাস্যপরিহাসের স্তরে নিযে আসা। কিন্তু বিলেত-পববর্তী মন্ডা ক্লাবের পর্যায়ে তিনটি নাটক বিশেষ মনোযোগ দাবি করে; এগুলির প্রসঙ্গ ও প্রকাশ একটি আলাদা মাত্রার শিল্পকর্ম। ঝালাপালা (১৯১১) থেকে চলচিত্তচঞ্চরি (১৯১৬? ১৭?) পর্যন্ত নাটকগুলিতে একটা দিক থেকে ধারাবাহিকতা রয়েছে, চরিত্রগুলিকে দেখার এবং ফলত উপস্থাপনার দিক থেকে একটি সুকুমারীয় প্রবণতা,—চরিত্ররা যার-যার টাইপের নিকৃষ্টতর টাইপ, যা হওয়া উচিত, তা নয কেউ যেন, কাজেই ঠাট্টার পাত্র তারা। তাই তাঁর নাটকে পন্ডিত (ঝালাপালা) পন্ডিত নয় মূর্খ, ছাত্ররা ছাত্র নয় ডেঁপো, দেবতারা দেবতা নয় বীরেরা বীর নয়, হ্যাংলা এবং ভীরু (লক্ষ্মণের শক্তিশেল); জ্ঞানীবা জ্ঞানী বা বিনয়ী নয়

(চলচিত্তচঞ্চরি) কুঁদুলে, ভাবুকরা (ভাবুকসভা) ভাবশূন্য কেননা 'ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া', যেমন গুরু তেমন শিষ্য (শ্রী শ্রী শব্দকল্পদ্রুম)। মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিকতা এখানেই। সুকুমারের নাটকে আদর্শ মানুষ কই? ১৯২২ সালেব জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'অতীতের ছবি' নামক কবিতার পুস্তিকায় ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমাজসংস্কারক নেতাদের সপ্রশংস উল্লেখ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু নাটকে সেবকম নেই। সুকুমারের নাটকে ক্রিয়া কম কথা বেশি, সম্ভবত এজন্যেই যে চরিত্রেরা প্রায় সবাই বাক্যবাগীশ কর্মবিমুখ। বিশ শতকের প্রথম দু' দশক-এর মধ্যেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় বিজ্ঞান ও কারিগরির ক্ষেত্রে আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠছিলো, সুকুমারদের পরিবার এবং তিনি নিজেও সেই পথে এগোচ্ছিলেন, কাজেই কর্মী মানুষের পরিচয় চারপাশে একেবাবেই ছিলো না তা নয়। তবে সবাই তো আর বিদ্যাবুদ্ধি ও সামাজিক কৌলিন্য সত্ত্বেও প্রফুল্ল রায়ের মতো বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্যকে একই কর্মকাণ্ডের মধ্যে সক্রিয় করতে পারেনি! মধ্যবিত্তের বড় অংশই তো কেতাবি বিদ্যার নিষ্ফলা আবর্তে পাক খায়; সুকুমারের 'জীবনের হিসাব' কাব্যে বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইয়ের প্রতি কবির মনোভাব খুব স্পষ্টভাবেই ঠাট্টার এবং করুণাব। কাজেই সেই তীর্যক মনোভঙ্গি থেকেই বাকসর্বস্ব চরিত্রাবলি তাঁর নাটকে বার বার আসে। বিরক্তি চাপতে সস্নেহ, বিষাদ ঢাকতে আনন্দোচ্ছল, সত্য ঢাকতে অতিরঞ্জন, নিঃসঙ্গতা ঢাকতে শব্দের কল্লোল, কড়া সমালোচনা আড়াল করতে নির্মল হাস্যের আববণ — এই হচ্ছে সুকুমারেব শিল্পেব মূল কাঠামোর বিপ্রতীপতা, নাটকেও তাই কর্ম ও বাক্যের দ্বান্দ্বিকতা, শব্দ ও অর্থেব দ্বান্দ্বিকতা।

৪

প্যারডিব দ্বান্দ্বিকতা প্রকাশেব ভাষাগত দিক থেকে একটি দ্বান্দ্বিকতা অবশ্যই সৃষ্টি করে, শুধুমাত্র ছন্দ বা কাব্যকাঠামোর সঙ্গেই তা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে ন্যস্ত নয়। ভাষাগত এই দ্বান্দ্বিকতা কি রকম? প্যারডিতে আসলে তো রূপের আপাত-অবৈকল্যের সঙ্গে প্রসঙ্গ, বিষয় বা ভাবের বৈপরীত্য ঘটানো হয়। শব্দেব বা ভাষার ক্ষেত্রে এর সমতুল্য রূপান্তব হলো শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থের প্রচলিত সম্পর্কের পরিবর্তন। 'মক্ষিকা চক্র' কথাটির প্রাথমিক অর্থ মৌচাক, বাংলায় এর ব্যঞ্জনার্থ (metaphorical meaning) প্রচলিত আছে, মজা লে'টার কেন্দ্র হিসাবে; 'চলচিত্তচঞ্চবি' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সমীক্ষা মন্দিরে সমীক্ষা চক্র বসেছে, আমন্ত্রিত ভবদুলালও আছে।

> ভবদুলাল। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?
> নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না — স্থিব হয়ে বসুন।
> সোমপ্রকাশ। মক্ষিকা নয় — সমীক্ষা।

এখানে সমীক্ষা চক্রের প্যারডি হিসাবে মক্ষিকা চক্র কথাটি এসেছে। এই নাটকের প্রাসঙ্গিক 'সমীক্ষা চক্রের' সম্পর্কে লেখকের উদ্দেশ্যমূলক ও অভিপ্রেত মনোভঙ্গির বক্রতায় ব্যবহারের ফলে 'মক্ষিকা চক্র' শব্দগুচ্ছ এর প্রাথমিক ও মেটাফরিকাল দুটো অর্থ থেকেই কিছুটা সরে এসেছে। প্যাবডি-রচয়িতারা শব্দের প্রয়োগে এই দ্বান্দ্বিকতা — শব্দ ও অর্থের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা বেশ সচেতন ভাবেই লক্ষ করেন। রোমান্টিক কবিরাও অবশ্য বাস্তবাতিরেক অর্থ ও ভাবের আবেগে সামাজিক শব্দার্থের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করেন, শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করেন,

সেটা প্যারডি-শিল্পীর শব্দসমস্যার বিপরীত ধরনের; রোমান্টিক কবি শব্দের খাঁচা খুলে দেন, ব্যঙ্গকবি শব্দের ডানা কাটেন। এ দুয়ের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতা তাই অনস্বীকার্য। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' এবং 'ভাবুকসভা'র মূল প্রসঙ্গটাই এই সমস্যাভিত্তিক। চলচিত্তচঞ্চরি-তে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন উপদলীয় দলাদলি ও অর্থহীন কচকচানি, শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে হিন্দু অধ্যাত্মবাদীর বাস্তবতাবর্জিত তাত্ত্বিক কচকচানি এবং ভাবুকসভায় নিষ্ক্রিয় আলস্য সুকুমারের ঠাট্টার বাস্তব ভিত্তি, যদিও নাটকীয় সংস্থানে দৃশ্যত তারা অবাস্তব আতিশয্যের দিকেই ঝোঁকে।

নাটকে সুকুমারের মূল ঠাট্টাটা ভণ্ডামির প্রতি, কর্মবিমুখ বাক্যবিলাসীর প্রতি। এবং নাটকে তাঁর অভিব্যক্তিও কর্মবিরল বাক্যবিলাসেই প্রতিফলিত। এটাও ঘটছে দ্বান্দ্বিকতার এক নিয়মেই, বিপরীতে রূপান্তর, একে অন্য হয়ে ওঠায়। অর্থাৎ, বাকসর্বস্বতাকে সমালোচনা করতে গিয়ে সুকুমার তাঁর নাটককে বাকসর্বস্ব, কথাপ্রধান করে তুলেছেন, ঘটনার গতিবেগের পরিবর্তে সংলাপের চমৎকারিত্বই তাঁর নাটকের প্রধান আকর্ষণ! ভাষার প্রাথমিক উপাদান শব্দ; এই শব্দের স্বরূপ সম্পর্কে প্রায়-তাত্ত্বিক মন্তব্য ও প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনা শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যেমন একসময় বাল্মীকির জবানিতে বলতে চেয়েছেন 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ', তাঁর শব্দার্থের সম্পর্ক নিয়ে ওই ভাবনার পিছনে ছিলো রোমান্টিক কবির লোকোত্তর উপলব্ধি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা; শব্দকে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত করার আরেক রকম অভিপ্রায় ছিলো মালার্মের, যিনি কবিতাকে করতে চেয়েছেন শাদা কাগজের মতো শূন্যতায় মৌন; উভয়তই ভাববাদের ভিত্তি স্পষ্ট। সুকুমার মূলত ভাববাদকে আক্রমণ করলেও, শব্দ সম্পর্কিত ওইসব সূক্ষ্ম, জটিল ও জরুরি চিন্তাকে তাঁর নাটকে প্রায়-অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে, গদ্যে-পদ্যে, কৌতুকে-গাম্ভীর্যে মিলিয়ে প্রকাশ করেছেন। গুরুজি বলেন —

> এক-একটি শব্দ এক-একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাই কথা বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্দ্ধমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কিনা '... পথ-পথ করে সব ঘুরে বেড়ায় —কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

গুরুজির সংলাপ ও চরিত্র সম্পর্কে লেখকের ব্যঙ্গকৌতুক চাপা নেই, অথচ শেষের কথা কয়টি 'শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই' ভিন্ন অর্থে ও প্রসঙ্গে সুকুমার সম্পর্কে কতখানি প্রযোজ্য তা আজ সবাই জানি। শব্দেই তিনি বাঁচেন। আসলে গুরুজি যা করতে চান —

> জ্যান্ত-জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে-ধরে
> মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে-জমে
> উঠতে থাকবে — আর ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলবে।

গুরুজিরা একথা বলছেন আসলে বস্তুবাদ ও বস্তুজগতকে নিশ্চিহ্ন করে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। শব্দে যেহেতু বস্তুবিশ্ব প্রতিফলিত হয়, সেজন্য অর্থের 'বিষ' ঝাড়তে হবে, 'বস্তুতত্ত্ব বদ্ধ মায়া', তাকে পরিহার করতে হবে। গুরুজির 'শব্দসংহিতা'য় আছে —

> শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই তো শব্দলীলা,
> যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত্য তাঁহা পাতালপুরী

সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি।
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন 'আদ্যিকালের শাদাব নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।'

অধ্যাত্মবাদের সমালোচনাই হোক, আর কর্মবিমুখ ভাববিলাসীদের ঠাট্টাই হোক, নাটকের চরিত্রগুলি ও তাদের সংলাপের রচয়িতা তো সুকুমারই। ঐ 'শব্দসংহিতা'র প্রকৃত রচয়িতা তো সুকুমার রায়, আবোল তাবোল ননসেন্স-এর অনন্য শিল্পী, ফলত গুরুজির শব্দতত্ত্বকে সিরিওকমিক কাঠামোয় ন্যস্ত করে যে ছন্দবদ্ধ বাক্যরাজি সৃষ্টি করেন লেখক, তা আমাদের চেনা সুকুমারের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। কেননা প্যারডি বা নন্-সেন্স-কাব্যে-তো 'সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি'। একশো বছর পর কেতাবিরা নন-সেন্স আর সেন্স, অর্থ আর অনর্থের দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে মরছি। অথচ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের তৎকালীন শাদা-কালো ভালো-মন্দ এক অদ্ভুত সারল্যে, ঠাট্টা পরিহাসে, অভিব্যক্তির লুকোচুরিতে শব্দের চক্রে ধৃত হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুমের তৃতীয় দৃশ্যে বিশ্বকর্মা শব্দসংকটে ক্রম-উধাও বিশ্বব্যাপারকে রক্ষা করার জন্য যে উদ্ভট মন্ত্রপাঠ করেন সেটা একটা চমৎকার নন্-সেন্সের উদাহরণ, অর্থহারা শব্দসঙ্গমে রচিত এই মন্ত্রটি গুরুজির সশিষ্য অর্থহীন শব্দযাত্রাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। নাটকের এই মন্ত্রটি সুকুমারের 'দ্রিঘাংচু' গল্পেও অংশত ব্যবহৃত হয়েছে; গল্পেও যেমন অ্যাবসার্ড বাস্তবের সঙ্গে শিল্পসংগত ভাবে ওই অ্যাবসার্ড বা অর্থহীন মন্ত্রটি এসেছে, নাটকেও বস্তুবাদবর্জিত গুরুজিদের অ্যাবসার্ড দর্শনের অবাস্তবতাকে চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে এই অদ্ভুত শব্দসমাবেশ —

হলদে সবুজ ওরাংওটাং — ইটপাটকেল চিৎপটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি — নো অ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা — নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আসান উড়ে মালি — ধর্মতলায় কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি — ব্লটিং পেপার বাঘেব মাসি।

বিশ্বকর্মার এই মন্ত্রপাঠের ফলে স্বর্গপথগামী সশিষ্য গুরুজির গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসে। বিশ্বকর্মা যেমন, সুকুমারও তেমনি বাস্তবের অ্যাবসার্ডকে প্যারডির মানসিকতায় শিল্পগত অ্যাবসার্ডের বাস্তবতা দিয়ে আঘাত করেন। বাস্তব ও অ্যাবসার্ডের এই দ্বান্দ্বিকতাই সুকুমার সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।



সুকুমার পাঠক

শিশিরকুমার দাশ

মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায়না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।

'আবোল তাবোল' বা 'হযবরল' কিংবা 'পাগলা দাশু' কাদের জন্য লিখেছিলেন সুকুমার রায়? কারা তাঁর অভিপ্রেত পাঠক? অবশ্যই বড়োরা তাঁর লেখা থেকে আনন্দ পেয়ে থাকেন, উৎসাহের সঙ্গে পড়েন, তবু তাঁর অভিপ্রেত পাঠক কি তাঁরা? কেউ বলতে পারেন, লেখার আবার অভিপ্রেত পাঠক কি, একজন লেখকের লেখা সকলের জন্য, জাতি, ধর্মের প্রশ্ন যেমন সেখানে অপ্রাসঙ্গিক, পাঠকের বয়সের প্রশ্নও সেই রকম অবান্তর। প্রশ্নটা যদি অবান্তর হয়, তাহলে অবশ্য শিশুসাহিত্য নামে সাহিত্যের একটা শ্রেণী বিভাগও অবান্তর।

লেখক কখনও কখনও সচেতনভাবেই একদল পাঠকের কথা ভেবে লেখেন। অন্যরা সে লেখা পড়তে পারেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলেই অভিপ্রেত পাঠকের কথাটা অবান্তর হয়ে যায়না, মূল্যহীনও হয়না। রামায়ণ বা মহাভারতের অভিপ্রেত পাঠক বিশেষভাবে শিশু নন, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর যখন রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প লেখেন তখন তিনি বিশেষভাবেই ছোটোদের জন্য লেখেন। রামায়ণ মহাভারত বয়স্ক পাঠকের জন্যই রচিত হয়ে ছিল বলেই তার শিশু সংস্করণ তৈরি করতে হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরকে। শুধু যে কতকগুলি বিষয় বা সমস্যা বয়স্কদের জগতকে শিশুর জগতের থেকে পৃথক করে দেয় তাই নয়, তাহলে তো বয়স্কদের সাহিত্যের 'বিষয়' বা 'সমস্যা'গুলিকে বাদ দিলেই রামায়ণ মহাভারত অবলীলায় শিশুসাহিত্য হয়ে উঠত। তাহলে তো বয়স্ক সাহিত্যের একটা বড়ো অংশই সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করতে পারলেই অনায়াসে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অভিপ্রেত পাঠকের প্রয়োজনেই বিষয় বদলায়, বদলে যায় রচনার চরিত্র, কল্পনার প্রকৃতি এবং বলার ভঙ্গি। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় যেমন যার সঙ্গে কথা বলি তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে বদলে যায় আমাদের স্বরভঙ্গি, আমাদের শব্দ, এবং আমাদের অ-বাচনিক ব্যবহার, তেমনই অভিপ্রেত পাঠক যখন বয়স্ক পাঠক নয়, তখন আমরা একটা স্বতন্ত্র বাচনিক জগতে প্রবেশ করি। বিষয়ের চেয়েও এই বাচনিক জগতের ভিত্তিতেই আমরা শিশু সাহিত্যকে চিনে নিই, সহজে চিহ্নিত করি সুকুমার রায়ের পাঠককে।

অবশ্য অভিপ্রেত পাঠকই তাঁর একমাত্র পাঠক নন, বয়স্করাও তাঁর পাঠক। আর যেহেতু তাঁর পাঠক সমাজ বয়সের দিক দিয়ে দুটি দলে বিভক্ত, তাঁদের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই এক নয়। শিশুদের প্রতিক্রিয়া কেমন তার লিখিত পরিচয় আমরা পাইনা। সৌভাগ্যবশত (বা শিশুদের সৌভাগ্য এই যে) তারা সাহিত্য শুনে বা পড়ে আনন্দ বিস্ময় বেদনা যাই বোধ করুক, সাহিত্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব নেয়না। সে কাজ করে থাকেন বয়স্ক পাঠক। শিশুসাহিত্যের রচয়িতা যেমন শিশু নয়, বয়স্ক

পাঠক; শিশুসাহিত্যের ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষকও বয়স্ক পাঠক। কিন্তু বয়স্ক যখন শিশুসাহিত্য বিচার করেন তখন কি শিশুর প্রতিক্রিয়াকে তিনি মূল্যবান মনে করেননা ? শিশুর প্রতিক্রিয়া যদি মূল্যবান না হয়, তাহলে শিশু সাহিত্য বিচারের যত সূক্ষ্ম পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন শিশু সাহিত্যের মূল প্রকৃতি বোঝার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রকেই অস্বীকার করা হবে। আর যদি সেই প্রতিক্রিয়া মূল্যবান হয়, তাহলে বয়স্ক তাকে জানেন কেমন করে ? বয়স্করা জানেন, দুটি পথে : এক, তাঁদের নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে, আর দুই, তাঁদের পরিচিত শিশুদের প্রতিক্রিয়া দেখে। প্রথমটি তাঁদের স্মৃতি থেকে পাওয়া; দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ বর্তমান অভিজ্ঞতা নির্ভর। অভিজ্ঞতা নির্ভর কিন্তু নিজস্ব অনুভূতি নির্ভর নয় --- কেন বা কোন বিশেষ কারণে শিশু সাহিত্যের কোন বিষয়, কোন বাচনভঙ্গি, কোন কল্পনার জগৎ শিশুর মনে কেমন প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলছে তা বয়স্ক স্পষ্ট করে জানেন না, অনুমান করতে পারেন মাত্র। বয়স্ক যেমন তাঁর স্মৃতি (শৈশব স্মৃতি) আর শিশুর আচরণ ও দাবি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে শিশুসাহিত্য রচনা করেন, শিশু সাহিত্য বিচারেও তাঁর অবলম্বন তাই।

আমরা যখন শৈশবে 'আবোল তাবোল' বা 'হযবরল' পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম প্রথম সেই স্মৃতি কি আমরা পুরোটা ধরে রাখতে পেরেছি ? সেই প্রথম পড়ার আনন্দ, তৃপ্তি, উত্তেজনার কিছু চিহ্ন নিশ্চয়ই আমাদের মনের কোন স্তরে থেকে গেছে, কিন্তু আমরা কি তাকে উদ্ধার করে আনতে পারি তার সমগ্রতায় ? তাকে ফিরে পেতে পারি অবিকৃত ? যাকে আমাদের প্রথম পাঠের স্মৃতি বা শৈশবের স্মৃতি বলে মনে করছি তা কি শৈশব পরবর্ত্তী জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় কিছুটা আবিল হয়ে যায়নি, রূপান্তরিত হয়নি অনেকটাই ? এখন 'আবোল তাবোল' পড়ে যে আনন্দ পাই তা কি আমাদেব শৈশবের পাঠের অনুভূতিব সঙ্গে অভিন্ন ? আর সব সাহিত্য পাঠের মতোই শিশু সাহিত্য পাঠের অনুভূতির রংগুলি বদলে যাচ্ছে অভিজ্ঞতার স্তব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ?

যেভাবে শিশু পাঠ করে 'আবোল তাবোল', স্বাভাবিক কারণেই বয়স্ক সেভাবে পড়েনা, পড়তে পারা সম্ভবই নয় তাব পক্ষে। আর তার ফলে শিশুর ও বয়স্ক পাঠকের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই সুকুমার রায়ের বচনার মূল্যাযণ চলেছে দুভাবে, দুপথে। গত সত্তর বছর ধরে বাঙালী শিশু-বালক-কিশোরের কাছে সুকুমার বচনাবলী প্রিয়; গত সত্তর বছর ধবে তাঁর জন্য শিশুদের অভ্যর্থনা, গত সত্তর বছর ধরে প্রবাহিত একটি অব্যাহত ধাবা। এই অব্যাহত ধারাই একটি মূল্যায়ণ, সুকুমার রায়ের অভিপ্রেত পাঠকের প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞান। আর দ্বিতীয় পথে যে মূল্যায়ণ চলেছে তাব ভিত্তি বয়স্কের প্রতিক্রিয়া। দুটি মূল্যায়ণের ভেতরে একটা যোগ অবশ্য আছে। কারণ বয়স্কের শিশু সাহিত্য পাঠে তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতা কিছুটা মিশে আছে, আর শিশুর সাহিত্য পাঠও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় বয়স্কেরই দ্বারা, কারণ বয়স্কই শিশু সাহিত্যের রচয়িতা।

বয়স্ক শুধু যে শিশু সাহিত্য রচনা করেন তাই নয়, শিশু যে সাহিত্য পড়ে তার নির্বাচনেও বয়স্কের একটি ভূমিকা আছে। বয়স্কই শিশুকে ছড়া শোনায়, গল্প শোনায়, শিশু বই পড়ায় বাছাই-র ব্যাপারেও তার ব্যাপক ভূমিকা। মোটামুটি দেখা গেছে যে শিশু সাহিত্যের বাছাইর ব্যাপারে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের রুচির ঐক্য যত বেশি তেমনটি আর সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে নয়। ইংরেজ শিশুকে ইংরেজ পিতামাতা গত একশবছর ধরে অব্যাহত পড়তে

দিচ্ছেন 'অ্যালিস ইন দি ওয়ানড্‌ারল্যান্ড'। অনুমান করা চলে ইংরেজ শিশুর প্রতিক্রিয়া এখনও এক। বয়স্করা এই বই পড়ছেন ভালো লাগছে বলে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের পড়তে দিচ্ছেন কারণ বইটিকে তাঁরা ছোটদের উপযোগী মনে করেন বলে। কিন্তু বড়োদের ও ছোটোদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন, অর্থাৎ ভালো লাগার কারণ ভিন্ন। শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাগুলি পড়লে দেখি বড়োরা নানা গভীর জটিল বিষয়ের অবতারণা করেন, প্রশ্ন তোলেন লেখকের মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে, সন্ধান করেন লেখাগুলির সামাজিক পটভূমি, আলোচনা করেন নন্দনতত্ত্বের দুরূহ প্রসঙ্গ। এসব প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই অবান্তর নয়, কিন্তু জরুরি কিনা সে প্রশ্নও আশা করি অবান্তর নয়। যদি জরুরি হয়, তাহলে কি ভাবব যে শিশুসাহিত্য যাদের জন্য লেখা, তাদের কাছেও এগুলি জরুরি? আর যেহেতু কোনও শিশুকে আমরা এই সব সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হতে দেখিনা, তাহলে কি বলব যে সে এই সাহিত্যের আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারে না। সে আনন্দ পায় ঠিকই, কিন্তু ভুল কারণে আনন্দ পায়? আর যদি বলি বড়োদের আলোচিত সমস্যাগুলি জরুরি নয়, তাহলে দাঁড়ায় যে এই সমস্যাগুলি হয় আরোপিত, নয় নিরর্থক; অথবা আরোপিত বলেই নিরর্থক।

অথবা, আমরা কি বলব যে বয়স্ক যখন শিশুসাহিত্য পড়েন তখন তা আর শিশুসাহিত্য থাকেনা, তা রূপান্তরিত হয়ে যায় বয়স্ক সাহিত্যে। তাহলে একথাও মানতে হয় যে একথা যেমন সত্য যে শিশুসাহিত্যের অভিপ্রেত পাঠক শিশুই এই সাহিত্যের চরিত্র নির্ণীত করে দেয়; আবার একথাও সত্য যে বয়স্ক যখন শিশুসাহিত্য পড়েন, তখন তিনি সেই সাহিত্যের মৌল চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। 'ঘটিয়ে দেন' না বলে 'ঘটিয়ে নেন' বলাই সঙ্গত। শিশু সাহিত্য আস্বাদনে বয়স্কমন কি একটা অস্বস্তি বোধ করে? শিশুসাহিত্যের জগৎকে মনে হয় বড়ো বেশি সহজ, তাই কি কোনও অন্তর্নিহিত গভীর গূঢ়ের সন্ধান করতে প্ররোচিত হয়? রবার্ট ফিলিপ্‌স, ফ্লোরেন্স বেকার লেনন, রোজার হোমস্ প্রভৃতি সুধীর অ্যালিস ইন দি ওয়ানডাবল্যান্ড সম্পর্কিত আলোচনা পড়ে আমি বেশ বিহ্বল বোধ করি, মনে হয় এই গ্রন্থের জটিলতা সম্বন্ধে কেন অনবহিত ছিলাম এতদিন, সে কী আমার নির্বুদ্ধিতা, না নাবালকত্ব। রোজার সেল নামে এক মার্কিনী পন্ডিত *Fairy Tales and After* (হাভার্ড, ১৯৭৮) গ্রন্থে লুইস ক্যারল সম্বন্ধে লিখছেন যে "তাঁর লেখার একটা ধর্ম খুব প্রবল ভাবে উদ্‌ভাসিত, তা হোল প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর অভিলাষ... আর যে সুরটি তাঁর লেখায় বারবার বেজে ওঠে তা হোল এই নিয়ম, শৃঙ্খলা, শিষ্টতা, সমাজের সাধারণ রূপ সবই ভেঙে যায় স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, নির্বুদ্ধিতা, পান্ডিত্য, অদূরদর্শিতা, প্রচন্ড কামনা, এমন কি কখনও কখনও ভদ্রতার চাপে। ডজসন অ্যালিসকে ভালোবাসেন কিন্তু লুইস ক্যারল তাঁর প্রতি নির্দয়; যা কিছু তাঁকে জীবনে পীড়িত করেছে, তাদের সব কিছুর সামনে তিনি উপস্থিত করেছেন অ্যালিসকে — যে শিক্ষকেরা তাঁকে যন্ত্রণা জর্জর করে তুলেছিল তাদের সামনে; যে গভর্নেসের সঙ্গে রানীর মিল, যে ডাকসাইটের আদলে গড়ে ওঠে ডাচেস, যে গুন্ডা চ্যাংড়ারা টুইডলেডাম এবং টুইডলেডি-র মতো আচরণ করত তাদের সামনে, যে হাম্‌টি-ডাম্‌টি-রা দেয়ালের ওপর বসেই থাকত, তাদের সামনে —"। যদি ধরেই নিই যে ক্যারলের লেখা প্রতিহিংসার এক নিষ্ঠুর অভিলাষ প্রতিফলন, তাহলে জানতে ইচ্ছে করে প্রতিহিংসার এই নিষ্ঠুর ইচ্ছাই কি অ্যালিসকে একশবছর ধরে কয়েক প্রজন্মের শিশুর কাছে আকর্ষণ যোগ্য করে রেখেছে? শিশুরা মূল ব্যাপারটা না বুঝে বাইরের ঘটনাগুলিতে মজা পেয়েছে? মূল ব্যাপার বোঝার জন্য 'বড়ো' হওয়া

দরকার। লুইস ক্যারল যা লিখেছেন আসলে তা বড়োদেরই জন্য? সুকুমার রায়ের অনেক রচনার সাম্প্রতিক ব্যাখ্যার কথা মনে রাখলে এমন সন্দেহ হতে পারে যে তাঁর লেখার অনেকটাই ছদ্মবেশী বয়স্ক সাহিত্য।

২

সুকুমার রায় তাঁর একটিমাত্র বই-র ভূমিকা লিখে গিয়েছিলেন, আর সেখানে তিনি তাঁর জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেমন অ-দ্ব্যর্থক মন্তব্য করেছিলেন, তেমনই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অভিপ্রেত পাঠক কারা। "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট এবং যাহা অসম্ভব', তাদেরও সৃষ্টির পেছনে একটি জটিল প্রক্রিয়া আছে, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের নানা অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত; এবং তার আলোচনা অবশ্যই সাহিত্য আলোচনার বিধিসঙ্গত ক্ষেত্র। শিশু সাহিত্যের আলোচনাও স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে হতে পারে। এই আলোচনার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ যে তা শিশু সাহিত্যের চরিত্রকে উদভাসিত করেনা, শিশু সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণেও ভুল ইঙ্গিত দিতে পারে, শিশু সাহিত্য কোথায় অন্য শ্রেণীর সাহিত্য থেকে পৃথক তা বলতে পারেনা। বরং একটা ভুল ধারণা দিতে পারে, যেন এই সাহিত্য একটা মস্ত বড়ো রূপক, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে বেশ কিছু তত্ত্বকথা; কিংবা এই সাহিত্য যেন লেখকের আত্মগোপনের জায়গা, আর সমালোচকের কাজ হোল সেই রূপক ভেঙে তত্ত্বকথাগুলিকে বাইরে আনা, কিংবা লেখকের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলে সত্য রূপটি প্রকাশ করে। একে ভুল ধারণা বলছি এইজন্য যে শিশু সাহিত্যকে এইভাবে বিচার করলে যা সবার আগে আহত হয়, তা শিশু সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শক্তি।

'হযবরল'-এর শেষে আছে: 'আমি বড় মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড় মামা বললেন, "যা 'যা' কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।" বয়স্কের কাছে জগৎটা অর্থবান, যেখানেই মনে হয় অর্থ ছাড়া, সেখানেই অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হয় তাকে। তাকে গড়ে তুলতে হয়, অন্তত চেষ্টা করতে হয়, একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠনের। এই সংগঠনের বাইরে যা তাই পাগলামি, তাই 'বাজে স্বপ্ন'। অথচ শিশু সাহিত্যের বড়ো উপাদানই শৃঙ্খলা ভাঙার উপাদান, সংগঠনহীনতার উপাদান। আর বয়স্ক ও শিশুর সাহিত্য জগতের মূল পার্থক্য সেইখানে।

তার মানে এই নয় যে সংগঠন, শৃঙ্খলিত নিয়মবদ্ধ জগতের স্থান নেই শিশু সাহিত্যে। তা কখনও দেখা দেয় উপদেশাত্মক কিংবা নৈতিক সাহিত্যের রূপ ধরে (শিশু সাহিত্যের একটা বড়ো অংশই ভালোর জয়, মন্দের পরাজয়, মন্দ থেকে ভালোয় পরিবর্তন, আদর্শের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের পতন ইত্যাদি); আবার কখনও স্বাভাবিক কার্যকারণসূত্রে গাঁথা কাহিনীতে। এই দুই ক্ষেত্রেই বয়স্ক সাহিত্যের সঙ্গে তার গঠনগত মৌল পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু বিষয়ে, সমস্যায়; যে সব বিষয় বয়স্কের সাহিত্যে জটিলতা নিয়ে দেখা দেয় সে সব বিষয়কে সরিয়ে রাখা হয় শিশুর জগৎ থেকে।

যেখানে দুই সাহিত্যে পৃথক সে পার্থক্য কল্পনার ভঙ্গিতে। আর এখানেই সুকুমার রায়ের স্বাতন্ত্র্য।

সাধারণভাবে আমরা লক্ষ করি শিশুসাহিত্যের মধ্যে একটা মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পায়, তা হোল সংগঠিত জগতের নানা নিয়মের প্রতি তাঁর বিরোধিতা। শিশু চরিত্রগুলি মনে করে বয়স্কের জগতের মধ্যে একটা স্থাবরতা আছে। বয়স্কের নিয়মশৃঙ্খলা সবই শিশুর স্বাধীনতার বিরোধী। হয়তো এ লড়াই তার জীবনেই আছে: শিশু যা করতে চায় তার বাধা আসে বয়স্কের কাছ থেকে — শিশু সাহিত্যে এই প্রতিবন্ধকতার আবহাওয়াটা অনেক সময়ই তীব্রভাবে প্রতীয়মান। আর একদিকে তীব্র, কিংবা তীব্রতর তার স্বাধীনতার সন্ধান। বারবার ফিরে ফিরে পাই এক পলাতক চরিত্রকে, হয় সে ঘর-পালানো বালক, কিংবা ভবঘুরে কিংবা দূর দেশের পথিক। পরিচিত জীবনের বন্ধন থেকে দূরে অভিযানের কাহিনী তাই শিশু সাহিত্যের প্রধান উপাদান, প্রধান উপাদান অ্যাড্ভেন্চার। শিশু স্বাধীনতা খুঁজে পায় আর একটা ক্ষেত্রে তা হোল সৃষ্টিছাড়া চরিত্রে। শিশু সাহিত্যের মধ্যেই এই বৈপরীত্যের আততি; সংগঠিত জগতের স্থাবরতার সঙ্গে লড়াই চলছে কল্পনা, স্বপ্ন ও পাগলামির জঙ্গমের।

'পাগলা দাশু'-র গল্পগুলি ধরা যাক। সবকটি গল্পেরই জগৎ শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা — ইস্কুল, মাস্টার মশাই আর সহপাঠী ছাত্রদের নিয়ে এই জগৎ। এই জগতের মধ্যে যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা কেড়ে নেয় সে পাগলা দাশু। শেষ পর্যন্ত শিশুর মনে সন্দেহ দেখা দেয় 'দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল'। শিশুর জগৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এলেও, শিশু মনে মনে খুঁজছে এক 'নায়ক'-কে যে তাকে প্রথা থেকে, বন্ধন থেকে স্বাধীনতা দেয়। সেই 'নায়ক' সমাজের আদর্শ নায়ক সাধারণত নয়, সে অসাধারণ, সে বিশিষ্ট। দাশু সাধারণের থেকে আলাদা — 'দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টা তামাসা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম', কিন্তু তার বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, সে "নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানা রকম অদ্ভুত গল্প বলিত।" এই অসাধারণত্বই তাকে শিশু সাহিত্যের নায়ক করে, সে নেয় শিশুর জীবনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার ভূমিকা। জগবন্ধু যতই ভালো ছেলে হোক, "তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজে বেড়াল আমরা আর দেখি নাই"। এই জগবন্ধুর ব্যাকরণ যখন বদলে যায় লোমহর্ষক ডিটেক্টিভ নাটকে আর "লজ্জায় অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল — আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম।" শুধু হিংসুটে ভেজা বেড়াল ভালো ছেলে জগবন্ধুই নয়, চালিয়াৎ শ্যামচাঁদ, সবজান্তা দুলিরাম, সব বিষয়ে সর্দারি করতে-যাওয়া ভোলানাথ, সবজান্তা দাদা ডিটেক্টিভ জলধর সব চরিত্রই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ঐ সব চরিত্রের পরাজয়ে এক নৈতিক বিশ্বেরই প্রতিষ্ঠা। যে নৈতিক জগৎকে শিশু প্রতিষ্ঠাই করতে চায়, তার জন্য সে চায় এক 'নায়ক'-কে। পাগলা দাশু সে নায়ক। সেই নায়ক সব সময়েই পাগলা হয়েই দেখা দেয় তা নয়, দেখা দেয় অ-সাধারণত্ব নিয়ে, এই অ-সাধারণত্বই শিশুকে দেয় প্রাত্যহিকতার বন্ধন ভাঙার সম্ভাবনা।

কিন্তু সুকুমার রায় যেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা অ-সাধারণত্বের থেকেও এক পাদ অগ্রসর: আজগবি ও উদ্ভটের জগৎ সৃষ্টিতে। এই আজগবি ও উদ্ভটের কৌতুক যেখানে 'প্রকৃত' বা 'সম্ভব'-এর জগতের ধারণার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মনের মধ্যে বইতে থাকে, কিংবা যেখানে

দুয়ের বৈপরীত্যের টানাপোড়েন চলতে থাকে। আর শুধু বৈপরীত্যই নয়, আজগবি ও উদ্ভটকে নিয়ে যে জগৎটা গড়ে উঠতে থাকে তার স্বাতন্ত্র্যও আকর্ষণ করতে থাকে শিশুকে। বয়স্ক দেখতে চায় সেই উদ্ভটের পেছনে বাস্তবের সমালোচনা, শিশু উপভোগ করে উদ্ভটের উদ্ভটত্ব, বাস্তবের সমালোচনামাত্র নয়, বাস্তবকে ছাড়িয়ে একটা সৃষ্টি। অবশ্যই বাস্তব-বর্জিত নয় এই উদ্ভট, সুকুমারের ষষ্ঠিচরণ পালোয়ান, যিনি খেলার ছলে যখন তখন হাতি লোফেন, তিনি এই বাস্তবের পরিস্ফীত রূপ, যে কল্পনায় মানুষ তার সীমাবদ্ধ শক্তিতে অসীম শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চায়, যার রূপ দেখি রূপকথায়, অতিমানব, রাক্ষস, দানব, দেবতায়, সেই কল্পনারই রূপ। 'বুঝিয়ে বলা' কিংবা 'ঠিকানা'-য় যে বয়স্কদের দেখি, এমন কি 'সৎপাত্র' কবিতায়, তাঁরাও বাস্তব ভূমি বর্জিত নন, বাস্তবেরই বাড়িয়ে তোলা, বানিয়ে তোলা রূপ। কিন্তু যখন পড়ি 'খিচুড়ি' কিংবা 'কাঠবুড়ো' কিংবা 'বাবুরাম সাপুড়ে' 'বোম্বাগড়ের রাজা', তখন এই বাস্তব জগৎটাকে পেছনে রেখে ঢুকে পড়ি যথার্থই আজগবি-র মধ্যে। এখানে আর বাস্তবের পরিস্ফীত রূপ নয়, বাস্তবের বিপ্রতীপ বা উল্টে দেওয়া রূপ নয়, এখানে বাস্তবের বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত রূপ। সমস্ত কিছুই বিপর্যস্ত, সবই unpredictable, চরিত্রের আচরণ, কল্পনার প্রকৃতি এবং ভাষা।

হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।

একদিকে যেমন প্রাণিজগতের স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত Category ভেঙে দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন প্রাণী 'হাঁসজারু', তেমনই প্রকাশ হয় ভাষার নিয়ম ভেঙে নতুন শব্দ ('ব্যাকরণ জানিনা'); একদিকে সৃষ্টি হয় নতুন প্রত্যয়, অন্যদিকে তা মূর্ত হয় ভাষায় (কখনও বা ছবিতে)। প্রাণিজগতের Category মিলিয়ে নতুন সৃষ্টির নজির আছে মানুষের আদিম কল্পনায়, পক্ষীরাজ ঘোড়া, মৎসকন্যা, কিংবা শিং-অলা ঘোড়ায়। সুকুমার রায় সেই আদিম কল্পনা শক্তিকে আয়ত্ত করেন, তাকে ব্যবহার করেন বেপরোয়া, কিন্তু বিপুল নৈপুণ্যে। তিনি এই কল্পনার প্রক্রিয়াকে কখনও ব্যবহার করেন সোজাসুজি, কখনও উল্টে দেন তাকে। 'সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট/হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।' — এ যদি হয় প্রক্রিয়ার একদিক, তাহলে 'যে সাপের শিং নেই, নোখ নেই,' তা এই প্রক্রিয়ার আর একটা দিক। এই লেখায় কিংবা 'বলব কি ভাই হুগলি গেলুম/বলছি তোমায় চুপিচুপি/দেখতে পেলাম তিনটে শূয়োর/মাথায় তাদের নেইকো টুপি' — যেন টুপি থাকাটাই স্বাভাবিক, যেন সাপের শিং থাকে, নখ থাকে।

'একুশে আইন' কবিতায় শিবঠাকুরের আপন দেশের সর্বনেশে আইনকানুনগুলি শুনিয়ে দেন কবি। কবিতার মজা যে শুধু একুশ টাকা দন্ড, একুশদফা হাঁচিয়ে মারা, কিংবা একুশ হাতা জলগেলানোয় তা নয়, অপরাধের প্রকৃতিতে। 'সেথায় সন্ধে ছটার আগে/হাঁচতে গেলে টিকিট লাগে' কিংবা কারুর যদি দাঁতটি নড়ে, কারুর যদি গোঁফ গজায়, কারুর যদি নাক ডাকে সবই দন্ডনীয়। 'কুমড়ো পটাশ' কবিতায় এই ব্যাপারটি উল্টে যায়। শিবঠাকুরের আপন দেশে মানুষ স্বাভাবিক কাজের জন্য পায় অস্বাভাবিক শাস্তি; আর কুমড়ো পটাশের স্বাভাবিক কাজের জন্য মানুষকে করতে হবে অস্বাভাবিক আচরণ অর্থাৎ পেতে হবে শাস্তিই। এই সমস্ত কিছুর পেছনেই থাকা সম্ভব আইন-শৃঙ্খলার জগতের অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ; শুধু কৌতুকই নেই এই লেখায়। কিন্তু সুকুমার রায় এই ব্যঙ্গ ও কৌতুক সৃষ্টি করেন যে কল্পনাভঙ্গিতে, সেই কল্পনার প্রধান উপকরণ

উদ্ভট, আর তাই আমাদের আকর্ষণ করে, চরিত্রগুলি, এবং তাদের আচরণ আমাদের "পুরাণ"-জগতের অংশীভূত হয়ে যায়। শিবঠাকুরের আপন দেশ এবং কুমড়ো পটাশ ব্যক্তির কল্পনা থেকে জন্ম নিয়ে আজ হয়ে উঠেছে বাঙালীর পুরাণ জগতের অংশ।

'প্যাঁচা আর প্যাঁচানি' কবিতায় যে পড়ি

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি
খাসা তোর চ্যাঁচানি

চ্যাঁচানি-কে 'খাসা' বলার একটা মজা আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু এও একটা দেখার কৌশলে, যে কৌশলে প্যাঁচার কানে প্যাঁচানির গলা-চেরা গমক, সুরে সুরে প্যাঁচ, 'গিটকিরি ক্যাঁচ ক্যাঁচ' দেখা দেয় মানুষের সুরবোধের বৈপরীত্যে। যেমন বৈপরীত্যে দেখি ভুতুড়ে-মার ছেলেকে আদর করায় :

ওরে আমার বাঁদর নাচন আদর গেলা কোঁৎকারে
অন্ধ বনের গন্ধগোকুল ওরে আমার হোঁৎকারে

দুটোই ভালোবাসার ভাষা, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার ভাষা নয়, তাই মানুষের কাছে মজার; মানুষের ভাষায় ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে অন্য এক জগতের ভাষা, এর মধ্যে কি আছে ব্যঙ্গ, না কৌতুক শুধু। নিশ্চয়ই কৌতুক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এর ছন্দের দোলায়, এর অনুপ্রাসে; কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করছি একটা জগৎকে, যা এক দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের ভাষায় সেই জগতের প্রাণীদের অনুভূতিগুলিকে অনুবাদ করতে গেলেই, সৃষ্টি হয় কৌতুকের। মানুষের জগৎকে যদি দেখা যেত প্যাঁচার দৃষ্টিতে কিংবা ভুতুড়ে-মা-র চোখে তখন কি অবিচল থাকত মানুষের জগতের স্থির মহিমা ? সুকুমারের কল্পনায় স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকে দ্বন্দ্বটা চলতেই থাকে। স্বাভাবিকের বোধ না থাকলে তাঁর কবিতার মজাটা থাকতই না। তাই তাঁর মূল অস্ত্র ভাষার দ্বন্দ্ব, কখনও শব্দের বিরোধ, কখনও অর্থের বিরোধ, কখনও কার্য কারণের বিরোধ।

এই বিরোধেরই অসামান্য নিদর্শন এই পংক্তিগুলি

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা —
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা ?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা ?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা ?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে ?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে ?

শিশু কি এর উত্তর খুঁজবে ? শিশু, যে এই সংগঠিত জগতের মধ্যে বন্দী, সে মুক্তি খুঁজে পায় এই জগতে।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করি। সুকুমার রায়ের লেখায় 'হাসি'-র কথা বেশ কয়েকবার এসেছে। কাতুকুতু বুড়ো, আহ্লাদী, রামগরুড়ের ছানা ইত্যাদি কবিতায়, হযবরল গল্পে। রামগরুড়ের ছানারা হাসির বিরোধী। 'রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা/ হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়/নিষেধ সেথায় হাসা।' আর সুকুমার রায়ের জগৎ এদেরই জগতের প্রতিবাদ। কাতুকুতু বুড়ো হাসি বিরোধী নন, কিন্তু সুকুমার আমাদের সাবধান করে দেন যে কাতুকুতু বুড়োর হাসির গল্প গল্প হিসেবে বিদঘুটে, তাতে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি, সে হাসায় সুড়সুড়ি দিয়ে। সুকুমার যে হাসির জগৎ গড়েন তা এমন একটা জগৎ যেখানে প্রত্যেকটা বস্তুর প্রত্যেকটা

আচরণের একটি "হাস্যকর" সম্ভাবনা আছে : সুকুমার সেই হাস্যকর সম্ভাবনার উৎসে পৌঁছে যান।

আমি বললাম, তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন ?

জন্তুটা বলল, কেন হাসছি শুনবে ? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আব সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আব ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচপেচে কাদা হয়ে যেত, আব লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তাহলে — হোঃ হোঃ হোঃ' — এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক কবে হাসছ ?'

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি ববফ, আর হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে — হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা — আবার হাসিব পালা।

আমি বললাম, কেন তুমি এই সব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা হেসে হেসে কষ্ট পাচ্ছ ? সে বললে, না, না, সব কি আর অসম্ভব ? মনে কব একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে — হোঃ, হোঃ, হোঃ হোঃ —

না, হাসির উপকরণের কোন অভাব নেই। তেমনই নেই আহ্লাদীদের

হাসছি দেখে চাঁদেব কলা, জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ বেলেব গাড়ী তেলের ভাঁড়।
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'কখগ' আর শ্লেট দেখে।
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

এ হাসির উৎস কখনও 'Comic'-এর বোধ, আর কখনও বিশ্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের আনন্দ বোধ। হিজিবিজবিজ শুধু হাসছে, সে ভাবছে অসংখ্য Permutation আর Combination-এর কথা, অসংখ্য সম্ভাবনার কথা, ভেঙে যাচ্ছে সংগঠিত জগতের গাম্ভীর্য, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে হাসির স্রোত। আহ্লাদীরা বলছে 'পাচ্ছে হাসি চাপতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে'।

৩

শিশুসাহিত্যের অভিপ্রেত পাঠক শিশু হলেও বয়স্ক যে শিশু সাহিত্য পড়েন, তার কাবণ, অন্তত একটি কাবণ, তিনি শৈশবের আনন্দকে ফিরে পেতে চান, কিংবা আমাদের মনের মধ্যে যে শিশু চিরকালই থেকে যায় তার প্রয়োজনে। বয়স্ক শিশু সাহিত্যের দিকে যখন ফেরেন তখনতো আর এতদিনের অভিজ্ঞতাকে লুপ্ত করে দিতে পারেননা। একই 'পাঠ'-এর ভেতর থেকে এবার তাঁর চোখে জেগে ওঠে নতুন অর্থ। প্রথম 'পাঠ' থেকে জন্ম নেয় 'নতুন পাঠ'। কেউ বলেন প্রসঙ্গ বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ বদলে যায়, কেউ বলেন প্রসঙ্গ বাইরের জিনিস নয়, সে 'পাঠ'-এর মধ্যেই আছে, পাঠক তাকে খুঁজে নেন। শিশুসাহিত্যের তাই অব্যাহতি নেই এই নবজন্ম থেকে।

'গোঁফ চুরি' কবিতায় অফিসের বড়বাবু হঠাৎ ক্ষেপে বলে উঠেছিলেন 'গোঁফকে বলে তোমার আমার, গোঁফ কি কারো কেনা ?/গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা'। অভিপ্রেত পাঠকেব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভ্যাগত পাঠকের প্রতিক্রিয়া পার্থক্যে সেই কথাটাই মনে পড়বে; প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা জানব এই রচনার পাঠক কে ? তিনি শিশু না বয়স্ক ? জানব, কে ভুলতে পারে অসম্ভবের ছন্দে, কে খুঁজে পেতে পারে স্বাধীনতা সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাবহীনে, আর কে তাকে বানিয়ে তোলে রূপকে, কে তাকে মনে করে ছদ্মবেশ। আমরা জানবনা সুকুমার রায় সত্যি তা চেয়েছিলেন কিনা, কিন্তু আমরা জেনে গেছি তাঁর পাঠক ভাগ হয়ে

গেছে দুভাগে; তাঁর রচনার অর্থের স্তরও আজ দ্বিধা বিভক্ত। কোনো পাঠকের মনে হতে পারে নিছক খেয়াল খুশির সাহিত্য যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত নয়, তাকে সম্মানজনক হতে হলে আরো সারবান হতে হবে, তাই 'আবোল তাবোল' শুধু আবোল তাবোল নয়, 'হযবরল' নয় হযবরল। সুকুমার রায় যে পাগলকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর কাব্যের আরম্ভে সে পাগলকে দিতে হবে আভিজাত্য। কিন্তু আর এক দল পাঠকও তাঁর থাকবেন যাঁরা সাড়া দেবেন শুধু তাঁর অসম্ভবের ছন্দে।

